প্রসঙ্গ ঃ বিদ্রোহী নেতাজী

প্রশান্ত সামন্ত

আম্বা পাবলিকেশন
৩০/১বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

Prasanga : Bidhrohi Netaji
by Prasanta Samanta

প্রকাশক : অশোক মান্না
মান্না পাবলিকেশন, ৩০/১ বি, কলেজ রো, কলি-৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬০

গ্রন্থস্বত্ব : রেণুকা সামন্ত

প্রচ্ছদ : গৌতম বসাক

মুদ্রাকর : জে. ডি. প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুখবন্ধ

সুভাষচন্দ্র চির জ্বলন্ত শৌর্য্য, দ্বিতীয়রহিত দৃপ্ততাজাত দীপ্তি।
বিশ্বব্যাপ্ত মূর্ত্ত উজ্জ্বলতা, অতলান্তিক গভীরতা তথা ব্যাপ্তি॥
সুভাষচন্দ্র বিদ্রোহ দাবানল, বিশাল উত্তাল ক্ষুব্ধ বারিধি-উর্মি।
মাতৃযজ্ঞে নিবেদিত মহাপ্রাণ, সদাজাগ্রত আর্য-ক্ষাত্র-ধর্মী॥
সুভাষচন্দ্র জ্বালাময়ী বাগ্মিতা, নিষ্কলঙ্ক দেশপ্রেমের নাম।
চির উড্ডীন যৌবন জয়ধ্বজা, স্মরিয়া তোমায় জানাই শত প্রণাম॥

সুভাষচন্দ্রের সারাজীবন ঘিরে হাজারো প্রশ্ন চিহ্ন। ওটেন নিগ্রহ, এমিলি শেংকলকে বিবাহ, মহানিষ্ক্রমণ, জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা ও উদ্দেশ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তাঁর আচরণ, ভারতের বুকে তাঁর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার আশংকা, বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু, রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত তাঁর চিতাভস্ম—সবই প্রশ্নচিহ্ন কণ্টকিত। বিশেষতঃ সরকার কর্তৃক কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জল ঢেলে দেওয়ার প্রচেষ্টার কারণে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আগ্রহ বর্তমানে বরং ক্রমবর্দ্ধমান।

বিরুদ্ধ বিচারে যুগপৎ বন্দিত ও নিন্দিত, অল্পকাল স্থায়ী দলনেতা কিন্তু কল্পকাল স্থায়ী দেশনেতা, সৈনিক-রাজনীতিক সুভাষচন্দ্রের জীবন এক মহা সঙ্গীতের মতো। ঐ আদলেই রাখা হয়েছে সুভাষ শতবার্ষিকীতে নিবেদিত বর্তমান বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্যটিকে, আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। কিন্তু যেমন কোনো তিন মিনিটের চট্‌জলদি ডিস্ক, মহাসঙ্গীতের স্বাদ দেয় না, তৃষ্ণা বাড়ায় মাত্র, তেমনি করে বর্তমান পুস্তিকাটি পাঠকবর্গের অতৃপ্তির কারণ হয়ে তাঁদের মধ্যে অধিকতর সুভাষচর্চার কারণ ঘটাতে সমর্থ হলে বিশেষ বাধিত হব। জীবনী সাহিত্য রচনার উদ্বাহু-স্পৃহা আদৌ, নাই এ ক্ষেত্রে ;—জীবনী সাহিত্যকে একই সঙ্গে হতে হয় সাহিত্য এবং ইতিহাসও—সে বড়ো কঠিন কাজ।

কিছু মুদ্রণ প্রমাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ২য় পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে আছে সম্ভবত হবে সম্ভাব্য, ৩য় পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তিতে রয়েছে ভাবতে হবে ভারতে, ৫ম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে যুক্ত হবে মুক্ত, ঐ পৃষ্ঠারই শেষে আছে অঙ্গে, হবে অঙ্কে। ৭ম পৃষ্ঠায় ৮ম পংক্তিতে আছে সত্মারকে হবে সত্মার যে, ১১শ পৃষ্ঠার ১০ম পংক্তিতে আছে বাংলার, হবে রাংলার, ১৩শ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে ৬ হবে ২ আর ২ হবে ৬। ১৭শ পাতার ১৬ পংক্তিতে যুক্তি হবে চুক্তি ৮২ পাতার ১৮শ পংক্তিতে বাড়ীতে হবে বাড়াড়ীতে। এমন আরও কিছু ত্রুটি আছে, স্বীকার করছি।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখা হয়েছে কম নয়, হচ্ছেও অনেক, হবেও ঢের। সেই অরণ্যানীর আড়ালে যাতে একেবারে হারিয়ে না যায় বর্তমান পুস্তিকাটি, তার জন্য যথেষ্ট যত্নবান থেকেছি। এটিকে আরও সমৃদ্ধতর করতে এর ত্রুটি, বিভ্রান্তি, বিকৃতি, বিচ্যুতি ইত্যাদির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ বিশেষ সমাদরে গৃহীত হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গিয়ে সহধর্মিনী শ্রীমতি রেণুকা সামন্ত, গ্রন্থাগারিক শ্রী দেবদাস ভট্টাচার্য্য, মান্না পাবলিকেশনের কর্ণধার শ্রীঅশোক মান্না—এঁদের নাম উল্লেখ করতেই হয়। এর পরেও প্রচ্ছদ শিল্পী ও মুদ্রণ কর্মী ছাড়াও যাঁরা প্রেরণা ও পরিশ্রম, উৎসাহ ও উপদেশ, সহায়তা ও সদাশয়তা, এবং উপাদান ও উপকরণাদি দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই অকৃত্রিম আন্তরিকতা।

কোলকাতা-৫০ প্রশান্ত সামন্ত

বিদ্রোহ ও বিপ্লব

বীর-বিপ্লবী, নিঃস্বার্থ-সংগ্রামী, একনিষ্ঠ-দেশপ্রেমিক, আপস-বিরোধী-স্বাধীনতা-যোদ্ধা—এমন অযুত সমৃদ্ধ অভিধায় নির্দ্বিধায় সম্বোধিত করা যায় সুভাষচন্দ্রকে। কিন্তু কোনও একটি মাত্র পরিচয়ে যদি চিহ্নিত করতে হয় তাঁকে, তবে "বিদ্রোহী নেতাজী"—এই পরিচিতিই বোধহয় সম্যক সুপ্রযুক্ত হবে তাঁর সম্পর্কে। বিপ্লবী তিনি অবশ্যই, সংগ্রামী তিনি নিশ্চয়ই, আপস-বিরোধী স্বাধীনতা-স্পৃহা তাঁর তো ছিলই, কিন্তু তাঁর এই সমগ্র কর্মকাণ্ডের মূলসূত্র হিসাবে প্রতিভাত যে অবশ্যম্ভাবী অনুপ্রেরণা, তা হ'ল এক অনমনীয়, অভ্রংলিহ অন্তঃপ্রবাহী-বিদ্রোহের ফল্গুস্রোত-সমন্বিত নেতৃত্বগুণ। শিশুকাল থেকে শেষদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ও অক্ষত ছিল তা; স্তিমিত তো দূরস্থান, মন্দীভূতও হয়নি একটি দিনের জন্যেও। যে কোনও বিচারে প্রকৃত অর্থেই তিনি বিদ্রোহী নেতাজী।

বিপ্লবী-আখ্যা কাউকে যতখানি মহীয়ান মনে করতে সহায়তা করে, বিদ্রোহী-বিশেষণ ঠিক ততখানি করে না হয়তো, কিন্তু সন্দিগ্ধ বিপ্লবের তুলনায় সর্বাত্মক বিদ্রোহ যে অনেক বেশী উজ্জ্বলতর, ভীরু দ্বিধান্বিত বিপ্লবের প্রতিস্থাপনায় সর্বস্বপন বিদ্রোহ যে অনেক বেশী শ্লাঘ্য, স্বার্থ-গন্ধী নির্বিষ বিপ্লবের নিরিখে নিঃস্বার্থ সংগ্রামপন্থী বিদ্রোহ যে অনেক বেশী কাম্য; বিশেষতঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে তা প্রতিপাদিত হয়েছে বারবার। প্রকৃত অর্থে বিপ্লবের ব্যাপকতা ও তীব্রতায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বার আকার ধারণ করেছিল মাত্র একবারই—তা ১৯৪২-এর আগষ্টে "ভারত ছাড়ো"-র প্রকম্পিত আহ্বানে; কিন্তু সে আহ্বানকে প্রকৃত বিপ্লবী হয়ে উঠতে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের চরমপন্থী অনির্বাণ অগ্নিবর্ষী বিদ্রোহের সুস্পষ্ট প্রভাব এবং পরিশেষে সুভাষচন্দ্রের পরোক্ষ প্রেরণা যে কি ভীষণ ভাবেই না কার্য্যকরী ছিল!

দেশমাতৃকার সেবা ও তার শৃঙ্খলমোচন প্রয়াসে সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ কেবল বৃটিশসিংহের বিরুদ্ধেই নিরন্তর সক্রিয় - এমন মাত্র নয়; তা তৎকালীন আপসপন্থী নিরুত্তাপ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধেও সমতীব্রতায় সদাতৎপর। শৈশবাবস্থা এবং ছাত্রাবস্থায় দেশভক্তির প্রশ্নে পারিবারিক বিধিনিষেধ এমনকি প্রত্যক্ষভাবে পিতার বাধাবন্ধও সসম্ভ্রমে উপেক্ষা করার মধ্যেই তাঁর এই বিদ্রোহীয়ানার অঙ্কুরোদ্গম।

প্রসঙ্গতঃ বিপ্লব ও বিদ্রোহ—শব্দ দু'টির অল্প বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সমস্ত বস্তুই নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এবং সে কার্য্য সাধনে বিশেষতঃ বিবর্ত্তন সর্ব্বদা সক্রিয়। বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনকর্ত্তা, বিপ্লবও পরিবর্ত্তনকামী ব্যর্থ না হলে পরিবর্ত্তনকারীও। প্রথমটির কার্য্যকারিতা ধীর, তাই অস্পষ্ট; পরবর্ত্তীটি অধীর, তাই সুস্পষ্ট, বিদ্রোহ কিন্তু

অধীর মাত্রই নয়, অস্থিরও তাই অধিকতর স্পষ্ট এবং সাফল্যের বিচারে বিপ্লব-তুল্য, সার্থক অথবা ব্যর্থকাম—যদিও Revolution অর্থাৎ বিপ্লব, Revolve অর্থাৎ আবর্তন-এর তৎসম ; Revolt বা Rebellion অর্থাৎ বিদ্রোহ এদের তদ্ভবও নয়।

বিপ্লব একক হতে পারে না, তাকে ব্যাপক হতে হয় ; বিপ্লব আরোপিত করা যায় না, তাকে স্বতঃস্ফূর্ত-স্বতোত্থিত হতে হয়, সে কারণে বিপ্লব সংঘটিত করতে বেশ বিস্তৃত একটা প্রস্তুতিপর্ব ব্যয় করতে হয় জনজাগরণ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি এই প্রস্তুতিপর্বের অবশ্যকার্য্য। এই জনজাগরণ জনগণের অংশগ্রহণ ব্যাপকতা আর গভীরতায় যত দৃঢ়মূল হবে, বিপ্লবের সুনিশ্চয় সার্থকতার সম্ভাবনাও বর্দ্ধিত হয় ততখানি। এ কারণে বিপ্লবকে কয়েকটিমাত্র সীমিতক্ষেত্রে আবর্ত্তিত হতে থাকলে চলে না, কেন্দ্র তার একটা থাকতেই পারে—কিন্তু আলোড়নটিকে হতে হয় সুদূর প্রসারী—যতদূর সম্ভব কেন্দ্রাতিগ। বিপ্লব সর্বদা কেন্দ্রাতিগ হয়েও সর্বদা কেন্দ্রাভিগও।

বিদ্রোহকে যে এমন ব্যাপক হতে হবে তার কোনো মানে নেই, তা এককও হতে পারে ; তা হতেও পারে বেপরোয়া বেহিসাবী পরিণতি-নিরপেক্ষ, এমনকি ক্ষেত্র-বিশেষে উৎকেন্দ্রিকও। বিদ্রোহ আবেগ-সর্বস্ব হতে পারে, সেক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার সম্ভাবনাই সমধিক। বিপ্লবকে কিন্তু যুক্তিনির্ভর করে গণগ্রাহ্য করে গড়ে তুলতে হয় : পরিণতি-সম্ভাবনার হিসেব-নিকেশ সাধ্যমত নিখুঁত করতে হয় সম্ভবত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির নিরসনের কারণে। বিদ্রোহ যদি শেষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে কেন্দ্রাতিগ না হয়ে কেবলমাত্র সীমিত ক্ষেত্রে তুফানও তোলে, তবে তা নিন্দনীয় রাজদ্রোহ-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়ে পড়ে ; বিপ্লবীর সমমর্য্যাদায় সম্বর্দ্ধিত হয় না সেই বিদ্রোহী। এককেন্দ্রিক বিদ্রোহ উৎকেন্দ্রিকতারই নামান্তর।

অগ্ন্যুৎসবের অংশবিশেষ হিসাবে যদি বিপ্লব আর বিদ্রোহকে চিহ্নিতকরণ করা হয়—বিদ্রোহ তবে অবশ্যই অম্বর-স্পর্দ্ধী আকাশস্পর্শী আতস বিশেষ আর বিপ্লব ঐ বহ্ন্যুৎসবের অন্যান্য কিছু-কিছুর অথবা সবকিছুর সমারোহ। আতস অগ্নিসংযোগ হওয়া মাত্রেই উৎক্ষিপ্ত—অন্যকে উদ্দীপিত ও আলোকিত করার প্রাক্ মুহূর্ত্তেই শূন্যোত্থিত হয়ে সাধারণ্যে সংযোগহীন। প্রাক্-পর্বে বিদ্রোহকে অনুরূপ ক্ষণপ্রভা সমগোত্রীয় অনুমিত হলেও তা যে উত্তরপর্বে দশদিশ উচ্চকিত ঔজ্জ্বল্যে আলোড়িত করে কখনো কখনো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের কারণও হতে পারে তা কি অস্বীকার করা যায়?

নেতাজীর সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ ভূমিকা ছিল ঐ আতসের। নাগালের অনেক বাইরে অত্যুচ্চে সঞ্চরণশীল সময়ে আলোকিত করলেন আসমুদ্র-হিমাচল, আর অগ্নিস্রাবের সুতীক্ষ্ণ দাহনে প্রজ্বলিতও করলেন কম অঞ্চল না। তাঁর ভূমিকা বিপ্লবীসুলভ আনুভূমিক অগ্নিসংযোজন নয়, বিদ্রোহীসুলভ উলম্ব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসরণ। এই ভূমিকায় ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করেছেন তিনিই।

একদেশদর্শী বিচারে সুভাষচন্দ্রকে অনেকে বিদ্রোহীমাত্র রূপে চিহ্নিত করে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অতুলনীয় ভূমিকাকে নস্যাৎ করতে তৎপর। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহীর ভূমিকাটি সম্যক পর্য্যালোচনা করলে এ ভ্রান্তি নিরসন হতে বাধ্য। গান্ধীজি পরিচালিত আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমান্তরাল ধারার অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের সুযোগ্য উত্তরাধিকার নিয়ে বিপ্লবকে অপ্রতিহত করেছেন তিনিই—তাঁর চরমপন্থী সুলভ কর্মকাণ্ড দিয়ে। স্বাধীনতার বোধ, জাতীয়তার ধারণা—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক এবং সর্বোপরি মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ জাতীয় নেতারা তৃণমূল পর্য্যন্ত পৌছে দিলেন ঠিকই—কিন্তু জনগণকে, জনগণের সেই বোধকে প্রকৃত আন্দোলনমুখী করে তুলতে গণনায়ক সুভাষচন্দ্রের যে উত্তাল ভূমিকা, তার তুলনা কোথায়?

উত্তরপর্বের নেতাজী, প্রাক্‌জীবনে যুবনেতা, গান্ধীজির মত জননেতা হতে পেরেছিলেন কচিৎ, কিন্তু তাঁর অসহিষ্ণু আপস-বিরোধিতা, অনমনীয় মানসিকতা ও অনন্যসম্ভব চারিত্রদাঢ্য বারবার 'উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে' যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সমগ্র ভারতীয় জনগণকে যে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে অধীর, উন্মুখ ও সাধ্য ভারতে সহায়ক হয়েছিল তা তো ঠিকই। আতস স্ব-নিঃশেষ হয় কিন্তু তার দ্বারা সংঘটিত অগ্ন্যুৎসারের ফলাফল অনিঃশেষও হতে পারে;—তাই-ই হয়; প্রকৃত বিদ্রোহী অবশ্যই নিঃস্বার্থ, অরির উৎকৃত্ত এষণায় মৃত্যুর মূল্যেও সর্বদা অরিত্রধারণে কৃতনিশ্চয়।

জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্র, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র, স্বাধীনতা যোদ্ধা স্বাধীনচেতা সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সার্থক ও সদর্থক তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী পূর্বসূরীবৃন্দ তাঁদের সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে মুখ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র সময় সীমাতেই তাঁদের বিদ্রোহের ধ্বজা যে কিভাবে সজীব রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। আন্দোলনের উত্তাল জোয়ার ব্যর্থতায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে স্তিমিতপ্রায় হয়েছে যখনই নিস্তরঙ্গ নৈরাশ্য আর নিস্পৃহতা যখনই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে পশ্চাৎ অপসরণে ব্যগ্র তাবৎ আলোড়িত সামগ্রিকতাকেই, পৌনঃপুনিক বিদ্রোহের উত্তপ্ত তাড়না তখনি স্পন্দ্যমান উজ্জীবনে উদ্দীপিত করেছে সেই পলায়নপর মন্থরতাকে, সেই হদিশ-হারানো পরিবর্ত্ত-পথ-হাতড়ানো নঞর্থক নিষ্ক্রিয়তাকে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ্য-ত্রিস্তরের যে ক্রমোন্নয়ন—অসহযোগ থেকে আইন অমান্য ও পরবর্ত্তী সময়ে আইন অমান্য থেকে আগষ্ট বিপ্লব—তা যে এই অবিরত সমান্তর বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি—তা অত্যুক্তি নয় নিশ্চয়ই।

অন্যতম ঐতিহাসিক বিদ্রোহ হিসাবে সিপাহী-বিদ্রোহের কথা কিঞ্চিৎ আলোচিত হতে পারে। প্রকৃত রাজনৈতিক অর্থে ভারতবর্ষ যদিও তখনো পররাজ্য শাসনাধীন নয়, কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বণিক দ্বারা শাসিত মাত্র, তবুও অনেকে উক্ত বিদ্রোহকে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলতে চান, তার প্রাসঙ্গিকতা আছে নিশ্চয়ই। পাশাপাশি ইংরাজ শাসকেরা যে একে নিছক বিদ্রোহ মাত্র বলে নস্যাৎ করতে চাইবেন, তাও বলাই

বাহুল্য। স্বাধীনতা-ঈপ্সা সঞ্জাত ছিল এ বিদ্রোহ অবশ্যই, কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত তো হ'লই তা, ফলস্বরূপ তৎকালে কোনও ব্যাপকতর বিপ্লবের সূচনা করতেও ব্যর্থ-হ'ল এ বিদ্রোহ। প্রকৃত প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত এ প্রয়াস পরিসমাপ্তি লাভ করেছিল কিছু পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হতাশ নবাব-বাদশাহের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের নিষ্ফল প্রচেষ্টার মধ্যে—জন মানসে যার প্রভাব ছিল নিতান্তই নগণ্য। অবশ্য তখন এবম্বিধ কর্মকাণ্ডে জনগণকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তথা প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হত কচিৎ, সে সুযোগও অবশ্য তৎকালীন সময়ে ছিল যৎসামান্যই।

জনসাধারণের কথা বাদ দিলেও সে সময়কার সমাজশ্রেষ্ঠরাও যে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন এমন মনে করারও কোনও কারণ নাই। সমাজের উচ্চ-কোটির একদল মানুষ বরং তখন ইংরাজ শাসনকে স্বাগত জানাতে উৎসুক। এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে বাংলার কিছু সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় কেবলমাত্র যে মনে মনে উল্লসিত হলেন তাই নয়, সে উল্লাসের প্রকাশ ঘটাতে সাড়ম্বরে আপ্যায়িতই করা হ'ল লর্ড ক্লাইভকে! ভবিষ্যতের অভীষ্টসিদ্ধি তথা প্রতিষ্ঠালাভের স্বর্ণসম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইশারার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতা নিবন্ধন বিড়ম্বনা ও আড়ষ্টতাই ছিল উল্লিখিত আচরণের মুখ্য কারণ। শতবর্ষের ব্যবধানে, কি সামনে, কি পিছনে সে মানসিকতা মৃত ছিল না একেবারে।

এই মহাবিদ্রোহের প্রতিস্থাপনায় সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহাত্মক মহাউত্থানকে পর্য্যালোচিত করা চলে। সুভাষচন্দ্র প্রকৃত অর্থেই বিদ্রোহী। কোনও সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থ বা গোষ্ঠী সম্পর্কের কারণে অনুপ্রাণিত বোধ করেননি তিনি বিদ্রোহী হতে। চাই ভারতের স্বাধীনতা, খণ্ডিত ভারতের নয়—অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা ; সর্ত্তাকার্ণ, দীন, দীর্ণ কোনও অংশে ঊণ স্বাধীনতা নয়, প্রকৃষ্ট, পরিচ্ছন্ন, পূর্ণ স্বাধীনতা ; জনগণের ভাগ্যবান একাংশের জন্য সুবিধাবাদী স্বাধীনতা নয় : সমগ্র জনগণের জন্যই সুবিধাকারী স্বাধীনতা—এই ছিল সুভাষচন্দ্রের ধ্যানজ্ঞান, আজীবন স্বপ্ন। সুভাষ-চন্দ্রের স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহ তাই কখনোই ছিল না একরোখা ও নিঃসঙ্গ, তা সাবলীলভাবেই হতে পেরেছিল ব্যাপক, সর্বজনীন ও সমগ্র ; হয়তো বা সন্ত্রাস সমর্থন-পন্থী, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপ্লবগন্ধী।

নানান ঐতিহাসিক কারণে সুভাষচন্দ্র প্রত্যক্ষতঃ কোনও সর্বাত্মক বিপ্লব সংগঠিত করে উঠতে পারলেন না ভারতাভ্যন্তরে, কিন্তু বিদ্রোহীর ভূমিকায় তিনি যে সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক হতে পারলেন, তা কি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বৈপ্লবিক হতে সহায়তা করতে সক্ষম হ'ল না! বিশেষতঃ ১৯৪১-এ তাঁর মহানিষ্ক্রমণ এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ইংরাজ তথা মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে সৈনাপত্য গ্রহণ কি ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন এবং ১৯৪৬-এর নৌ বিদ্রোহ ও পুলিসি অসন্তোষ এবং ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদির ব্যাপক উত্থান-এর সমগ্র প্রেক্ষাপটটিকেই আভাসিত করে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে সহজসাধ্য করল না!

এই অভাবনীয় কর্মকাণ্ডের পূর্ববর্ত্তী পর্য্যায়েও তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা, অভাবনীয় বীর্য্যবত্তা, অনলস কর্ম্মোদ্যম ও অবিচল দেশ প্রীতি, সম্পূর্ণমালিন্ত যুক্ত চরিত্র বল ও বিচিত্র কর্ম্মকাণ্ড জনমানসে যে অমলিন দেশপ্রীতির উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলনে সহায়ক হয়েছিল, তাই বা অস্বীকার করবে কে? তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী তিনি স্বয়ং ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহাত্মক কার্য্যকলাপ ও সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিসূচক আচরণাবলী ও নীতি-প্রকৃতি যে ঐ সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থী স্বাধীনতা-কামী বিপ্লবীদেরকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও ক্ষীণভাবে হলেও প্ররোচিত করেছিল—তাই বা অস্বীকার করবে কে?

এমন আদর্শ বিদ্রোহী ও বিদ্রোহের রূপকার, অকৃত্রিম দেশপ্রাণতায় সমুজ্জ্বল একনিষ্ঠতা, নিঃস্বার্থ মাতৃমুক্তিসাধনায় একান্ত নিরন্তর, তেজঃবীর্য্য সমান্বিত সর্বত্যাগী মৃত্যুসাধক, নিষ্পেষিত-জনগণ-মঙ্গলকামনায় নিবেদিতচিত্ত মহাপুরুষ সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসেই নিঃসন্দেহে বিরল।

সুভাষচন্দ্র অনন্য, সমস্ত বিশ্ববাসীর অবশ্য বরেণ্য, ভারতমাতা এমন এক সুসন্তান আপন অঙ্গে ধারণ করে অবশ্য ধন্য।

বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী

সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালী। জন্ম যদিও তাঁর উড়িষ্যার কটক শহরে, তবু তিনি আদ্যোপান্ত বাঙ্গালীই। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন বাঙ্গালীর পক্ষে প্রকৃত বিদ্রোহী হিসাবে গড়ে ওঠার আদৌ সম্ভাবনা কতখানি।

এমন অপবাদ বহুশ্রুত যে বাঙ্গালী বড়ো আবেগসর্বস্ব, ভাবপ্রবণ, ভীরু, অলস, আরামপ্রিয় ও কর্ম্মবিমুখ। অন্ধ আবেগ আর যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতা হয়তো বা বিদ্রোহী হতে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু ভীরুতা, আলস্য, আরামপ্রিয়তা এবং কর্ম্মবিমুখতা—এসব তো তার পরিপন্থী-ই। তবে কি বাংলার স্বাভাবিক আবহাওয়া মোটের উপর বিদ্রোহীর জন্মদানের প্রতিকূল? সাধারণ সিদ্ধান্ত সে রকমই শোনায় বটে, বাস্তব অবস্থা কিন্তু সে অনুমান সমর্থন করে না। বিদ্রোহ বাঙ্গালীর রক্তে, বাংলার প্রত্যন্তে, প্রতিপ্রান্তে, কি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মীয় ক্ষেত্রে, কি রাজনীতি, কি সাহিত্যকৃতি - সর্ব্বত্রই এই বিদ্রোহের বিশিষ্ট স্বাক্ষর।

সুরু করা যেতে পারে শ্রীচৈতন্য দিয়ে। কোন সুদূর ১৪৮৬-তে জন্ম তাঁর; অর্থাৎ পাঁচশতাধিক বৎসরেরও পূর্বেকার কথা। তৎকালীন ক্রমপচনশীল সমাজ ও ধর্ম্মক্ষেত্রের চরম অবক্ষয়ের প্রতিবাদে সার্থক এক বিদ্রোহী সংস্কারক তিনি। ধর্ম্মাধিক্য কারণে তাঁর উপর অবতারত্ব আরোপ প্রয়াস মানসে প্রায়শই তাঁর এই মানবিক বৈশিষ্টের কথা বিস্মৃত হই আমরা। কি রাজরোষ, কি জন-আক্রোশ, কোনো প্রতিবন্ধকতাই প্রতিহত করতে পারে নি তাঁর ঋজু বিদ্রোহী সত্তাকে। তাঁর এই কীর্ত্তিটিও ক্বচিৎ আলোচিত যে—বর্ত্তমান কালের বহু ব্যবহৃত ধর্ম্মঘট, হরতাল, সত্যাগ্রহ, মিছিল জমায়েত জাতীয় আয়ুধসমূহের অঙ্কুরাকারে হলেও আদি উদ্গাতা ও প্রয়োগকর্ত্তা তিনিই। এক সার্থক বিদ্রোহী বাঙ্গালী হিসাবে নির্দ্বিধায় চিহ্নিত করা যায় তাঁকে।

একেবারে চলে আসা যেতে পারে রামমোহন রায়-এ। স্থাণু, স্থবির তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে মুখ্যতঃ ধর্ম্মান্ধতার প্রতি তাঁর বিদ্রোহের হাত ধরেই তো এল বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণ। আর তাঁর স্বক্ষেত্রে এই বিদ্রোহকে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হতে হ'ল এমনকি পিতৃদ্রোহেও। তবু কিন্তু রামমোহন ঘনিষ্ঠ থাকলেন আপন বিশ্বাস ও কর্ম্মে। সমাজকল্যাণের স্বার্থে পিতৃদ্রোহও যে অপরাধ নয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলেন তিনি।

সমসময়ে ডিরোজিও আর ইয়ং বেঙ্গলের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদী ভূমিকার উপর ভর করে ভ্রূণাকারে উপ্ত এই বিদ্রোহ রূপ পেল পরবর্ত্তী সময়ে আমূল বিপ্লবের। এগিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজ সংস্কার ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর বৈপ্লবিক আবেদন ও অবদান তো রীতিমত বিস্ময়কর। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে প্রায় নিস্পৃহ তিনি তবুও আমাদের সমাজ কাঠামোর বিশেষ চরিত্রের ফলে তাবৎ

ধর্ম্ম-ধ্বজীরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না বিদ্যাসাগরকে ; বিধ্বংসী বিদ্রোহীর নিন্দনীয় আখ্যায় ভূষিত হতে হ'ল তাঁকে। রামমোহন-রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ এঁরা প্রত্যেকেই প্রকৃত বাঙ্গালী কিন্তু স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিদ্রোহীও।

বাংলা সাহিত্যেও তো বেশ একটি বিদ্রোহের ধারা যথেষ্ট বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসৃত হয়ে এসেছে বরাবর। নীলদর্পণ আর মেঘনাদ বধ-কাব্যের কালাপাহাড়ী বিদ্রোহ রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকদেরকে স্পর্শ করে বিচিত্র ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলদের মাধ্যমে সুকান্ত পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে প্রলম্বিত। অসির চেয়ে মসী অধিকতর শক্তিশালী—এ বিচারে এঁদের এই সাহিত্যসম্ভারসমূহকে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক বিদ্রোহের চরিত্রে ঘৃতাহুতির ভূমিকা পালন করল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সরাসরি চলে আসা যেতে পারে রাজনৈতিক বিদ্রোহের প্রসঙ্গে। খুব বেশী পিছনে যাওয়ার দরকার নাই ; সুরু করা যেতে পারে বারো ভূইঞ্যাদের কাহিনী দিয়ে। কতো ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারিই না ছিলেন এঁরা, কিন্তু কি দৃঢ়তার সঙ্গেই না প্রতিবাদীর ভূমিকায় প্রাণপাত করলেন প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে। মোটের উপর ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল তাদের প্রয়াস, কিন্তু মরণপণ বিদ্রোহের কি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তই না রেখে গেলেন তাঁরা আমাদের সামনে। অগ্নিযুগ বা তার পরবর্ত্তী সময়ের কথা বাদ দিলেও মাত্র এদের অস্তিত্বেই তো অপনোদিত হওয়া উচিত এই অনভিপ্রেত অপবাদের যে বাঙ্গালী বিদ্রোহী হতে পারে না, বাংলার জলবায়ু বিদ্রোহীর জন্মদানের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নয়। বাঙ্গালী সর্বদা বিদ্রোহী, সর্ব্বত্র বিদ্রোহী—সুভাষচন্দ্রে বর্ত্তেছে এই সম্যক বিদ্রোহী সত্তার সার্থক উত্তরাধিকার।

ভাবপ্রবণতা আর আবেগসর্ব্বস্বতার সমাহার বিদ্রোহের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু সে বিদ্রোহকে বিকশিত ও প্রলম্বিত হতে গেলে যে পরিপূর্ণ প্রাণপ্রাচুর্য্যের প্রশস্তবক্ষ প্রাগসরতার, এবং পরিমিত ও পরিণত প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় তার অনুপপত্তি বাংলার বুকে ঘটেনি কখনো। বাঙ্গালী হিসাবে সুভাষচন্দ্রের জন্ম তাই কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়,—তা হতেই পারে না কোনো অসংগতিব্যঞ্জক ব্যতিক্রমি, বিরল বিস্ময়কর কিছু।

বাঙ্গালী ধর্মান্ধ নয়, প্রশ্নহীন বিশ্বাস আর অন্ধআনুগত্যে জাড্যযুক্ত নয় সে কখনো ; আপাতদৃষ্টিতে ঘরকুনো কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অচেনা অজানাকে জানবার ও চেনবার প্রয়াসে চঞ্চল জন্মপরিব্রাজক সে : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে সতত সংগ্রামী স্বাধীনচেতা তার মন, ভাববাদী দার্শনিক হওয়ার রসদও যেমন আছে তার, বিধ্বংসী-বিদ্রোহী-বিপ্লবী হওয়ার তাগদও তেমনি ধরে সে ; ভুল করার অধিকারও স্বীকার করে নিয়ে বেপরোয়া হওয়ার তাড়া তার রক্তে। আধ্যাত্মিকতাযুক্ত যুক্তিবাদী বিদ্রোহের যে সূচনা ঘটল গতশতাব্দী থেকে, স্বামী বিবেকানন্দের বাস্তবায়িত বেদান্তের অবিশ্রান্ত

ভাষ্য আর ঋষি অরবিন্দ বিরচিত অধ্যাত্মবাদী দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদ-এর ভাবধারায় তা পুষ্ট হতে থাকে ক্রমাগত। দুর্বার বহ্নিপ্রবাহের পুণ্য ধারায় শুচিস্নাত হতে সুরু করল বাংলার যুবশক্তি। সুভাষচন্দ্র ঐ ধারায় অবগাহনকারী আদর্শবাদীদের আপাততঃ শেষ নির্য্যাস।

একটি লোকগীতি বহুশ্রুত—"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি···· দশ মাস দশদিন পরে জন্ম নেব মাসীর ঘরে···" ইত্যাদি। শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির মঞ্চে জীবনদান করার অব্যবহিত পরে রচিত ওটি। নিতান্ত গ্রামীণ ব্যাখ্যায় একসময় এর অর্থবোধ হয়েছিল—ক্ষুদিরামের এই বিনীত প্রার্থনা নাকি পুরিত হয়েছিল তাঁর জন্মান্তরে সুভাষচন্দ্র হয়ে ওঠার মাধ্যমে। জন্মান্তরবাদে আকণ্ঠ বিশ্বাসীর কাছেও অনুরূপ ব্যাখ্যা অবান্তর, কারণ ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট আর সুভাষচন্দ্রের জন্ম তার এগারো বছরেরও বেশী আগে—১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে না নিয়ে কথাটিকে যদি আলংকারিক অর্থে গ্রহণ করা যায় তবে সঙ্গীতটির এই অপব্যাখ্যাই সঙ্গত একটি অর্থে সার্থক হয়ে যায়। প্রথম স্বীকৃত জাতীয় শহীদ ক্ষুদীরামের বিদ্রোহ ও আত্মদান দিয়ে যে মহাহবের সূচনাকরণ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ ও আত্মবিসর্জন দিয়ে যেন সেই মহারণেরই সার্থক সমাপন। উদ্ভিন্ন যৌবন ক্ষুদিরামই যেন যুবনেতা সুভাষচন্দ্রে দ্বিজত্বপ্রাপ্ত হয়ে আর সেনানী মাত্র নন, রীতিমত সেনাপতি : আত্মগোপনকারী আততায়ীরূপী আক্রমণকারী নন, আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বপ্রকাশ স্বরাট শস্ত্রপাণি। সুভাষচন্দ্র জন্মান্তরে ক্ষুদিরাম নন ঠিকই, কিন্তু···উত্তরাধিকারে তাই। ১৯১১ সালের ১৫ই আগষ্ট কটকে ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্র যে আপনার ও আপন সহপাঠীদের অনশনের অনুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুদিরাম-বন্দনার মাধ্যমে স্বীয় স্বদেশপ্রেমের সূচনা করলেন একে কাকতালীয় বলা যায় কি?

সর্বস্বপণ নিঃস্বার্থ সৈনিকের ভূমিকায় তিনি ক্ষুদিরামের বিশ্বব্যাপ্ত ছায়া—কেন্দ্রস্থলে সাত্বিক, সত্যনিষ্ঠ সেবকের ভূমিকায় বিবেকানন্দের গভীর প্রচ্ছায়া—আর পরিমণ্ডলে সর্বত্যাগী, কর্মযোগী সন্ন্যাসী শ্রীঅরবিন্দের ক্রমব্যাপ্ত উপচ্ছায়া। বিবেকানন্দের আজীবন স্বচ্ছন্দ বিচরণ সমদক্ষতায় পূর্ণ বোধি ও যোদ্ধর সমাপতনে : অরবিন্দের পরম অভিপ্রেত উত্তরণ অর্দ্ধপূর্ণ যোদ্ধর জীবন থেকে সম্পূর্ণ বোধির পুণ্য প্রাঙ্গণে : আর সুভাষচন্দ্রের আগমন সদর্থক অর্থপূর্ণ বোধির জীবন থেকে সম্প্রর্পিত যোদ্ধর কণ্টাকাকীর্ণ সমরাঙ্গনে। প্রকৃত অর্থেই সুভাষচন্দ্র শহীদ ক্ষুদিরামের পরিশীলিত ও পরিণত পরিবর্ত্তিত রূপ।

তৎকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষায় বাঙ্গালীর যে বিদ্রোহী রূপ, তা পরিস্ফুট করতে অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে একদিকে যেমন অগ্নিযুগের কথা, অন্য দিকে তেমনি মূলধারার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু প্রতিপদে প্রতিবাদী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখদের কথা। তৎকালীন বাংলার তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীরা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়েও কখনই মুক্ত ছিলেন না অধ্যাত্মবাদের সাধনা থেকে। গীতা ছিল তাঁদের

প্রেরণাস্থল, বন্দেমাতরম অন্যতম উজ্জীবনী মারণমন্ত্র আর শক্তিরূপিনী দেবী আরাধনা সংকল্প সাধনের শপথ পাঠ। মাতৃভূমি মাতা মাত্রই নয়, স্বর্গীয় দেবীও। দেবীদুর্গার দশপ্রহরণ ধারিণী মূর্ত্তি অধিকতর আকর্ষণীয় আর কালিকামাতার নৃমুণ্ডমালিকা সমভাবেই আদরণীয় তাঁদের কাছে। এমন ঘটনায় আদৌ বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই যে ১৯০৬ সালে ওয়েলিংটন ষ্ট্রিটে অনুশীলন সমিতি দুর্গোৎসব করছেন অস্ত্রপূজার মাধ্যমে মহোৎসাহে, আর তা প্রত্যক্ষ করতে আমন্ত্রিত হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ। ঈশ্বরভক্তি আর স্বদেশপ্রীতি হয়ে উঠেছে সর্ব অর্থেই সমার্থক।

স্বামী বিবেকানন্দ আর ঋষি অরবিন্দের প্রভাব আদৌ কম নয় তাঁদেরও উপরে। বিবেকানন্দ নির্দ্দেশিত শিবসেবার্থে জীবসেবার নিদান: আত্মমুক্তি মাত্র নয়, সবার জন্য মুক্তি—দারিদ্র্য মুক্তি, মালিন্য মুক্তি, অশিক্ষা-মুক্তি, সংস্কার-মুক্তি ইত্যাদি শিক্ষা; আমাদের অমূল্য অভাবনীয় অধ্যাত্মসম্পদ শ্রেণীবিশেষের বাক্সবন্দী থেকে অনর্থক অপচয়িত হচ্ছে এ জাতীয় সতর্কতা-সজাগ করতে সমর্থ হয় তাঁদেরকে। ঋষি অরবিন্দ যে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মধারণাকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে গড়ে তুললেন অধ্যাত্মবাদী জাতীয়তাবোধ—তাতেও চরম আকৃষ্ট বোধ করেন তাঁরা। বিবেকানন্দ-নির্দ্দেশিত অধিকতর শক্তিশালী পেশীর সঙ্গে যুক্ত হ'ল অরবিন্দ-প্রদর্শিত অপরিহার্য্য অসি ও ঐশী শক্তির সুষম সংমিশ্রণ—দুর্বার হয়ে ওঠে বাংলার যুবশক্তি। সুভাষচন্দ্র এই সম্মিলনেরই এক পরিশ্রুত পবিত্র পরাকাষ্ঠা;—সেবা ও ত্যাগের সঙ্গে শৌর্য্যও দার্ঢ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা প্রকৃত এক রাজর্ষি তিনি।

স্বাধীনতা আন্দোলনে মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত যে বঙ্গীয় উপধারাটি, তাতে মূলতঃ উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরই প্রাধান্য। ঝানু অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. এ. ও হিউম তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিনের মন্ত্রণায় ১৮৮৫ সালে একটি 'সেফটি ভালব' হিসাবে কাজ করতে গড়ে তুললেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আর মধ্যবিত্ত ভারতীয়েরা ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করবার যা হোক একটা উপায় পেয়ে তাতেই খুশী। পর বৎসরই অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ন্যাশনাল কনফারেন্স নিয়ে যোগ দিলেন এই কংগ্রেস-এ। কংগ্রেস অল্প-দিনের মধ্যেই ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল তার "তিন দিনের তামাসা"র চরিত্র। এই সুরেন্দ্রনাথই ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ করতে হয়ে উঠলেন সারেণ্ডার নট। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে যে শীর্ষ বিভাজন বাঙ্গালীর এই প্রতিবাদী চরিত্রের ভূমিকা সেখানেও আদৌ ন্যূন নয়। লাল-বাল-পাল ত্রয়ীর অন্যতম শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল সর্বভারতীয় নেতৃত্বে উন্নীত তখনই।

পরবর্ত্তী উল্লেখ্য চরিত্র অবশ্যই দেশবন্ধু শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সমস্ত রকমের জৈব স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে; ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের

প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন-ই মাত্র করলেন না তিনি, সমর্থও হলেন এ আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান সন্ত্রাসবাদী ও বামপন্থী ব্যক্তিবর্গের সমর্থন গান্ধীজির স্বপক্ষে আদায় করতে ; কিন্তু বৎসর দুই সময়মাত্র না পেরোতেই ১৯২২-এ গয়া কংগ্রেস-এ বিদ্রোহে ফেটে পড়তে হ'ল তাঁকে—এমনকি বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়ে গড়ে তুলতে হ'ল স্বরাজ্য দল। সুভাষচন্দ্র তখন তাঁর শিষ্য, সুযোগ্য সহযোগী ও একনিষ্ঠ সহকর্মীও। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ দীক্ষা তাঁর তখন থেকেই।

বাঙ্গালীর ব্যতিক্রমী চরিত্র বোঝাতে "বেঙ্গল লাইন" অভিধায় বহুশ্রুত শব্দবন্ধটির ঈষৎ প্রাসঙ্গিকতা আলোচ্য এই প্রসঙ্গে। 'বাঙলা আজ যা ভাবে ভারত তাই ভাবে আগামী কাল'—এই প্রশস্তি বাক্যটি যথেষ্টই সঙ্গতিপূর্ণ ওই শব্দবন্ধটির সঙ্গে। ভবিষ্যৎ ভাবনায় যে স্বচ্ছ দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ভারতের ক্ষেত্রে তার যোগান অজস্র ধারায় এসেছে এই বাংলা থেকেই এবং সে কারণে 'বেঙ্গল লাইন' অন্যান্যদের কাছে এমন মনে হলেও বিভেদমূলক বা বিদ্বেষসূচক নয় কখনই ; বরং তা গঠনমূলক প্রাগ্রসর চিন্তারই প্রকাশ মাত্র। বাংলার বর্ত্তমানে সে সুদিন হয়তো আর নেই কিন্তু এককালে তা যে কি দুর্দ্দান্ত রকমেরই না ছিল,—ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পর্য্যন্ত অন্ততঃ তো তা ছিলই।

নিঃসংশয়ে বলা চলে বাঙ্গালী সুভাষের বিদ্রোহী হয়ে ওঠা কোনও আবিল আবেগের অযৌক্তিক উৎসার নয় : প্রার্থিত ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বপন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ও উপাদানের সমিধ সিঞ্চনের সমাহারে সুষম সৃষ্টি তিনি। শহীদ ক্ষুদিরামের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গকেও যাঁরা স্থূল ভাবাবেগের অপরিণামদর্শী অর্থহীন পরিণতি বলে নস্যাৎ করতে চান তাঁরাও অবশ্য সহমত হবেন এ বিষয়ে—

রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করোনি—এ জাতীয় উৎপ্রেক্ষার জ্বলন্ত প্রতিবাদ সুভাষচন্দ্র : তেমনি তিনি—"মানুষ আমরা নাহিতো মেষ" -এই আত্মপ্রত্যয়ের জীবন্ত প্রমাণও।

বিদ্রোহ ও ভারত

সুভাষ জীবন আনুপূর্বিক আলোচনার প্রাক্‌পর্বে তৎকালীন ভারতীয় পট-প্রেক্ষাটিও সংক্ষিপ্তাকারে হ'লেও অবশ্য আলোচ্য। রাজা রামমোহন রায় দিয়ে বাংলায় তথা ভারতবর্ষের বুকে যে নব যুগের সূচনা হ'ল, তার অন্যতম ফলশ্রুতি আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর "সংস্থা-সংস্থাপনার যুগ" হিসাবে গড়ে ওঠা : "ইয়ং বেঙ্গল" প্রতিষ্ঠা দিয়ে যার প্রকৃত প্রস্তাবে সুরু। নিতান্ত ধূসর অবয়বের রাজনীতি সম্পর্কিত সংস্থার সূচনা ১৮৫১ সালে, প্রতিষ্ঠিত হ'ল বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন সভাপতি রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পর বৎসরই দাদাভাই নৌরজী গড়লেন 'বম্বে এসোসিয়েসন্'। ক্রমে এ জাতীয় সংস্থা গড়বার জোয়ার যেন প্লাবিত করল সারা ভারতবর্ষকে। ১৮৭৬-এ তৈরী হ'ল ভারত সভা ওরফে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আর বাংলার আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে। পূর্বোল্লেখিত সংস্থাসমূহের মতো মাত্র উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ রক্ষার্থে তৈরী হ'ল না এটি—সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার ভাবনাও বিধৃত থাকল এতে। ১৮৮৩ সালে সংস্থাটির নামকরণ হ'ল ন্যাশন্যাল কনফারেন্স আর ১৮৮৬ সালে অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বৎসরই এটি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাল্টাতে সচেষ্ট হ'ল কংগ্রেসের সামগ্রিক চরিত্রই।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮৫—প্রতিষ্ঠাতা এক অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস.—এ ও. হিউম। এখানে-ওখানে সভা সংস্থা সব যে গড়ে উঠছে—কি তাদের দাবী, আর কেমন করেই বা দাবিয়ে রাখা যাবে তাদেরকে, তাদের সামান্যতম হলেও উষ্মার যে উপশম ঘটানো দরকার—তাই তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফ্‌রিন উদ্যোগ নিলেন জনমানস সম্পর্কে অতি অভিজ্ঞ ঐ হিউমের সহায়তায় এমনই একটা প্রতিষ্ঠান গড়বার—বেশ ভালো রকম সেফ্‌টি-ভালভের কাজ করবে ওটি। সুরুর দিকে এর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—এটি হতে যাচ্ছিল তাই কর্তাভজা—: ঘটা করে সভা হ'ত, ব্যঙ্গ করে বলা হ'ত 'তিন দিনের তামাসা।' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সভা—পরে যার নাম হয়েছিল ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। ১৮৮৬ তে এতে যোগ দেওয়াতে আমূল পরিবর্তন হতে সুরু করল এই চরিত্রের। চরিত্র যে বদলে গেল রাতারাতি এমন নয়—একদল চাইল গতানুগতিক থাকতে—নরমপন্থী : অপরদল লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল আর শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে চাইল গরম দেখিয়ে চলতে—চরমপন্থী। বালগঙ্গাধর তিলক এই ধারাটা ধরে রেখেছিলেন ভালই, কিন্তু ১৯১৯ সালে তাঁর তিরোভাবের পর গান্ধীজির কংগ্রেসে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠার পর থেকে যে মুহূর্তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রূপান্তরিত হ'ল আক্ষরিক অর্থেই "গান্ধী কংগ্রেসে"—চরমপন্থীর চমৎকারিত্ব হয়ে এল স্তিমিত—নরমে গরমে চলতে থাকল এই কংগ্রেস।

তীব্র বৃটিশ বিরোধী আরো একটা ধারা প্রায় সমান্তর অবস্থানে থেকে সমান সক্রিয় ছিল তখন থেকেই। ১৮৯৭-তে মহারাষ্ট্রের পুনায় চাপেকর ভাইরা—দামোদর, রামকৃষ্ণ ও বাসুদেব প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড আর আয়ার্ষ্ট-কে হত্যা করে ফাঁসি গেলেন : তাঁদের এক সহযোগী মহাদেব রানাডে-ও দণ্ডিত হলেন মৃত্যুদণ্ডে। এমনই যখন আবহাওয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে বসলেন লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর দুর্বিনীত বাংলাকে শায়েস্তা করতে বঙ্গভঙ্গ করে। শায়েস্তা হয়ে শান্ত হবে কি, ফল হ'ল উল্টো, বাংলাকে কেন্দ্র করে সমুত্থিত এই ঝটিকা প্রবাহে বৃটিশ বিরোধিতার বীজ পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। সুরেন্দ্রনাথ এ সময়ে সারেণ্ডার নট হয়ে বঙ্গভঙ্গরূপী সেটলড্ ফ্যাক্টকে আনসেট্ল—করে ছাড়লেন ১৯১১-তে। দুটো মোক্ষম কাজ কিন্তু করে ফেললেন ইংরেজরা এই ফাঁকে। মূলতঃ মুসলিমদের খুশী করতে বৃটিশ ভারতের রাজধানী ঐ ১৯১১-তে স্থানান্তরিত করা হ'ল কোলকাতা থেকে সুদূর দিল্লীতে। আর লর্ড মিণ্টো সিমলাতে আগা খাঁ-কে আমন্ত্রণ জানিয়ে যথেষ্ট তোয়াজ করে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার সহায়তায় ১৯০৬ সালে জন্ম দিয়ে ফেললেন মুসলীম লীগ দলের। মুখ্যতঃ মুসলমান শাসকদেরকে হটিয়ে ভারতভাগ্য-বিধাতা সেজে বসেছিলেন তাঁরা—এখন তাঁদেরকে তোষণ করার ছলে আসলে স্বশাসনের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সুদূরপ্রসারী কৌশলী বন্দোবস্ত করে ফেললেন একটা।

বিলাতী বর্জন কথাটাকে অনেকে কংগ্রেসের মস্তিস্কপ্রসূত বলে মনে করেন; আসল ব্যাপার কিন্তু আদৌ তা নয়। ওই বিষয় নিয়ে এক মারাঠি পত্রিকা "প্রভাকর"-এ ১৮৪৯-এ যখন এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তখন কোথায়? বাঙ্গলাতে এই ধারণাটা প্রথম আমদানী হ'ল ১৮৬৭ সালে জনৈক ভোলানাথ চন্দ্র মারফৎ। "সঞ্জীবনী"-পত্রিকার ১৯০৫-এর ১৩ই জুলাই সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এক সহযোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র এই বিষয় নিয়ে বেশ জ্বালাময়ী একটা প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করলেন, আর এরই কয়েকদিন পরে ঐ সালেরই ৭ই আগষ্ট কোলকাতার টাউন হলে সভা করে জোরদার প্রস্তাব ই একটা নিয়ে ফেলা হ'ল এ প্রসঙ্গে।

উক্ত ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় ঘটলে দুটো ঘটনা—প্রথমতঃ চরম অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল ইংরেজরা যার প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ—বঙ্গভঙ্গ যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় ঘটনা যা ভারতের পক্ষে সুদূরপ্রসারী হয়ে দেখা দিল, তা হ'ল দেশীয় শিল্পের প্রসার। আচার্য্য প্রফু-চন্দ্র রায়, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ শিক্ষাব্রতীবৃন্দও পর্য্যন্ত তখন স্বদেশীয়ানা প্রচারে সোচ্চার।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বিলাতে ছাত্রাবস্থায়ই ১৮৯১ সালে ভারতীয়দেরকে নিয়ে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সুরু করে দিয়েছেন বিপ্লবীয়ানা :—১৮৯৩ সালে যে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার নবতর বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা পৌঁছে দিচ্ছেন বিশ্বের

দরবারে, ঠিক সে বৎসরই বরোদা কলেজে শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করে ভারতের বুকে শ্রীঅরবিন্দ সুরু করে দিয়েছেন অনন্তপূর্ব আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক বিপ্লববাদ-এর প্রচার। বরোদা ছেড়ে যাদবপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ ক'রে কোলকাতায় অল্পদিন পরে প্রত্যাবৃত হলেন তিনি যখন, এখানে পেয়ে গেলেন কাম্য উর্বরতর ক্ষেত্র একখানি—আর সোৎসাহে পুরোদমে চালিয়ে চললেন তাঁর সেই আরব্ধ কাজ। ভাই শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ এ সময় থেকেই যোগ্য সহযোগী তাঁর। শুধু কোলকাতায় নয়, সারা বাংলা ছাপিয়ে সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়তে সুরু করলেন বারীন্দ্রনাথের শিষ্য প্রশিষ্যেরা। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ যেন মূর্ত্তরূপ পেতে সুরু করল শ্রীবারীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হতে সুরু করল বাংলার তথা ভারতের উজ্জীবিত যুবশক্তি।

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হ'ল অনুশীলন সমিতি, আর মাত্র দু'বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের মধ্যেই গড়ে উঠল 'স্বদেশ বান্ধব', ব্রতী, ঢাকা অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রমুখ তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী দলসমূহ। তাদের স্পষ্ট কথা—অস্ত্র না ধরে বৃটিশ বিতাড়ন সম্ভব নয় আদৌ। প্রয়োজনীয় ইন্ধন যোগান দিয়ে চলে তৎকালীন পত্র পত্রিকাসমূহ।

১৯০৬ সালে বারীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন সাপ্তাহিক যুগান্তর পত্রিকা। উত্তেজক খবরাখবর আর প্রবন্ধাদি লেখা হতে থাকল তাতে। পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দের বন্দে-মাতরম, হিতবাদী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা ইত্যাদ পত্রিকাসমূহ অসির চেয়ে যে মসী অধিকতর শক্তিশালী—রাখতে থাকল তার প্রোজ্জল পরিচয় ঐ সব পত্রিকায় প্রকাশিত জ্বালাময়ী প্রবন্ধাদির মাধ্যমে। ইংরেজ সরকারের দমন পীড়ন উপেক্ষা করেই অব্যাহত চলতে থাকল এ সব। শাস্তিপ্রাপ্তও হতে হয় পত্রিকা কর্ত্তৃপক্ষকে। উত্তেজনা ছড়ানোর খেসারত দিতে সাপ্তাহিক যুগান্তর-এর সম্পাদক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-কে দেশান্তরী হতে হ'ল, আর "সন্ধ্যা"-র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আত্মাহুতি দিলেন কারান্তরালেই। বারীন্দ্রনাথ ঘোষও বেশ কিছুদিন কারারুদ্ধ থাকার পর মুক্ত হয়েই স্বেচ্ছা নির্বাসন নিলেন পণ্ডীচেরী আশ্রমে। তৎসত্ত্বেও এসব উপেক্ষা করেই উত্তরসূরীরা অব্যাহত রাখেন তাদের বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ। ১৯০৮ সালে শহীদ ক্ষুদিরামের হাসি-হাসি-ফাঁসী তৎকালীন এই পরিবেশেরই এবং এই বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়ায় বৃটিশ সরকার আরোপিত দমন-পীড়নের প্রকৃষ্ট ও প্রতিনিধি স্থানীয় ফলশ্রুতি।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে যখন এই অবস্থা, ওদিকে পশ্চিম প্রান্তে মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক ব্যাঘ্রগর্জনে হাঁক দিচ্ছেন—"স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার"; আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্ আন্দোলন, আর বিদেশী বিপ্লবী ক্যাভুর, গ্যারিবল্ডী, ম্যাৎসিনি প্রমুখদের জীবনী ও বাণী চরম উন্মাদনা যুক্ত করে এই চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী চিন্তাভাবনায়। পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার পথ ধরে এঁদের কাহিনীও তখন আসতে সুরু

করেছে ভারতাভ্যন্তরে। শুধু কি তাই, এদের সঙ্গে যুক্ত হয় ভারতীয় প্রাচীন ভাব-ধারার নব্য ব্যাখ্যাসমূহ। গীতোক্ত শারীর অনিত্যতার শিক্ষা, বন্দে-মাতরম-এর মাতৃমূর্ত্তি ও মাতৃপ্রীতির নবতর দীক্ষা—এ সব তো ছিলই, এদের সঙ্গে যুক্ত হয় স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তের বাস্তবায়নের ব্যাখ্যা, ভগিনী নিবেদিতার আন্তরিক মদত, শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মবাদী জাতীয়তাবাদের ধারনা—এবং সব মিলে বর্ঙ্গীয়ান হয়ে ওঠে এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাদেশিকতা। শত্রু হত্যা বিশেষতঃ ইংরেজ হত্যা আর যাই হোক, অন্ততঃ নরহত্যার পাপ নয়—এমনই একটা বোধ আচ্ছন্ন করে তোলে ভারতীয় সাত্ত্বিক যুবমানসকেও। গত শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে সুরু করা "শিবাজী উৎসব", 'গণেশ উৎসব' জাতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বীর কাহিনীতে আধ্যাত্মিকতা যুক্ত করে বর্দ্ধিত করার চেষ্টা করা হয় সেই অনির্বাণ উৎসাহকে। সন্ত্রাস, লুণ্ঠন, হত্যা—এ জাতীয় নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডসমূহও স্বাদেশিকতার মানদণ্ডে বন্দনীয় হয়ে ওঠে।

মাদাম কামা জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে তেরঙ্গা পতাকা ওড়ালেন ১৯০৭ সালে : মাঝখানে লেখা বন্দেমাতরম আর আঁকা লম্ফনোদ্যত ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ;—ভারতীয় জনগণের যুদ্ধস্পৃহার প্রতীক যেন তা। আখ্যাত করা হ'ল তাঁকে ভারতীয় "সন্ত্রাসবাদের জননী" রূপে। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে—শত্রুর শত্রু, অতএব আমার মিত্র এই বিচারে জার্মানীর কাইজার ভারতে জাহাজ বোঝাই পিস্তল পাঠাচ্ছেন। পিস্তল অবশ্য ভারতীয়দের হস্তগত হ'ল না—মাঝখান থেকে প্রাণ দিতে হ'ল বাঘা যতীন প্রমুখ বীরশহিদবর্গকে।

দেশীয় পদ্ধতিতে বোমা তৈরীর কাজও চলছিল সমান-তালে। কখনো ধরা পড়ে, কখনো বা মিথ্যা অভিযোগে অত্যাচার, লুণ্ঠন, নির্য্যাতন ইত্যাদির শিকার হচ্ছেন এমনকি নিরপরাধ নারী ও কিশোররাও—আর বিচারের প্রহসনে দোষী সাব্যস্ত করে নানান মানের দণ্ড—নির্বাসন এমনকি ফাঁসিও হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যদিনের ঘটনা। আলিপুর, মুরারীপুকুর—এ সব মামলার জেরবার হচ্ছেন এঁরা সব। এমনি এক মামলায় গ্রেপ্তার এড়াতে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা—যা ফাঁস হয়ে গেল কৃপাল সিং নামক এক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে—সেই যে ১৯১৫-তে রাসবিহারী বসু দেশ-ত্যাগী হয়ে জাপানবাসী হলেন—সেখানে থেকে বৃটিশ-বিরোধী প্রচার ও সংগঠন চালিয়ে যেতে থাকলেন তিনি। ভারতের বিদ্রোহের বার্ত্তা পেঁছে যেতে থাকে বিশ্বের নানান কোণে : বিশ্বের নানান প্রান্তের বিদ্রোহ-বার্ত্তাও ভরিয়ে তোলে, ভারী করে তোলে ভারতের আকাশ-বাতাস।

ইংল্যাণ্ডের শাসন মুক্ত হতে আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতা ডি· ভ্যালেরা প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আপন দেশে গড়ে তুলেছেন এক সমান্তরাল সরকার—ভারতেই বা তা সম্ভব নয় কেন ? এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে মাদ্রাজের আদ্যিয়ারে ১৯১৬ সালে অ্যানি বেসান্ত গড়ে তুললেন 'হোমরুল আন্দোলন' ;—ঐ একই বৎসরে বাল গঙ্গাধর তিলক বোম্বাইতে কংগ্রেস অধিবেশনে দুর্বার করে তুলতে সচেষ্ট হলেন সেই 'হোমরুল

আন্দোলন'কে। তখন তখনি অবশ্য করা গেল না কিছুই—অদূর ভবিষ্যতেও যে কিছু কার্য্যকরী করা যাবে—সে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেল ১৯১৯ সালে তিলকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

ওদিকে ১৯১৭ সালে দুর্দ্ধর্ষ জারকে হঠিয়ে দিয়ে রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে গিয়েছে সমাজতান্ত্রিক সরকার—সে বার্ত্তাও ভারতের অগ্নিযুগের অগ্নিশিখাকে আগ্রাসী করে তোলে। কংগ্রেসের মূল স্রোতে অবশ্য তখনো মোটের উপর নিস্তরঙ্গ জোয়ার-ভাঁটার নিরুত্তাপ দৈনন্দিনতা—সেই যে ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেস থেকে সুরু হয়ে গিয়েছিল নরমপন্থী বনাম চরমপন্থী দ্বন্দ্ব—তখনো তার রেশ কাটেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজি ভারতে ফিরলেন ১৯১৫-তে। সেখানে থাকতে ১৯১২ সালে তিনি সুরু করেছিলেন যে পরীক্ষা-যে রাজনৈতিক লড়াইও অহিংস থেকেও করা সম্ভব -সেই সত্যাগ্রহের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মোটের উপর সাফল্যের সঙ্গেই উৎরেছেন তিনি। জৈন ধর্মাবলম্বী তিনি, প্রকৃত অহিংসা-ই একান্ত পাল্য মূলমন্ত্র তাঁর—ভারতে এসেই প্রতিষ্ঠা করলেন সবরমতি আশ্রম ১৯১৬ সালে। ভারতীয় রাজনীতিতে হাতে খড়ি হ'ল তাঁর চম্পারণ সত্যাগ্রহ দিয়ে, আর এর কিছু পরেই এক অবিশ্বাস্য পদক্ষেপ নিয়ে বসলেন তিনি—১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল ডেকে দিলেন সারা ভারতে সর্বাত্মক হরতাল একটি, কুখ্যাত রাউলাট এ্যাক্টের প্রতিবাদে। যেভাবে ভেবেছিলেন গান্ধীজি—ধর্মঘটটি সেরকম অহিংস থাকল না—হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠল অচিরেই; গান্ধীজির পক্ষে এ জাতীয় বিচ্যুতি সহ্য করার কথা নয়—তাই "হিমালয় সদৃশ ক্রটি" স্বীকার করে নিয়ে বাধ্য হলেন প্রত্যাহার করতে এ হরতাল।

১৯১৯ সালের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সূচনা হ'ল তথাকথিত "গান্ধী কংগ্রেস" অর্থাৎ গান্ধী যুগের সূচনা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর কারণে তাঁর এই নেতৃত্ব হয়ে উঠল অপ্রতিদ্বন্দী। আরও বিশেষ যে কয়েকটি ঘটনার কারণে গান্ধীজির এই নেতৃত্ব অবিসংবাদী হয়ে উঠল তা নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:—

দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর অনুসৃত কর্মধারা ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের মনে ইতিপূর্বেই এক পরম বিমুগ্ধতার বাতাবরণ তৈরী করেছিল, এর পরে যখন তিনি ফিরলেন সেখান থেকে তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন এখানেও অব্যাহত থাকাতে বেশ ভালো রকম বিশ্বাসযোগ্যতা তিনি আদায় করতে সমর্থ হলেন তাঁদের কাছ থেকে। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেছেন তিনি—অথচ আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তায় মনে করা যেতেপারে যেন তিনি সাধারণতম বাড়ীরও যে কোনও একজন। রাজনীতির যে উচ্চমার্গীয় (Elitist) চরিত্র তা আমূল বদলে দিতে সমর্থ হলেন তিনি।

বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িকতা তাঁর রাজনীতির আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর মক্কেলরা ছিল প্রায় সবাই মুসলমান—এখানে সেকারণে তাঁদের প্রীতিভাজন তো তিনি ছিলেনই এর উপর খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করে

তাঁদের আরও অনেক বেশী প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন তিনি। রাউলাট এ্যাক্টের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে যে সর্বভারতীয় হরতাল ডেকেছিলেন তিনি, তাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ছিল কি সংখ্যার বিচারে, কি আন্তরিকতার বিচারে এককথায় অভূতপূর্ব। 'মুসলিম লীগ' দল একটা ছিল ঠিকই—কিন্তু তাদের ভূমিকা তখন ছিল ইংরেজদের "স্বশাসনের প্রয়োজনে বিভাজন" নীতির উস্কানীতে হিন্দুবিদ্বেষী এবং আপন স্বার্থরক্ষায় তৎপর। এই প্রথম কোনও একটা সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের যৌথ অংশগ্রহণে।

আরও একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এ প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য। এ যাবৎ যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা ভারতবর্ষে সমাজসেবার ব্রত নিয়ে জীবনপাত করেছেন তাঁরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন ক্বচিৎ। রামমোহন রায়কে বাদ দিলেও বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ এঁরা তৎকালীন কংগ্রেস কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। মহামতি ফুলে দয়ানন্দ এঁরাও কেবল সামাজিক এবং/অথবা ধর্মীয় ব্যাপার মাত্রে আগ্রহী ছিলেন। এমন আরও অনেকেরই নাম করা যায়। রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যাঁরা তাঁরাও ছিলেন অনুরূপভাবে সমাজ-সম্পর্কিত ব্যাপারে মোটের উপর নিস্পৃহ। গান্ধীজি এ ব্যাপারে প্রথম ব্যতিক্রম। সমাজসেবার সঙ্গে রাজনীতিকে সার্থকভাবে সংযুক্ত করতে সমর্থ হলেন তিনি। এ কারণেও বটে, ব্যাপকতায় এবং বিশ্বস্ততায় স্বতঃগৃহীত হলেন তিনি ভারতীয় জনমানসে।

গান্ধীজির এই ভূমিকা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সক্রিয় সমর্থনে ১৯২০ সালে গৃহীত অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত করতে সমর্থ হ'ল তৎকালীন অগ্নিযুগের কার্য-কলাপকেও। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল হিন্দু যুবশক্তির আদর্শনিষ্ঠ, কিন্তু বিচ্ছিন্ন বহিঃপ্রকাশ: অন্য সম্প্রদায়ের যুবকেরা যেমন এতে সামিল হ'ননি তেমনি ব্যষ্টির আত্মবলিদান দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে সমষ্টির ভূমিকা সেখানে কি হওয়া বাঞ্ছনীয় তারও তেমন হিসেব-নিকেশ করা হয়নি। আর বিশেষতঃ মুসলিম যুবকেরা যে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন তার সুযোগ কোথায়? গীতা স্পর্শ করে মাতৃমূর্ত্তির সামনে বন্দেমাতরম উচ্চারণ করে বিশ্বস্ততার পরীক্ষা দিয়ে নেতৃবৃন্দের আস্থা অর্জন করতে হবে, এই যদি রীতি হয়, মুসলিম যুবশক্তির তবে সেক্ষেত্রে যোগদান সম্ভব কতটুকু! গান্ধীজি তাই এদের পালের হাওয়া কেড়ে নিতে আপাতত সমর্থ হলেন অনেকটাই। এর সঙ্গে অবশ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে তাদের নিরস্ত করতে এসময় একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন তাও উল্লেখ করতে হয়। সফল ব্যারিষ্টার হিসাবে, বিশেষতঃ এঁদের হয়ে একান্ত আন্তরিকায় মামলা মোকাবিলা করার কারণে এঁদের খুবই আস্থাভাজন তিনি।

সন্ত্রাসবাদের আহ্বান ছিল অধ্যাত্মভিত্তিক কিন্তু সহিংস ও ব্যষ্টি নির্ভর, গান্ধীজির আহ্বান কিন্তু ছিল অধ্যাত্মভিত্তিক, অহিংস ও সমষ্টিনির্ভর। চাপেকর ভাইদের

থেকে সুরু করে বাঘা যতীন পর্য্যন্ত জীবন হানিই হয়েছে কিছু, বিনিময়ে কাঁজের কাজ হয়েছে কতটুকু ? তাঁদের প্রয়াস তাই বিচ্ছিন্ন থেকে গেলেও গান্ধীজি অনায়াসে আচ্ছন্ন করতে সমর্থ হলেন আপামর জনসাধারণকে। ভারতীয় শুদ্ধ, সাত্ত্বিক ও শান্তিপ্রিয় মানসিকতা যে বিচ্ছিন্ন ও ব্যষ্টিভিত্তিক সহিংস আধ্যাত্মিকতার তুলনায় সংহত সমষ্টিগত অহিংস আধ্যাত্মিকতায় অধিকতর আকৃষ্ট হবে তা ত' স্বাভাবিক। অবশ্য গান্ধীজির দোলাচল চিত্ততা ও দু'পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে আসার কারণে মাঝে মাঝে এই উগ্রপন্থা সোচ্চার হতে চেয়েছে ঠিকই ;—আর সুভাষচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা সেইখানে। দু'পা যখন এগিয়ে যান গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র সমর্থন করেন সে পদক্ষেপ সর্বান্তঃকরণে, কিন্তু আপন ভূমিকায় অচল না থেকে পশ্চাদপসরণ করেন যখন তিনি, সহ্য হয় না তাঁর ; অথচ সক্রিয় সন্ত্রাসবাদীও হতে পারেন না তিনি আপনার বিশেষ অবস্থান-এর কারণে ;—তাঁদেরকে সমর্থন করেন তিনি, অথচ তাঁদের নিষ্কলুষ দেশপ্রেমকে যে সমন্বিত করবেন মূল স্রোতের সঙ্গে স্বয়ং গান্ধীজিই এবং তাঁর অনুগামীরা সে প্রয়াসে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন বারবার। শহীদ ক্ষুদিরাম তাই ব্রাত্য কংগ্রেসের চোখে, গোপীনাথ সাহার ফাঁসি যে নিন্দনীয় এমন একটা নির্বিষ প্রস্তাবও পাশ করানো যায় না কংগ্রেস অধিবেশনে– সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি গান্ধী—আর উইন যুক্তির শর্ত হলেও ভগৎ সিং প্রমুখেরা মুক্ত তো হ'ন-ই না, ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হ'ন তাঁরা।

সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহে পূর্বে উল্লিখিত "বেঙ্গল লাইন" এর প্রাগ্রসর আধুনিকতা। রাজনীতি, সমাজ সচেতনতা, আধ্যাত্মিকতা এ সব তো ছিলই তাঁর মধ্যে, এ সবের সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ হলেন তিনি সন্ত্রাসবাদসুলভ চরমপন্থাও। সমাজতন্ত্রবাদী প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এসব তো এদের সঙ্গে ছিলই। পরিণতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অবতীর্ণ হতে হ'ল তাকে সঙ্কটসংকুল সমরাঙ্গনে। তখন তাঁর ভূমিকা কেবলমাত্র ইংরাজ প্রভুত্বের স্বার্থসর্বস্ব আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নয়, ভারতীয় নেতৃত্বের আপসসর্বস্ব আচরণের বিরুদ্ধেও। গান্ধীজি ভুল করলেও সুভাষচন্দ্র কিন্তু কোনো-দিনই ভুল বুঝেন নি তাঁকে ; আর গান্ধীজি যে বরাবরই ভুল বুঝে এসেছেন সুভাষচন্দ্রকে, সুভাষচন্দ্রের এই ভূমিকার আদলে আপন আন্দোলন—১৯৪২-এর আগস্টে সুরু করে,—সর্বশেষ ভুল ভাঙল তাঁর। আজীবন ভিন্নমতের সমর্থক হয়েও শেষ পর্য্যন্ত যে উভয়ে পথিক হতে বাধ্য হলেন প্রায় সম-পথের তাঁর পরিণতিতে কিন্তু পরম অভীপ্সিত সম্মিলন ঘটল না উভয়ের—বড়ো করুণ সে ইতিহাস। আপাততঃ সে কথা থাক্—

প্রক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ ছেড়ে পুরানো কথায় ফিরে আসা যাক্। একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের আচরণ আর অন্যদিকে কংগ্রেসের মূলস্রোতের আন্দোলন যখন চরম অস্বস্তিতে ফেলেছে ইংরাজ সরকারকে—তখন তাদের ভূমিকাটি কি ? একদিকে মুখ্যতঃ সন্ত্রাস-

বাদীদেরকে রুখতে ব্যাপক ধরপাকড়, লুণ্ঠন, নির্য্যাতন, নির্বাসন এমনকি ধর্ষণও চলছিল যেমন, অপরদিকে তেমনি চলছিল স্রেফ ধাপ্পার রাজনীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গিয়েছে, ভারতের সহায়তা চাই ;—ভারতসচিব মণ্টেগু ১৯১৭ সালে ঝুড়ি-ঝুড়ি প্রতিশ্রুতির পশরা সাজিয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে প্রলুব্ধ করে আদায়ও করলেন কাম্য সহায়তা। কিন্তু হায়! যুদ্ধ শেষ হতে কোথায় কি? অন্যান্য সহায়তা ছাড়াও প্রায় দশ সহস্রাধিক ভারতীয় নাগরিক জীবন দান করলেন এই যুদ্ধে—বিনিময়ে প্রাপ্তি ঘটল ১৯১৯ সালের মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড আইন—প্রতিশ্রুতির ছিটে ফোঁটাও পূরণ করা হয়নি তাতে : ঐ সালেই প্রবর্ত্তিত হ'ল কুখ্যাত রাওলাট এ্যাক্ট, দমন পীড়নের কঠোর নিগড়ের ব্যবস্থাপত্র সেখানে—আর এসব কিছুকে ছাপিয়ে ঐ সালেই ঘটল মর্ম্মান্তিক জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ১৩ই এপ্রিল-এ—সুসভ্য বৃটিশ সরকারের সুশোভন প্রতিদান।

অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল অসহযোগ আন্দোলন। ১লা আগষ্ট ১৯২০-তে সূচনা হ'ল তার। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন এ প্রস্তাবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অবশ্য প্রথম প্রথম যথেষ্ট সন্দিগ্ধ ছিলেন এ ধরনের আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে, পরে তিনি এতে কেবলমাত্র যে দ্বিধাহীন সমর্থন জানালেন তাই নয়, সমর্থও হলেন কংগ্রেসী—বামপন্থী ও চরমপন্থীদের বেশ বড়ো একটি অংশকে এ-আন্দোলনের সামিল করতে। তাঁরাও সন্দিগ্ধই ছিলেন এ আন্দোলনের সাফল্যের ব্যাপারে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের আগ্রহাতিশয্যে নিরস্ত হলেন তাঁরা। স্বয়ং গান্ধীজির তুলনায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন যে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য এঁদের কাছে এ কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

এ সময়েই গান্ধীজি দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করলেন—মাত্র এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আদায় করে দিবেন তিনি। পরিণতি কিন্তু ঘটল নিতান্ত হতাশাব্যঞ্জক। স্বাধীনতা তো এলোই না—উল্টে আন্দোলনই হয়ে গেল প্রত্যাহৃত। কারণ চৌরি-চৌরায় সংঘটিত চরম অনভিপ্রেত দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা। অহিংস এক সত্যাগ্রহী মিছিলের অংশগ্রহণকারীগণ ওখানকার থানার কর্মীবৃন্দ কর্তৃক উত্যক্ত ও প্ররোচিত হয়ে, পরিশেষে ঐ থানায় অগ্নিসংযোগ করেছে এবং বাইশজন থানা কর্মীর মৃত্যুর কারণ হয়েছে। অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী গান্ধীজির বিবেক এমন ঘটনার পরেও এ আন্দোলন অব্যাহত চালিয়ে যাবেন তাও কি সম্ভব? এবার আর নিজের "হিমালয় সদৃশ ত্রুটি" নয়, সত্যাগ্রহীদের ত্রুটিপূর্ণ আচরণের কারণে পিছু হঠলেন তিনি। সংযম, সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা—সত্যাগ্রহীদের ক্ষেত্রে এসবের পাঠ আরও গভীর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই তাঁর।

মর্ম্মাহত হলেন চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু প্রমুখ প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ। পুরাতন পন্থী (No-changer) গান্ধীবাদীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে গড়ে উঠল পরিবর্ত্তন পন্থী (Pro-changer)-দের একটি উপদল। পরিবর্তন পন্থীরা চাইলেন আইনসভায়

প্রবেশ করে উত্যক্ত করে ছাড়বেন ইংরেজ সরকারকে—এ ছাড়া ওদেরকে ধরা ছোঁওয়ার নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছেই বা কোথায়! গড়ে তোলা হ'ল কাউন্সিল পার্টি;—অবশেষে গয়া কংগ্রেসে ১৯২২ সালে কংগ্রেস দল বিভাজিত-ই হয়ে গেল দু'টুকরোতে। কিছুদিন না যেতেই গড়া হ'ল স্বরাজ্য দল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন তার সভাপতি আর সম্পাদক শ্রী মতিলাল নেহেরু।

আই. সি এস ছেড়ে বিলেত প্রত্যাগত আধুনিক মনের যুবক সুভাষ ১৯২১-এ যোগ দিলেন বিলেত প্রত্যাগত কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়ত্বে প্রত্যাবৃত প্রৌঢ় গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসে, গান্ধীজির অল্প পরে প্রায় সমসময়ে। গান্ধীজির বয়স তখন পঞ্চাশোর্দ্ধ! সুভাষচন্দ্র তাঁর আধ-বয়সীও নন—উনপঁচিশ।

বোম্বাই-তে ২১শে জুলাই ১৯২১-এ উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনেই মত-দ্বৈধতা। দ্বৈরথ সুরু হতে দেরী হয় নি আদৌ—নবীনের সঙ্গে প্রবীণের, আপস-বিরোধিতার সঙ্গে আপসকামিতার, শৌর্য্যের সঙ্গে ধৈর্য্যের, সংগ্রামের সঙ্গে সংযমের, অস্থিরতার সঙ্গে মন্থরতার, সাহসিকতার সঙ্গে সহিষ্ণুতার এবং সর্বোপরি এক বিস্ময়কর বিদ্রোহকারীর সঙ্গে এক বিনীত বাদানুবাদকারীর।

সুরু হয়ে গেল ঐতিহাসিক গর্ডনের ভাষায় নেতাজীর সঙ্গে গান্ধীজির "রোদ ও মেঘের খেলা"-র দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্ক। ১৯২১ থেকে সুরু হয়ে দীর্ঘ প্রায় দু'দশক অব্যাহত থাকল এই খেলা,—এই রোদ, এই মেঘ; এই আলো, এই ছায়া—এমনি ধারায় চলতে চলতে চরমে পৌঁছল ১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্রের ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার পর কংগ্রেসের আদৌ সদস্যপদ থেকে নির্বাসিত হওয়া পর্য্যন্ত। অবশ্য এর অল্পদিন পরেই গান্ধীজি যখন আপন অনুগামীবর্গের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও বটে অনুধাবন করতে পারলেন সর্বাগ্রগণ্য দেশভক্ত (Prince among Patriots) সুভাষচন্দ্রের গুরুত্ব, যখন হয়তো বা সূচিত হতে পারত চিরন্তন রোদ আর আলোর উজ্জ্বল সম্পর্ক,—সুভাষ-সূর্য্য তখন অস্তমিত না হলেও অন্তর্হিত তো বটেই! সে অবশ্য অনেক পরের কথা।

কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রবেশ ও অগ্রগতিতে এবং আনুগত্যহীন স্বকীয়তার কারণে আশংকিত বোধ করেন গান্ধীজি! আপন অভীপ্সামত অহিংস ও নিরস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি সহিংস ও সশস্ত্র সন্ত্রাসের সমান্তরাল যে ধারা অন্তরালেই ছিল এতদিন, তা কি তবে কলুষিত করবে, বিভ্রান্ত, বিচলিত করবে গান্ধী-আন্দোলনের অগ্রগতিকে?

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে পরিদৃশ্যমান হয় এক নোতুন অংকের সূচনা।

ছাত্র কটকে

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী। দুপুর বারোটা বেজে দশ মিনিট। উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করলেন এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। নাম রাখা হ'ল তাঁর সুভাষচন্দ্র। বাবা জানকীনাথ বসু, মা প্রভাবতী দেবী। জানকীনাথের পৈতৃক ভিটা চব্বিশপরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে কিন্তু কর্মব্যপদেশে কটকবাসী জানকীনাথ সপরিবারে। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী তিনি ওখানকার, পাবলিক প্রসিকিউটরও বটেন। বৃটিশ সরকার রায়বাহাদুর খেতাব দিয়ে পরম সম্মানে বিভূষিত করেছে তাঁকে। বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি তিনি—অশেষ সম্পদশালীও। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান—এ জাতীয় নানান সেবামূলক জনহিতকর কাজের সঙ্গেও যুক্ত তিনি। বাড়ীতে সব মিলিয়ে রীতিমত বিলাতী আবহাওয়া। বড়ো বাড়ীর আদব কায়দা মেনে পুত্র-কন্যাসমূহের দেখাশোনার ভার পরিচারক-পরিচারিকাদের ওপরে।

জানকীনাথের ছয়টি পুত্রসন্তান—সতীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুধীরচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, সুনীলচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র সর্বকনিষ্ঠ। এ ছাড়া আটটি কন্যাসন্তানও তাঁর। আর্থিক স্বাচ্ছল্যের কারণে খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-আসাক, পড়াশোনা, স্বাস্থ্যরক্ষা, আবাস-ব্যবস্থা কোনো ব্যাপারেই আদৌ ত্রুটি নাই কোথায়ও। এত সবের পরেও সর্বকনিষ্ঠ হওয়ার কারণে সুভাষচন্দ্র ওরফে "সুবি"-র সমাদর সবার চেয়ে বেশ বেশী-ই।

স্বদেশী আন্দোলনের সামান্যতম আবহাওয়ারও অনুপ্রবেশ দারুণভাবে নিষিদ্ধ সে বাড়ীর অন্দরমহলে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আর ১৯০৮-এর ক্ষুদিরামের ফাঁসির মতো আলোড়নকারী ঘটনাবলীও তেমন কোনো অনুরণন তোলে না সেখানে। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা নেহাৎ খেলার ছলে তাদের পড়ার ঘরে যে মাঝে মাঝে খবরের কাগজ থেকে বিপ্লবীদের ছবি কেটে নিয়ে দেওয়ালে সেঁটে রাখত, তাও পর্য্যন্ত কঠোর-ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এক পুলিসে চাকুরীরত দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের পরামর্শক্রমে, —রায়বাহাদুর খেতাবধারী রাজভক্ত প্রজার সুনামে সামান্যতমও কালিমালেপন হয় যদি—এই আশংকায়। শুধু তাই নয়, সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সম্রাটের প্রশস্তিমূলক এক প্রবন্ধ লিখিয়ে অংশ-গ্রহণ করানো হয়েছে স্বয়ং কিশোর সুভাষচন্দ্রকে।

এমন বাড়ীর পরম আদরের সন্তান যে পাশ্চাত্য ভাবধারায় পড়াশোনা করবে, তাই তো খুবই স্বাভাবিক :—সুভাষচন্দ্রকে ভর্তি করে দেওয়া হ'ল এক মিশনারী স্কুলে—প্রোটেস্টান্ট ইউরোপিয়ান স্কুলে। ইংরাজী মাধ্যমে পড়াশোনা হয় সেখানে, পোষাকও পরতে হয় খুব স্বাভাবিক কারণেই সাহেবী। আদব-কায়দাও পুরোপুরি পাশ্চাত্য আদলের। ১৯০২-তে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে সেখানে ভর্ত্তি হয়ে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত মোট সাত বৎসর সে স্কুলে পড়াশোনা করলেন। ছাত্র হিসাবে যথেষ্ট মেধাবী

ছিলেন সুভাষচন্দ্র ; সে কারণে যথেষ্ট কৃতিত্ব ও সুনামের সঙ্গে সেখানকার পাঠ সমাপন করলেন তিনি। কেবলমাত্র ছাত্র হিসাবেই নয় ; অন্যান্য বিচারেও সবার নজর কাড়তে সমর্থ হ'ন সুভাষচন্দ্র। কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা, সুষ্ঠ শৃঙ্খলাবোধ, শ্রদ্ধাবোধ ও যূথপ্রীতি, সময়ানুবর্ত্তিতা ও আত্মসম্মানবোধ—এ সবের একটা প্রাথমিক পাঠ তাঁর নেওয়া হয়ে গেল এই বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ চলাকালীন।

১৯০৯ সালে র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম—তখনকার হিসাবে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলেন সুভাষচন্দ্র। এটা ছিল সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়, কিন্তু ইউরোপীয়ান নয়। শুধু কি তাই—বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক শ্রীবেণীমাধব দাস ছিলেন বিশুদ্ধ স্বদেশীয়ানায় বিশেষভাবেই দীক্ষিত, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষককুলের আদর্শে বিশ্বাসী। প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই সুভাষচন্দ্র তাঁর সপ্রতিভতায় মুগ্ধ করতে সমর্থ হলেন এই বেণীমাধববাবুকে। সুভাষ-চন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতির হাতেখড়ি বেণীমাধব বাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই।

স্বদেশপ্রীতির স্বার্থে জীবনপাত করতে হবে এমন সুতীব্র গভীরতায় আবিষ্ট সেই কিশোর বয়সে তখনি অবশ্য হ'ন নি তিনি, কিন্তু দেশমাতৃকারূপিণী আলাদা যে মাতৃসত্তা আছে একটি এবং তিনিও যে আপন মাতার মতই দাবী করেন প্রশ্নহীন আনুগত্য—এই বোধে সমৃদ্ধ হলেন তিনি তখন থেকেই। আরও একজনের নাম করতে হয় এ প্রসঙ্গে—তাঁর নাম শ্রীহেমন্ত সরকার, সমবয়সী তিনি কিন্তু সহপাঠী নন সমপাঠী। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র তিনি সে সময় থেকেই ঘনিষ্ঠ আলাপ দু'জনের। তিনিও স্বদেশভক্তির প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ করেন সুভাষচন্দ্রকে।

বেণীমাধববাবুর পরিধানে ভারতের জাতীয় পোষাক। ওনার স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রেরও পরিধেয় তাই। সুভাষচন্দ্রও সুরু করলেন ওখানে দেশী পোষাক পরতে। সেই যে তখন ধুতি পাঞ্জাবী ধরেছিলেন সুভাষচন্দ্র, পরবর্ত্তী জীবনে বিশেষতঃ গান্ধীজির অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির পর থেকে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া এ পোষাক একদিনের জন্যেও ত্যাগ করেননি তিনি। বাড়ীর লোকেরা একটু অবাক হয়েছিলেন প্রথম প্রথম—এত দিনের অভ্যাস এত সহজে তাঁদের 'সুবি' ত্যাগ করল কি ভাবে! সুভাষচন্দ্রের অসুবিধা হয়নি এতটুকুও।

মেধাবী ছাত্র হিসাবে যথেষ্ট সুনাম ছিল সুভাষচন্দ্রের। নোতুন বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা যারা বর্তমানে সহপাঠী তাঁর, আশংকা বোধ করে—হয়তো বা সুভাষচন্দ্র তাদের সবাইকে পড়াশোনার ফলাফলে পেছনে ঠেলে দেবে। অবশ্য কিছুটা আশ্বস্তও বোধ করে তারা এই ভেবে যে ইংরাজী স্কুলের ছাত্র হওয়ার কারণে ও না হয় ভালই ফল করবে ইংরাজীতে—কিন্তু বাংলা, সংস্কৃত এ সব বিষয়ে ও সুবিধা করতে পারবে না নিশ্চয়ই—কারণ ইংরাজী স্কুলে পড়বার ফলে ওগুলো তো ওর ভালো করে জানবার কথা নয়। কিন্তু হার মানবার পাত্র নন সুভাষচন্দ্র ; প্রথম স্থান অধিকার করতেই হবে তাঁকে। স্বকৃত মূল্যায়নে বুঝতে পারলেন—সত্যিই তো বাংলায়

বিশেষতঃ বানানে আর ব্যাকরণে দারুণ কাঁচা তিনি—সংস্কৃতেও তথৈবচ। গোপনে রাত জেগে বাংলা আর সংস্কৃত নিয়ে পড়লেন তিনি, আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে সংস্কৃতে কেবলমাত্র সর্বোচ্চ নম্বরই নয় একশ'র মধ্যে একশ'ই পেলেন আর বাংলাতেও পেলেন সর্বোচ্চ নম্বর। সহপাঠীদের আশংকাকে সত্যি প্রমাণিত করে সবাইকে পেছনে ঠেলে প্রথম স্থানই অধিকার করলেন তিনি প্রথম বৎসরেই—এ স্থান এরপর থেকে বরাবর বাঁধা ছিল তাঁর।

এ পর্য্যন্ত প্রথম হ'ত যে ছাত্রটি—চারু গাঙ্গুলী—শ্রী চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—তাই বলে তিনি যে বিদ্বেষভাব পোষণ করতে সুরু করলেন সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তা কিন্তু মোটেই ঘটল না। সুভাষচন্দ্রের সদ্‌গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্কেই বরং তিনি আবদ্ধ করলেন তাঁকে। এঁদের এই বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট ছিল সারা জীবন। চারুবাবু পরবর্ত্তী জীবনে বিচারকের পদে বৃত হয়ে সরকারী চাক্‌রী করে সারাজীবন কাটালেও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন বরাবর—কতো অন্তরঙ্গ চিঠিপত্রই যে লেনদেন হয়েছিল পরস্পরের মধ্যে।

কেবলমাত্র সু-ছাত্র হিসাবেই নয়, অন্যবিধ সদ্‌গুণাবলীর কারণেও বটে সুভাষচন্দ্র অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ হয়ে উঠলেন সবার—অল্পদিনের মধ্যেই।

ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়ে গেল ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট। শুধু কোলকাতা মাত্র নয় সারা ভারতবর্ষই হয়ে উঠলো উত্তাল। আলিপুর বোমা মামলায় ইংরেজ সরকার জেরবার করে তুলছে বেশ কিছু কিশোর ও যুবককে। কটককে কিন্তু সে সব কাহিনী উদ্বেল করে তোলে না তেমন। বাড়ীতে নাই বা থাকুল সুযোগ, কৌতুহলী ছাত্রের ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ খবর রাখেন সব কিছুর, আর সেই বয়সেই ভাবেন তাঁর কি কিছুই করার নাই এ সম্পর্কে। চুপচাপ নিস্পৃহ থাকতে পারেন না সুভাষচন্দ্র। পত্র-পত্রিকা মারফৎ খোঁজ খবর রাখাই তো যথেষ্ট নয়—কিছু একটা করা চাই। বাড়ীর পরিবেশ নাই বা হ'ল অনুকূল, স্কুলের পরিবেশ তো প্রতিকূল নয় মোটেই। অধৈর্য হয়ে পড়েন তিনি, প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে—পড়ে পড়ে মিথ্যাই মার খাবেন ভারতবাসী আর কতদিন!

১৯১১ সালের ১৫ই আগষ্ট। কতই বা তখন বয়স সুভাষচন্দ্রের, সবে চৌদ্দ পেরিয়েছেন—প্রাপ্তবয়স্ক নন কিন্তু যথেষ্ট পরিণত-মনস্ক। সুযোগ্য নেতৃত্ব গুণে সংগঠিত করে তুললেন ছাত্রদেরকে-অনশন পালন করা হবে ওই দিনটিতে। উপলক্ষ্য—ক্ষুদিরামের অন্যায় ফাঁসি,—প্রতিবাদ হওয়া চাই তার। স্কুল ছাত্রাবাসে সেদিন হ'ল সম্পূর্ণ অরন্ধন। আজন্ম বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদী চরিত্রের প্রথম উল্লেখনীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটল এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। ইংরেজ সরকারের নজর এড়িয়ে যেতে পারল না এ ঘটনা; কিন্তু আইনতঃ কিছুই করা গেল না কিশোর সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহপাঠীদের। মাঝখান থেকে প্রধান শিক্ষক বেণীমাধববাবুকে বদলি করে দেওয়া হ'ল কটক থেকে কৃষ্ণনগরে—ওখানকার কলেজিয়েট স্কুলে—তাঁর শাস্তিস্বরূপ; অপরাধ—কেন তিনি বাধা দেননি এই অবৈধ কার্য্যকলাপে।

সুভাষচন্দ্র চাইলেন এই বদলির বিরুদ্ধেও আন্দোলন করতে; বেণীমাধববাবু বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করেন তাঁকে, তাঁর তো বদলির চাকরী—সেটা রদ করা তো যাবেই না উল্টে এই আন্দোলন করলে হয়তো বা বাড়তি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে বেণীমাধববাবুর।

কেন হয়েছিল ফাঁসি ক্ষুদিরাম বসুর। এক সাহেবের ভারতীয়দের প্রতি স্পর্দ্ধিত ও অশ্রদ্ধেয় উক্তিতে উত্যক্ত ও অসহিষ্ণু হয়ে সুশীল সেন নামে এক কিশোর ঘুসি মেরেছে সেই সাহেবকে, আর সেই অপরাধে তৎকালীন কোলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ কিংসফোর্ড পনের ঘা বেত মারার শাস্তি দিয়েছেন ঐ কিশোরকে। বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে কিশোর সুশীল অজ্ঞান হয়ে গেল। সহ্য হবে কেন ভারতীয়দের উপর ইংরেজ প্রভুর এই ঘৃণ্য অত্যাচার। তৎকালীন বিদ্রোহীদের অবিসম্বাদী নেতা বারীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ এল ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর উপর—কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে হবে। ইতিমধ্যে মি· কিংসফোর্ড বিহারের মজঃফরপুরে বদলি হয়ে গেছেন—মজঃফরপুরেই গেলেন এঁরা। সন্ধ্যার অন্ধকারে কিংসফোর্ডের গাড়ীতে অভ্রান্ত লক্ষ্যে বোমাও ছুঁড়লেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য এঁদের আর সৌভাগ্য মিঃ কিংসফোর্ডের, তিনি তখন ছিলেন না ঐ গাড়ীতে—মারা গেলেন দুই ইংরেজ ললনা—মা ও মেয়ে—মিসেস ও মিস কেনেডি। প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মহত্যা করলেন আর ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে বিচারের প্রহসনে প্রাণ দিলেন ফাঁসির মঞ্চে এগারই আগষ্ট, ১৯০৮-এ।

কটকে থাকতেই ঐ অল্প বয়সে কি সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে কি সেবামূলক কাজকর্মে সমান উৎসাহ সুভাষচন্দ্রের। জানকীনাথ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট উৎসাহী কটক-বাসী বাঙ্গালীরা ওই সময় একবার ঠিক করলেন—দুর্গাপূজা করবেন তাঁরা। কিন্তু দুর্গাপূজা—সে তো বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। পরোয়া নাই সুভাষচন্দ্রের। তাঁর নেতৃত্বে কিশোর বাহিনী এগিয়ে এসে সমাপন করলেন সমস্ত কাজ—চাঁদা তোলা থেকে বিসর্জন পর্য্যন্ত। ওই সময় ঐ যে দুর্গাপূজা-প্রীতি পেয়ে বসেছিল সুভাষচন্দ্রকে, সারাজীবনই তাঁর অব্যাহত ছিল সেই প্রীতি।

প্রতিবেশী পরিজন সবাই অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হলেন সুভাষচন্দ্রের ঐ অল্প বয়সের সাংগঠনিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা দেখে। সুভাষচন্দ্র প্রবল প্রেরণা পান তাঁদের উৎসাহ ও প্রশংসায়। নবতর উদ্যম ও উদ্যোগ নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন নানান সমাজসেবা-মূলক কাজ করতে। একে একে প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন ক্লাব, পাঠাগার, সান্ধ্য বিদ্যালয়, এমনকি হরিসভা, কীর্ত্তনের দল পর্য্যন্ত। পরবর্ত্তীকালে তিনি যে একজন সুযোগ্য নেতা ও দক্ষ সংগঠক হয়ে উঠবেন, তা বেশ বোঝা যেতে লাগল ঐ সময় থেকেই।

নিবিড় পাঠস্পৃহা সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এবং তাঁর এই বিশেষ গুণ লক্ষ্য করা যায় তাঁর বাল্যাবস্থা থেকেই। পরবর্তী জীবনে এমনকি কারারুদ্ধ অবস্থাতেও চরম অসুবিধা সত্বেও কখনও বিরত হননি তিনি এই পাঠস্পৃহা

থেকে। এ সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে বিবেকানন্দ সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশোনা করলেন উনি। বিবেকানন্দ রচনাবলী অবশ্য ওনার পাঠ করার সুযোগ এসেছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার পর। ব্রহ্মচর্য্য পালন নিয়ে অল্পবিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ঐ সময়ে করা হয়ে গেল তাঁর; ত্যাগের এবং সেবার মহান ব্রতে মন তাঁর তখন থেকেই তৈরী হতে সুরু করে ধীরে ধীরে। বিবেকানন্দের ফলিত বেদান্ত (Practical Vedanta) অর্থাৎ বেদান্তের বাস্তবায়নের ব্যাখ্যা বিমুগ্ধচিত্তে হৃদয়ঙ্গম করেন তিনি।

নিরন্ন, ক্লীন্ন, দারিদ্র্য-দীর্ণ ব্রাত্য জনগণকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই যে প্রকৃত ধর্মাচরণ ক্রমে উপলব্ধি করেন তিনি; বিকৃত ভোগের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জ থেকে ক্রমলঘিষ্ঠ নিকৃষ্টতর হওয়া নয়, বরং প্রকৃত ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হবে প্রকৃষ্ট স্বীকৃতি, বরিষ্ট ধ্যেয়—এ সব পাঠ বড়ো আকর্ষিত করত সুভাষচন্দ্রকে। অযুত প্রতাপশালী ও প্রভূত শক্তিধর নৃপতি-প্রতিম ভোগী ব্যক্তিবর্গের অনুতত্ত্বের প্রতিস্থাপনায় কটিবস্ত্রাবৃত ঈশ্বরমাত্রসম্বল যোগী সর্বত্যাগীর অমৃতত্ত্ব অধিকতর শ্লাঘ্য—আমাদের সাত্ত্বিক ভারত ভাবনায়; এমন একটা দৃঢ় ধারণা সুপ্রোথিত হয়ে যায় সুভাষচন্দ্রের মনে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ রূপায়িত করতে একটি সেবাদলও তিনি গড়ে তুললেন কটকে ঐ ছাত্রাবস্থায়। নিরন্নের সেবা, মুমূর্ষু ও আতুর-অথর্বদের সেবা সহযোগীদের সক্রিয় সহায়তায় অব্যাহত থাকল সমান তালে। অভিজাত বাবা,—হয়তো বা পছন্দ করবেন না এমন কাজ তাই সঙ্গোপনেই চলতে থাকে এসব।

বাবার সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের এ আশংকা অমূলক ছিল না একেবারে। হতে পারেন জানকীনাথ নানান সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাই বলে তাঁর ছেলে স্বয়ং অজাত, বেজাত, নীচুজাত, নোংরা, নিরক্ষর, অন্তজদের সঙ্গে মিশবে তাই কি হয়? কিন্তু বিবেকানন্দের ভাবধারায় প্রভাবিত সুভাষচন্দ্র মানবেন কেন সে বাধা। যা উচিত মনে করেছেন, তা সাধন করতে যদি পিতৃদ্রোহীও হতে হয়, পিছপাও হবেন না তিনি। গতানুগতিকতার আগল ভাঙতে এমন ব্যবহার তো বরং অবশ্যম্ভাবীই। তবুও প্রকাশ্যে পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা এড়াতে তাঁকে গোপনেই করতে হত এ কাজ।

একবার বসন্ত দেখা দিল ওখানে। সেই সংক্রামক ব্যাধিতেও ভীত না হয়ে অত্যন্ত সঙ্গোপনেই অব্যাহত চলতে থাকে বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতায় সুভাষচন্দ্রের সেই সেবাকাজ। বেশীদিন অবশ্য গোপন রাখা গেল না সে খবর। একদিন গভীর রাতে বাড়ী ফেরার ফলে পরিচারিকা মারফৎ জানাজানি হয়ে গেল সবকিছু। পরিণামে সুফলই ঘটল অবশ্য—সুভাষচন্দ্রকে নিষেধ করা হ'ল না, বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হল মাত্র। আর জানকীনাথ বসু, তিনি যেহেতু ওখানকার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান, পুত্রের এই পুণ্যকর্ম যেন কাম্য কশাঘাতে জাগিয়ে তুলল তাঁর বিবেক আর কর্তব্যবোধকে। স্বস্কন্ধে তুলে নিলেন তিনি ঐ বসন্ত মহামারী রোগাক্রান্ত জনসাধারণের উপযুক্ত সেবা ও পরিচর্যাভার।

এতো সব করেছেন সুভাষচন্দ্র—জনসেবামূলক কাজকর্ম, এবং সে কারণে মাঝেমধ্যে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরণও, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত নানান বিষয়ে পড়াশোনা, উত্তাল রাজনীতি সম্পর্কিত সাধ্যমত খোঁজখবর রাখা—তবু প্রবেশিকা পরীক্ষায় চমৎকার ফল করলেন উনি। স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা বরাবর বাঁধা ছিল তাঁর। এবার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত ঐ পরীক্ষায় অধিকার করলেন দ্বিতীয় স্থান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে উক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করেছে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত, আর সুভাষচন্দ্র যে সময়ে এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন, সে সময়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি বিস্তৃত ছিল এমনকি সুদূর বার্মাদেশ পর্য্যন্ত। ১৯১৩ সালে সুভাষচন্দ্র উত্তীর্ণ হলেন এ পরীক্ষায়।

অত্যন্ত আশাতীত ছিল এ কৃতকার্য্যতা। সুভাষচন্দ্রের আত্মীয় পরিজন তো দূরস্থান, ভাইবোনেরা এমনকি বাবা-মাও ভাবতে পারেননি তাঁদের আদরের 'সুবি' এমন ফল করবে ঐ পরীক্ষায়। সুভাষচন্দ্রও স্বয়ং আশা করেননি অতখানি। সুভাষচন্দ্র যে তাঁর বহির্মুখী আচরণের ফলে হতাশ করবে তাঁদেরকে, আশংকা করেছিলেন তাঁরা—তেমন কিছু না ঘটার কারণে পরম প্রীত বোধ করেন তাঁরা; আশান্বিত বোধ করেন সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

প্রায় দু' বছর হয়ে গিয়েছে, বেণীমাধববাবু বিদায় নিয়েছেন কটক থেকে—তবু উভয়ের মানসিক সাযুজ্যের কারণে সুভাষচন্দ্র বিস্মৃত হতে পারেন না তাঁকে। তাই এই পরম আনন্দক্ষণে গুরু প্রণামের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনগরে বেণীমাধববাবুর কাছে গেলেন সুভাষচন্দ্র। বেণীমাধববাবু সুভাষচন্দ্রকে আন্তরিক স্নেহ তো করতেনই। এই অভাবনীয় সাফল্যের সংবাদে উৎফুল্লও ছিলেন আগের থেকেই, এখন সুভাষচন্দ্রকে আপন সান্নিধ্যে পেয়ে আবারও প্রাণখোলা আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছায় আপ্লুত করলেন তাঁকে। বেণীমাধববাবুর মতো শিক্ষকেরা তো সু-ছাত্র তৈরী করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না—তাঁরা চান তাঁদের মধ্যে প্রকৃত দেশসেবকও গড়তে। সুভাষচন্দ্রের মতো ছাত্রদের মাধ্যমে তাঁদের সেই সাধনা সিদ্ধিলাভ করবে—এতেই তো এঁদের শিক্ষক জীবনের সার্থকতা!

এবার সুভাষচন্দ্রের কলেজে পড়বার পালা। কটকে কলেজ আছে একটা ঠিকই, কিন্তু তা যত ভালই হোক কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের সমতুল নয় নিশ্চয়ই। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র তো কেবলমাত্র পড়াশোনা নিয়েই থাকতে চান না,—স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে ঘটে যাচ্ছে কত কিছু—সেই মূল স্রোতের কাছাকাছি থাকতে গেলে কোলকাতা যাওয়া একান্ত দরকার তাঁর—এই তার মনোগত ইচ্ছা। বাবা আপত্তি করার কারণ দেখেন না কিছু, সুভাষ যাই কিছু করুক, পড়াশোনাটা তো ঠিকই করছে। প্রেসিডেন্সী কলেজেই ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা হ'ল তাঁর।

ভবিষ্যতের সার্থক সেবক-সন্ন্যাসী-সৈনিকের সেবক হওয়ার যথোপযুক্ত প্রাথমিক পাঠ নিয়ে সুভাষচন্দ্রের আগমন ঘটল কোলকাতায় ১৯১৩ সালে।

কোলকাতায় পড়তে এসে পূর্ব-পরিকল্পনা মত প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হলেন সুভাষচন্দ্র। সুরু হ'ল এক মহত্তর বিদ্রোহী জীবনের প্রস্তুতির দ্বিতীয় অধ্যায়। কোলকাতা তখন উত্তাল বিপ্লবীদের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে ; সুভাষচন্দ্র অনুকূল ক্ষেত্র যেন পেয়ে গেলেন একটা এতদিনে। ঘটনা কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না, বরং প্রথম প্রথম যা ঘটল তা উল্টোই। কটকে থাকতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল স্বপক্ষীয় কিন্তু আবাসস্থল প্রতিকূল—এখানে আবাসস্থল অনুকূল তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরোধী আবহাওয়া। ওখানে স্বদেশপ্রীতি উজ্জীবিত করতে যেমন ছিলেন বেণীমাধব দাস, এখানে তেমনি বৃটিশ বিদ্বেষ উস্কে দিতে ইতিহাসের অধ্যাপক ই. এফ. ওটেন। ওখানে অস্থির করে তুলতে যেমন ছিলেন দূরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ হেমন্ত সরকার, এখানে তেমনি সুস্থির স্থিতধী করতে মাত্র একদিনের বড় শ্রী দিলীপকুমার রায়।

বড়ো কিছু করতে গেলে তার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ততা অর্জন করা চাই—নোতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে—সুভাষচন্দ্র যেন আত্মনিয়োগ করলেন সে সাধনায়। বিবেকানন্দের ভাবধারায় প্রভাবিত তিনি তো ছিলেনই, ইতিমধ্যে করে ফেললেন তাঁর রচনাবলী পাঠ। তার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে প্রাসঙ্গিক আরও অন্যান্য পাঠ গ্রহণ, মাত্র এতদ্দেশীয় কাহিনীসমূহ নয়, বিদেশী ঘটনাবলী সম্পর্কিতও। নিয়মিত চলতে থাকে ডিবেটিং ক্লাবে যোগ দেওয়া, বক্তৃতা অভ্যাস করা—এই সব। বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে সঙ্গী হিসাবে পেতে চান তিনি এ সব কাজে—কিন্তু দিলীপকুমার-এর আদৌ উৎসাহ নাই এ সব ব্যাপারে। বিখ্যাত নাট্যকার শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র তিনি, ভালো গান গাইতে পারেন। বিশেষতঃ নিজের বাবার লেখা গান বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গেই গান তিনি। তাঁর চরিত্রে কেমন যেন একটা উদাসী সাত্বিক সাত্বিক সত্তা।

সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহী মনের অঙ্গাঙ্গী যে ত্যাগীর মনটি আছে, দিলীপকুমার সহজেই প্রভাবিত করতে পারলেন সেটিকে। এমনিতেও দিলীপকুমারকে একটু আলাদা চোখে না দেখে পারা যায় না ; কতো বড়ো নাট্যকারের সন্তান তিনি—বিশেষ করে তাঁর দেশাত্মবোধক নাটকাবলী আর তাঁর দেশাত্মবোধক সঙ্গীতসমূহ তো সুভাষচন্দ্রের চোখে রীতিমত প্রশংসনীয়। সুভাষচন্দ্রের তো নিজেরই মুখস্থ আছে তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান। সেগুলো মোটামুটি গাইতেও পারেন তিনি। সুভাষচন্দ্র দিলীপকুমারকে আপন পথে টানবেন কি, দিলীপকুমার প্রভাবিত করে ফেললেন তাঁকে, দিলীপকুমারকে বক্তৃতা সভায় বা ডিবেটিং ক্লাবে নিয়ে যেতে পারেন না সুভাষচন্দ্র—সুভাষচন্দ্রের বরং সুরু হয়ে যায় নোতুন করে সাধক হওয়ার পাঠ গ্রহণ। অন্যের ভালো করতে গেলে নিজেকে ভালো হতে হয়—অন্যের উন্নতি করতে গেলে নিজেকে আগে উন্নত হতে হয় আর প্রকৃত দেশসেবক হতে গেলে যে ত্যাগী মনের দরকার—যে কষ্টসহিষ্ণুতা আর সেবাপরায়ণতার প্রয়োজন তার পাঠ

নেওয়া চাই আগে। পুষ্ট নৈতিকতা না থাকলে দুষ্ট রাজনীতিক হওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা।

ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল ;—সুভাষচন্দ্র সব মিলিয়ে এমন নিবিড় করে আঁকড়ে ধরলেন এই সব চিন্তাকে যে একেবারে গেরুয়াধারী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন অল্পদিনের মধ্যে। সঙ্গী পেলেন দুই বাল্যবন্ধুকে—এক পূর্ব্বে উল্লিখিত শ্রীহেমন্তকুমার সরকার। আর দুই শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়। হরিপদবাবু অবশ্য ফিরে এলেন মাঝপথ থেকেই, হেমন্তবাবু কিন্তু অবিচ্ছিন্ন থাকলেন শেষ দিন পর্য্যন্ত। হেমন্ত সরকারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম পরিচয় কটকে থাকতে। বেণীমাধববাবু যখন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তখন তিনি একবার ওখানকার ছাত্র এই হেমন্ত সরকারকে পাঠিয়েছিলেন কটকে তার থাকবার সুবিধার জন্যে সুভাষচন্দ্রদেরকে চিঠি দিয়ে :—হেমন্ত সরকার তখন থেকেই ঘনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্রের। হেমন্ত সরকার সে যাত্রায় উঠেছিলেন সুভাষচন্দ্রদের বাড়ীতেই।

কি অবিশ্বাস্য নমনীয়তা! কষ্টস্বীকার আর কৃচ্ছ্রসাধনার কঠোর ব্রতোৎযাপনে স্বেচ্ছাকৃত সন্ন্যাসজীবন সুরু হ'ল আজন্ম স্বাচ্ছন্দ্যলালিত ধনীর দুলাল কিশোর সুভাষচন্দ্রের।

গেরুয়াধারী হয়ে বেরিয়ে তো পড়লেন, কিন্তু কাছে যে টাকা পয়সা নাই যথেষ্ট পরিমাণে! তাতে না হয় খুব একটা অসুবিধা হবে না, কিন্তু এই অবস্থায় খাবেন কি, থাকবেন কোথায়? এ সব ভাবনাতেও কিন্তু খুব একটা বিচলিত বোধ করেন না তাঁরা। অনেক তীর্থ-পরিক্রমা করলেন দু'বন্ধুতে। প্রথম গেলেন হরিদ্বারে, ওখানে চাইলেন সন্ন্যাস নিতে, কিন্তু ওখানকার হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীরা মছ্‌লিখোর দুই কিশোরকে আমল দিলেন না আদৌ। ওখান থেকে গেলেন বৃন্দাবন তারপর আগ্রা হয়ে বারানসী। বারানসীতে পরিচিত হলেন ওঁরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ ওরফে রাখাল মহারাজের সঙ্গে। ওঁরা ওখানে একান্ত আগ্রহ দেখালেন —রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য হবেন তাঁরা—কিন্তু রাখাল মহারাজ তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন বাড়ী ফিরে আসতে—এবং তাঁর উপদেশ মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরতেই মনস্থ করলেন তাঁরা। গয়া হয়ে বাড়ী ফিরলেন ১৯১৪ সালের জুন মাসে। পুরো প্রায় দু'মাস এঁরা এমনি করে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকলেন এই সময়।

সন্ন্যাসী হওয়া হ'ল না সুভাষচন্দ্রের ; বরং তথাকথিত সন্ন্যাসীদের উপর দারুণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। চরম হতাশার সঙ্গে অভিজ্ঞতা হ'ল তাঁর—এঁরা জাতি বিচার করে, পংক্তি-ভোজন করান, এঁদেরকে সন্ত্রাসবাদী ভেবে ভয় পেয়ে আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন—এ কি ধরনের সন্ন্যাস জীবন এঁদের! এমন সন্ন্যাসী হওয়ার চেয়ে সন্ন্যাসীমন নিয়ে মানবসেবা—সেই তো বরং বেশ—স্বামী বিবেকানন্দও তো সেই শিক্ষাই দিয়েছেন—সুভাষচন্দ্রের সেবকমন দীক্ষিত হয় নোতুন মাত্রায়।

সুভাষচন্দ্র বাড়ীতে ফিরলে কি অস্বস্তিবোধই না করলেন তাঁর আত্মীয় পরিজন। আদরের "সুবি"-কে বুকে ফিরে পেয়ে কান্নায় আকুল হলেন মা প্রভাবতী দেবী। শপথ করিয়ে নিলেন তিনি সুভাষচন্দ্রকে ; অমন সন্ন্যাস তিনি আর কোনও দিনই নেবেন না জীবনে। অমন সন্ন্যাস সুভাষচন্দ্র আর নেননি ঠিকই কিন্তু সন্ন্যাস-ই নিয়েছিলেন তিনি—তবে সে সুভাষ এক অন্য সুভাষ—স্বার্থত্যাগী সেবক সুভাষ মাত্র নয়—সর্ব্বস্বত্যাগী সৈনিক সুভাষ—আর সেবার তিনি ত্যাগ করে গেলেন আপন প্রভাবতী দেবীকে তো বটেই, মাতৃভূমি ভারতবর্ষকেও। সে সুভাষ এক অনন্য সুভাষ—তেজোদৃপ্ত, প্রতিজ্ঞাদৃঢ়, কঠোর শ্রমনিরত—এক স্বাধীনতা যোদ্ধা সুভাষ।

সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাগমনে মা তো খুবই খুশী, বাবার ভূমিকা তখন কি ? সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই জানকীনাথ বসু নিয়ে পড়লেন তাঁকে। তিনি চান—তাঁর সন্তানেরা উপযুক্ত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক জীবনে। আর সে জায়গায় এসব কি পাগলামো করছে সুভাষচন্দ্র ! সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় প্রত্যয়—কোনও অন্যায়ই করেননি তিনি—তাই বাবার এই তিক্ত ভৎ'সনায়ও আদৌ বিরক্তি প্রকাশ না করে সমানে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন তিনি বাবার সঙ্গে। আপন মনোগত ইচ্ছা ও বিশ্বাসের কথা দৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত করেন তিনি বাবার সামনে—কণ্ঠে তাঁর রীতিমত বিনীত কিন্তু বিদ্রোহের স্বর। আটপৌরে জীবনের দৈনন্দিন গতানুগতিকার উর্দ্ধে অন্য কিছুর স্বাদ পেয়েছেন তিনি—বিবেকানন্দের বিখ্যাত ভারত পরিক্রমার অল্প কিছুমাত্র হলেও স্বর্গীয় আস্বাদ পেয়েছেন তিনি তাঁর এই সংক্ষিপ্ত স্বল্প-কালীন গৃহত্যাগে—তিনি কেন আদৌ লজ্জা পাবেন বাবার এই বকুনিতে। এ সময় এক বন্ধুকে লিখেছিলেন তিনি—"আমি যে প্রেমসাগরে ভাসিয়াছি তাহার নিকট মাতৃস্নেহও গোষ্পদ সমান"—ভারতমাতার ধ্যানমূর্ত্তি তখনি এমনি করে ম্লান করতে সুরু করেছে এমনকি আপন মাতৃমূর্ত্তিকেও।

এই সন্ন্যাস যাত্রার আপাত পরিণাম ঘটল এই,—যদিও যথাসময়ে, তবে কেবল-মাত্র কোনও রকমে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করলেন সুভাষচন্দ্র ১৯.৫ সালে, যা ছাত্র হিসাবে তাঁর মেধার সঙ্গে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয়। মনে মনে দারুণভাবে প্রতিজ্ঞা করেন সুভাষচন্দ্র—এবার থেকে যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করবেন তিনি। বন্ধু দিলীপ রায়ের পরামর্শ অনুরণন তোলে তাঁর মধ্যে—বড়ো কিছু করতে গেলে, ভালো কিছু করতে হ'লে বড়ো হওয়া চাই, ভালো হওয়া চাই ; বড়ো করা চাই, ভালো করা চাই—আগে নিজেকে।

১৯১৪ সালে প্রথম দেখলেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে, প্রেসিডেন্সী কলেজের কিছু ছাত্রের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এক শিক্ষামূলক ভ্রমণ উপলক্ষ্যে বেড়াতে গিয়ে। ওখান থেকে অধ্যাত্মচেতনা আর স্বাদেশিকতার এক ভিন্ন মাত্রার স্বচ্ছতর ধারণা উপলব্ধি করে ফিরলেন তিনি। বুঝতে পারলেন তিনি—পরীক্ষায় ভালো ফল করে জীবনে

সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সব নয়, নিজেকে ভালো একজন সম্পূর্ণ-মানুষ করে গড়ে তোলারও প্রয়োজন আছে। আরও বড়ো হওয়া ভালো, ভালো হওয়া আরও বড়ো।

কৈশোরের শেষের দিকেও রামকৃষ্ণ মিশন আর শান্তিনিকেতনের এই ছাপ সুভাষচন্দ্রের স্মৃতি থেকে অপসৃত হয়নি কখনও। আই. সি. এস. ছাড়ছেন যখন ১৯২১ সালে, বন্ধুবর চারু গাঙ্গুলীকে চিঠি লিখছেন তিনি—রামকৃষ্ণ মিশনে অথবা শান্তিনিকেতনে যোগ দিবেন এমন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে অবশ্য এদের কোনোটাই করা সম্ভব হয়নি কারণ প্রত্যক্ষ রাজনীতি করবার সুযোগ ছিল না প্রতিষ্ঠান দুটির কোনোটিতেই থেকে। তবে বিবেকানন্দের আর রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা যে তিনি প্রচারিত ও প্রসারিত করতে সচেষ্ট হলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির মাধ্যমেও সে কথা অনস্বীকার্য্য। রামকৃষ্ণদেব পরিব্যাপ্ত হয়েছিলেন বিবেকানন্দের মাধ্যমে—বিবেকানন্দ দীর্ঘায়িত হলেন সুভাষচন্দ্রের মাধ্যমে ; আর রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সুভাষচন্দ্রের জীবনে আত্মসমাহিত হয়ে আপনকর্ম বিশ্লেষণ করবার এক সুষম ও সৌম্য অবকাশ।

১৯১৫ সালে আই এ. পাশ করে ঐ বৎসরই ঐ প্রেসিডেন্সী কলেজেই দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ. পড়তে ভর্ত্তি হলেন সুভাষচন্দ্র। মনে মনে শপথ নিয়েছেন, ভালো ভাবে এবার থেকে পড়াশোনা করবেন তিনি—কিন্তু তা আর সম্ভব হ'ল কই! এক অন্যতর অনভিপ্রেত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে ছাত্রজীবনের অমূল্য দুটি বৎসর নষ্ট হয়ে গেল সুভাষচন্দ্রের। এখানকার ইতিহাসের অধ্যাপক—ই এফ. ওটেন শিক্ষক হিসাবে সফল অবশ্যই—তবে দুর্বিনীত ছিলেন দারুণ। রাজার জাত হওয়ার কারণে কেউকেটা ভাবেন নিজেকে। আর কথায় কথায় করতেন ভারতীয়দেরকে যথেচ্ছ গালাগালি। গ্রীকরা প্রাচীনকালে যেমন করে অসভ্য বর্বরদিকে (Barbarians) সভ্যতার আলো দেখিয়েছিল—তেমনি করে অসভ্য ভারতীয়দিগের সভ্যতার আলো দেখাতেই নাকি ইংরেজদের এতদ্দেশে আগমন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ওখানকার ছাত্রেরা একটা উচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন তাঁকে। সুযোগ জুটে যেতে দেরী হ'ল না এতটুকুও।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "বঙ্গ আমার জননী আমার" গানটি গাওয়া ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ তখন ভারতে আর ছাত্রেরা কিনা সেই গানটিই গাইল ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে সরস্বতী পুজা উপলক্ষ্যে ওই ওটেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে। মদগর্বী জাত্যাভিমানী ওটেন সাহেব সহ্য করবেন কেন এমন বেয়াদবি। শুধু ঐ ছাত্রদেরকেই নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটিকেই তিনি গালাগালি দিয়ে বসলেন—কুখ্যাত বর্বর (Notorious Barbarians) বলে। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে ছাত্রেরা ; বয়কট করল তারা ওটেনের ঐ ভাষণ এবং ঐ সভাও। শুধু তাই নয়, অভিযোগ জানাল তারা প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এইচ. আর. জেম্‌সের কাছে। অধ্যক্ষ মশায়ও তো ইংরেজ-ই, প্রতিকার তিনি করবেন

কি—উল্টে দোষারোপ করেন ছাত্রদের উপরেই—তাদেরকে ক্ষমাও চাইতে বললেন ওটেন সাহেবের কাছে। ইংরেজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা! অসম্ভব! দোষ হ'ল কার, আর ক্ষমা চাইতে হবে কা'কে—আবারও শুরু হল আন্দোলন—এবার ক্লাস বয়কট, কলেজে ধর্ম্মঘট। অবশেষে অধ্যক্ষ মশায়ের বিশেষ অনুরোধে এবং তৎকালীন ওখানকার অধ্যাপক শ্রী জগদীশচন্দ্র বসুর মধ্যস্থতায় ওটেন সাহেব দুঃখ প্রকাশ করলে সাময়িক সমাধান হ'ল এ-সমস্যার।

নীলরক্ত রাজার জাত ইংরেজ ওটেন—তাঁকে কিনা দুঃখ প্রকাশ করতে হ'ল কালা আদমিদের কাছে—তাও ছাত্র তারা! মেজাজ হারিয়ে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই ক্লাসের মধ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৬ তারিখে ভারতীয় নারীসমাজ সম্পর্কে করে বসলেন এক চরম অশ্রদ্ধেয় উক্তি। আবারও প্রতিবাদমুখর হতে বাধ্য হ'ল ছাত্রেরা—প্রত্যাহার করতে হবে এ মন্তব্য! অনমনীয় ওটেন পরিত্যাগ করলেন সেই শ্রেণীকক্ষ। তখন তখনই কিছুই করল না ছাত্রেরা। দিন শেষে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন ওটেন সাহেব, হঠাৎ একদল ছাত্র ধাক্কা মেরে ফেলে দিল তাঁকে, কিল ঘুঁসিও চল্‌ল যথেচ্ছভাবে। সুভাষচন্দ্র নিজে কিছুই করেন নি তবে তখন উপস্থিত ছিলেন ওখানে।

নানান জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও যখন ধরা গেল না আসল দোষীকে—ডাক পড়ল সুভাষচন্দ্রের। সুভাষচন্দ্র নাম করলেন না কারও—নেতা তিনি, কোনো ছাত্রের নাম করে তাকে বিপদগ্রস্ত করবেন—এমন কাজ উচিত হবে না তাঁর পক্ষে—এমন অবস্থায় অমৃতভাষণ তো অপরাধ কিছু নয়। অতএব ঠিক বহিস্কার নয়, সাসপেণ্ড হতে হ'ল সুভাষচন্দ্রকে অন্যান্য আরও কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে। এ সব ঘটনা ঘটে গেল ১৯১৬ সালের ঐ ফেব্রুয়ারীতেই। শাস্তি পাকা করতে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তদন্ত কমিশন তৈরী করা হ'ল একটা—কমিশনের সদস্য ছিলেন শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র ছাড়াও আরও সাহেব তিনজন। তদন্তকালে সুভাষচন্দ্র যে আঘাত করেছেন অধ্যাপক ওটেন-কে, স্বয়ং ওটেনও বলতে পারলেন না সে কথা—তিনি নাকি চিনতে পারেন নি কাউকেই। কেবলমাত্র এক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সাক্ষ্য দিল যে, সে ছুটে পালাতে দেখেছে সুভাষচন্দ্রকে এবং অনঙ্গ দাস নামক আর এক ছাত্রকে। মাত্র এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র ও অন্য কয়েকজন। ক্ষমা চাইতে বলা হ'ল সুভাষচন্দ্রকে—এমনকি দুঃখ প্রকাশ করতে। সুভাষচন্দ্র রাজী হলেন না কোনোটিতেই তবে স্বীকার করলেন এ কথা যে এই নিগ্রহকর্ম আদৌ উচিত হয়নি ছাত্রদের পক্ষে—সঙ্গে অবশ্য একথা যোগ করতেও ভুললেন না যে এমন একটা ঘটনা ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরী করবার দায় ছিল ওটেন সাহেবেরই। শেষ পর্য্যন্ত বহিষ্কৃতই হতে হ'ল সুভাষচন্দ্রকে।

ওটেন নিগ্রহের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র দায়ী ছিলেন কতখানি, তা নিয়ে কিছু বিতর্কিত মতামত চালু আছে এখনো। এ ব্যাপারে স্বয়ং ওটেনের সাক্ষ্য অবশ্যই সমধিক প্রণিধানযোগ্য, বেশ কিছু দিন আগে এক পুস্তিকায় সুভাষচন্দ্র যে নির্দোষ এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন তিনি। এ ছাড়াও ওটেন যে বরাবর শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তা তাঁর লেখা একটি সনেট থেকেও বোঝা যায়: সনেটটি তিনি লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদ শুনে। সনেটটির বিষয়বস্তু পুরাতন গ্রীক আখ্যায়িকার একটি কাহিনী:—আইক্যারাস ক্রীট দ্বীপ থেকে উড়ে যেতে চাইলে তার বাবা ডিডালাস্ গালার তৈরী দুটি পাখা জুড়ে দিয়েছিলেন তার পিঠে আর সেই সঙ্গে নিষেধ করে দিয়েছিলেন সে যেন না ওঠে বেশী উঁচুতে। আইক্যারাস শোনেনি তার বাবার সাবধানবাণী, তাই বেশী উঁচুতে ওঠার ফলে সূর্য্যের প্রখর তাপে গলে গিয়েছিল তার গালানির্মিত পক্ষদ্বয় এবং তার ফলে সমুদ্রে নিপতিত হয়ে প্রাণ দিতে হ'ল আইক্যারাস-কে।

বি. এ. ক্লাসে এক বৎসরও পড়া হ'ল না সুভাষচন্দ্রের। কি করবেন তিনি এবার! দেখা করলেন তিনি বেণীমাধববাবুর সঙ্গে। প্রকৃত একজন সৎশিক্ষক বেণীমাধববাবু—তিনি সমর্থন করলেন না সুভাষচন্দ্রের এই আচরণ। এক প্রকৃত মেধাবী ছাত্র এমন করে তার উজ্জ্বল ছাত্র জীবন নষ্ট করছে—ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, পরে আই. এ-তে কোনো রকমে প্রথম বিভাগে পাশ করে এখন আবার আদৌ পড়াশোনা করবার অবস্থায়ই নেই—দারুন ক্ষুন্ন হলেন তিনি। ঠিক্ করলেন—বিলেতে গিয়ে পড়াশোনা করলে কেমন হয়! রাজী হতে পারলেন না অভিভাবকবৃন্দ। এখানে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধিতা করে খোদ্ ইংরেজদের দেশে থেকে পড়াশোনা করবে—তাও কি সম্ভব? বাবা জানকীনাথ বসু তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করলেন তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে। বৃটিশ বিরোধী ছাত্রনেতা সুভাষচন্দ্রের নাম আগেই শুনেছেন তিনি—তাঁকে সামনে দেখে খুশী হলেন খুব, মুগ্ধও হ'লেন তাঁর সপ্রতিভ কথাবার্ত্তায়—কিন্তু সমস্যা সমাধানের কার্য্যকরী কোনও পথ বাৎলাতে ব্যর্থ হলেন তিনি।

অগত্যা সুভাষচন্দ্র ফিরে আসতে বাধ্য হলেন কটকে, আর জীবনের এই অমূল্য সময়ে ছাত্রত্ব থেকে নির্বাসিত হয়ে কাটাতে বাধ্য হলেন পুরো দুটি বৎসর। প্রথম বৎসর প্রায় পুরো সময়টাই থাকলেন কটকে, নিবিড়ভাবে সমাজসেবার কাজে ব্যাপৃত রাখলেন নিজেকে—আর সেই যে দুর্গা পূজার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাঁর, তাও ঐ সময় সম্পন্ন করলেন বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে। পরের বছর এলেন তিনি কোলকাতায়, এখানেও কাটল তাঁর এক বছর। কোলকাতায় এসে কিছু দিন পরে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি ৪৯ বেঙ্গলী রেজিমেন্টে। সেখানেও নির্বাচিত হতে পারলেন না তিনি। এক মেজর মিঃ কুক তাঁর চোখ পরীক্ষা করে অনুপযুক্ত ঘোষণা করলেন তাঁকে। এ সব গেল ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা।

এই যে বাঙ্গালী পল্টনে নির্বাচিত হতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র—এতো ব্যর্থতার ছদ্মবেশে আশীর্বাদই বরং সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তো বটেই, সারা বিশ্বেরও পক্ষে। 'সামান্য সৈনিকের চাকরী নিয়ে—তাও বৃটিশ সরকারের অধীনে কি এমন মহৎ কাজ করতে পারতেন তিনি! বরং নানা ভাবেই তো অঙ্কুরোদ্গম না হতেই উৎপাটিত হতে পারত তাঁর দেশপ্রাণতার মহান সম্ভাবনা। সর্বাধিনায়ক হওয়া যাঁর অমোঘ ভবিষ্যৎ, শিক্ষানবিশ, সমরশিক্ষার্থী' হতে পারেন তিনি, কিন্তু সামান্য সৈনিক তিনি হবেন কোন দুর্ভাগ্যের ফলে।

পড়াশোনা কি কোনো ভাবেই সুরু করা যায় না? মেজদা শরৎচন্দ্রের সহায়তায় অবশেষে শরনাপন্ন হলেন তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। স্যার আশুতোষ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব তখন—তিনিই ব্যবস্থা করে দিলেন তাঁর স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার: সঙ্গে অবশ্য সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন তিনি। এর পর থেকে সুবোধ ছাত্রের মত কেবল পড়াশোনা নিয়েই থাকতে হবে তাঁকে, ছাত্রজীবন গৌরবময় সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা চাই, আন্দোলন, রাজনীতি এ সব করার জন্যে তো পড়ে আছে বাকী সারাটা জীবন। এখনই এ সব নিয়ে মাতামাতি করা তো ভবিষ্যতে বৃহত্তর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার থেকে বিরত হওয়ার নামান্তর মাত্র।

১৯১৭ সালে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়েই স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্ত্তি হলেন সুভাষচন্দ্র। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ তখন আর্কুহার্ট সাহেব। পরম বিদ্যোৎসাহী শিক্ষানুরাগী ছাত্রবৎসল তিনি। পড়াতেনও দর্শনশাস্ত্রই। পরম সমাদরে সুভাষচন্দ্রকে ভর্ত্তি করে নিলেন তিনি আপন কলেজে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল—সুভাষচন্দ্রকে কোনও কলেজ ভর্ত্তি করে নিলে আপত্তি করা হবে না সেখান থেকে। বাকী যেখান থেকে হয়ত আপত্তি আসতে পারত—অধ্যক্ষ এইচ. আর. জেমস্—তিনি তখন পদত্যাগ করেছেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। প্রকৃত ছাত্রসুলভ নিবিড় নিষ্ঠা সহকারে ঐ কলেজে পাঠ সমাপন করলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯১৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি. এ. পাশ করলেন তিনি।

সুভাষচন্দ্র কোলকাতায় পড়তে এসে বৃটিশ বিরোধিতার কারণে বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে এই যে বাধ্য ছাত্র হয়ে পাঠে মনোনিবেশ করলেন—তবে কি তাঁর বাকী জীবন নিস্তরঙ্গই অতিবাহিত হবে! মোটেই ঘটলো না তা—বৃটিশ বিরোধিতার প্রথম প্রত্যক্ষ পাঠ নেওয়ার সঙ্গে আরও একটা অভিনব পাঠ এই পর্য্যায়ে গ্রহণ করলেন তিনি—তা হ'ল সমর কৌশলের আধুনিক পাঠ।

৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে অন্তর্ভুক্তি ঘটেনি তাঁর। সেক্ষেত্রে হয়তো সমর শিক্ষার পাঠ অনেক বেশী ব্যাপক হতে পারত—কিন্তু কলেজে ছাত্রাবস্থায় এ ব্যাপারে যে পাঠ পেলেন তিনি—তা ব্যাপকতায় গভীর হয়তো নয় কিন্তু কার্য্যকারিতায় সুদূরপ্রসারী।

সুভাষচন্দ্র যে নেতাজীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন—তা তো তাঁর আজাদ হিন্দ, সরকারের এক স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়ার কারণে—তারই উপযুক্ত সূচনা স্বরূপ যেন ঘটল এই ঘটনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে একদিকে যেমন নোতুন খোলা হয়েছে ৪৯ নং বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট, অন্যদিকে তেমনি ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্স (India Defence Force) কলেজ ছাত্রদের মধ্য থেকে সম্ভাব্য সমর শিক্ষার্থী যোগাড় করতে সুরু করেছে "ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর" (University Training Corps)-এর মাধ্যমে। স্কটিশ-চার্চ কলেজে-এ কারণে ছাত্র-সংগ্রহ চলছে যখন, সুভাষচন্দ্র দেরী করলেন না সুযোগ নিতে। মানসিক দিক থেকে তিনি যে এমন কাজ করতে প্রবৃত্ত হবেন, তা তাঁর ইতিপূর্বে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানেচ্ছা থেকেই বোঝা যায়। গতবার ইংরেজ অফিসার মেজর কুক্‌ ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টি-শক্তির কারণে নির্বাচিত করেননি তাঁকে; এবার কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী—এবং সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে অসুবিধা হ'ল না আদৌ।

চারমাসের নিবিড় প্রশিক্ষণ পেলেন সমরবিদ্যায় এ সময় সুভাষচন্দ্রেরা। লিঙ্কনস্‌ রেজিমেণ্টের (Linkon's Regiment) অফিসারদের উপর তাঁদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্থানটিও বড়ো অনুকূল—খোদ ফোর্ট উইলিয়ামের অভ্যন্তরস্থ চত্বর। নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র পাঠ গ্রহণ করেন এটির-ও। বন্দুক চালনার শিক্ষা দেওয়া হ'ল পুরো তিন সপ্তাহ ক্যাপ্টেন গ্রে-ছিলেন এ শিক্ষা দানের দায়িত্বে। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব-দের সঙ্গে এ শিক্ষায়ও সিদ্ধ হস্ত হলেন তিনি। বন্দুক চালনার পরীক্ষায় ইংরেজ অফিসারদেরকে অভাবনীয় সাফল্যে অবাক করে দেন তাঁরা। এ সবেরও উপরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল—বন্দুক নিতে ফোর্ট উইলিয়ামের অস্ত্রাগারে যখন প্রবেশ করতেন সুভাষচন্দ্র, তখন তাঁর বিদ্রোহী মন অধীর হয়ে উঠত ওখানে রক্ষিত অস্ত্রসম্ভার দেখে। কোনোদিনই কি ব্যবহার করতে পারবেন না তিনি ও-সব অস্ত্র ইংরেজ শয়তানদের বিরুদ্ধে! কখনো কি এ-সব দখলে আসবে না তাঁর!

এই সমর শিক্ষার প্রস্তুতি ও প্রয়োগ সামান্যতম সুযোগ পেলেও সাধ্যমত গ্রহণ করেছেন সুভাষচন্দ্র। পরবর্ত্তী সময়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যখন তিনি—তখনও আবার একবার চেষ্টা করলেন সমর শিক্ষা গ্রহণ করতে; দরখাস্ত করলেন অফিসার্স ট্রেনিং কোর্স (Officers Training Cource)-এ ভর্ত্তি হতে। ভারতীয়দের জন্যে এই পাঠ উন্মুক্ত ছিল না তখন—কারণ তারা কৃতকার্য্য হয়ে ইংরেজ সেনাদলে অফিসার হবে এমন অনভিপ্রেত ব্যাপার সম্ভব ছিল না ইংরেজদের বিচারে। অগত্যা মুচলেকা দিলেন সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা—পাঠ সমাপনান্তে ইংরেজ সেনাবাহিনীতে চাকুরী প্রার্থী হবেন না তাঁরা; তবুও তখন তাঁদের কাছে এ শিক্ষার দ্বার অনুন্মুক্তই থেকে গেল। সামরিক পথেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হবে—এমন একটা অন্তঃশীলা আচ্ছন্নতা হয়তো বা সুভাষচন্দ্রকে পেয়ে বসেছিল তখন থেকেই।

প্রসঙ্গতঃ সুভাষচন্দ্রের এই সমরপ্রবণতার কিছু আলোচনা এখানে করা যেতে পারে—সমরশিক্ষার ফলে সেনানীসুলভ শৃঙ্খলাপরায়ণতা, যূথপ্রীতি, পরিশ্রমসক্ষমতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সময়ানুবর্ত্তিতা এসব গুণ যথেষ্ট পরিমাণে অর্জিত হল তাঁর ; তাঁর যে সাবধানতা ও পরিচ্ছন্নতাবোধ ছিল তাও বর্দ্ধিত হল এসময়ে। পরবর্ত্তী সারা জীবনেই এ-সব গুণের কাম্য সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি।

সামরিক মানসিকতা ব্যাখ্যা করতে এও উল্লেখ্য যে—

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল যখন কোলকাতায়, সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। হাওড়া স্টেশন থেকে পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত রীতিমত সামরিক পোষাকে আশ্বারূঢ় হয়ে অভ্যর্থনা জানান হ'ল সারা ভারত থেকে আগত নেতৃবৃন্দকে। বাহিনীর অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদেরও অনুরূপ পোষাক এবং আচরণ। সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করে অভিবাদন জানান হ'ল কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহেরুকে এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে।

১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান সময়ে ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট সদস্য রজনীপাম দত্তের ভাই ক্লিমেন্স দত্তের সঙ্গে কথা হচ্ছে তাঁর—রাশিয়ার সহায়তায় অস্ত্রের জোরেই ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করবেন তিনি ; এবং ওরই অল্পদিন পরে ১৯৩৩ সালের আঠাশে এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে যে চিঠি লিখছেন তিনি তাতেও দেখা যায় তাঁর সৈন্যদল গঠন করবার কথা।

সর্বশেষ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে জার্মানীতে গেলেন তিনি যখন—সেখানে তো প্রত্যক্ষতঃ রণভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার অভিলাষ নিয়েই পূর্ণ প্রস্তুতি তাঁর ; তাই জার্মান সেনানায়কদের কাছে সমর শিক্ষার পাঠ নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি। অনুরূপভাবে পরবর্ত্তী সময়ে জাপানে গিয়েও তাঁকে নিতে হয়েছে আবারও এই পাঠ। বৃটিশ, জার্মান, জাপান—বিভিন্ন ধারার সামরিক শিক্ষার ফলে তিনি যে একজন দক্ষ সমরনায়ক হতে পেরেছিলেন তাই নয়, রণনীতি সংক্রান্ত নানা কলা-কৌশলও আয়ত্ত করতে সমর্থ হন তিনি। তাই আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান হিসাবেই মাত্র নয়, দক্ষ সেনাপতি হিসাবেও আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর তাবৎ প্রথম শ্রেণীর সেনানায়কদেরও পরম শ্রদ্ধাভাজন হতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর বাহিনী যে হাল্‌কা যুদ্ধাস্ত্র মাত্র নিয়ে পরম পরাক্রমশালী মিত্র বাহিনী তথা বৃটিশ শক্তির মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছিলেন—তা মূলতঃ তাঁর এই যোগ্য নেতৃত্ব গুণের ফলেই। একাধিক অর্থেই সার্থক নেতাজী তিনি।

ফিরে আসা যাক্ বর্তমান প্রসঙ্গে। কোলকাতায় পড়াশোনা করার সময়ে প্রচুর চিঠিপত্র লিখেছিলেন তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে, বিশেষত মা-কে ; বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে চারু গাঙ্গুলী এবং হেমন্ত সরকারকে তো বটেই। তাঁর সাত্ত্বিক মনের ও ভবিষ্যৎ

কর্মধারার বেশ একটি ঋজু রূপরেখা অনুমান করা যায় তাঁর এই পত্রসম্ভার থেকে। তাঁর ভারত-ভাবনার যে প্রকৃষ্ট রূপ—তারও পরিচায়ক তাঁর এই পত্রাবলী।

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সাত্ত্বিক হওয়ার প্রেরণা, কোলকাতার অগ্নিগর্ভ পরিবেশ, নিজের বৃটিশ বিরোধিতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, সামান্য হলেও সমর শিক্ষার শিক্ষানবিশি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীদের সান্নিধ্য লাভ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দর্শন—ইত্যাদি বিচিত্র উপধারায় সুষম সম্মিলনে সমৃদ্ধ হয়ে ক্রমশঃ পুষ্ট হতে থাকে সুভাষচন্দ্রের জীবন প্রবাহ।

কটকে ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন এক সেবক, সমাজ সেবক; প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালীন হলেন একবার সন্ন্যাসী ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী; আর স্কটিশচার্চ কলেজে পড়াশোনা করতে করতে হলেন এক সৈনিক, শিক্ষানবিশ সৈনিক—সবকিছুর সমারোহে সূচিত হতে থাকে এক মহাজীবনের—এক সেবক-সন্ন্যাসী-সৈনিকের—উত্তরকালের বিদ্রোহী নেতাজীর।

আবারও সমস্যা ;—এবার কি করবেন সুভাষচন্দ্র ! স্যার আশুতোষকে কথা দিয়ে-ছিলেন তিনি,—বাধ্য ছাত্রের মতো কেবলমাত্র পড়াশোনা নিয়েই থাকবেন এরপর,—তাতো তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। আরও দু'বছর না হয় অমনিই থাকবেন তিনি—ভালোভাবে এম. এ.-টাও পাস করে পরে শিক্ষকতা করবেন আর মানুষ গড়ার ব্রতে আত্মনিয়োগ করবেন বিবেকানন্দের নির্দ্দেশমতো পথে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমনিই চিন্তা করে ভর্ত্তিও হয়ে গেলেন তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ ক্লাসে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) নিয়ে ঐ ১৯১৯ সালেই। হয়তো আপনার এই অভীপ্সামত জীবন কাটত সুভাষচন্দ্রের কিন্তু এবার আত্মীয়স্বজন বিশেষতঃ বাবার বিশেষ নির্দ্দেশিকার কারণে অন্যতর খাতে সুভাষচন্দ্রের জীবন প্রবাহিত হওয়ার সূচনা ঘটল আবারও একবার।

শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গত আশংকা—সুভাষচন্দ্র আর কতদিন থাকতে পারবেন এমন সুবোধটি হয়ে ! সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ গান্ধীজির ডাকে—সারা ভারত ধর্মঘট, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ—এ সবের পরেও কি শান্ত থাকতে পারবেন সুভাষচন্দ্র ! বাবা ঠিক করলেন সুভাষচন্দ্র ভালো-মতই পড়াশোনায় মন দিয়েছে এখন—এঁকে যদি বিলেতে পাঠানো যায় আই. সি. এস্. হতে--সব দিক রক্ষা করা যায় তাতে। ভারতের উত্তাল অবস্থার থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যেমন যাবে তাঁকে, তেমনি আই সি. এস.-এর লোভনীয় পদ হয়তো বা সুভাষচন্দ্রকে প্রলুব্ধ করে বিরত করবে বৃটিশ-বিরোধী হতে। অতএব মনস্থ করলেন তিনি—সুভাষচন্দ্রকে বিলেত যেতে হবে আই. সি এস. হতে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে সুভাষইতো স্বয়ং যেতে চেয়েছিলেন বিলেতে পড়তে—এখন তার গররাজী হওয়ার কারণ থাকতে পারে না কিছু। বিলেত যেতে হবে সুভাষচন্দ্রকে।

বিলেত যেতে তেমন আপত্তি নেই সুভাষচন্দ্রের, কিন্তু আই. সি. এস. হওয়া দারুন না-পছন্দ তাঁর। আই. সি. এস হওয়া মানে খুব বড়ো চাকুরী পাওয়া—নিশ্চিন্ত আড়ম্বরপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন—তাতে হয়তো বা দেশ সেবাও করা যায়—কিন্তু সে সেবা তো বিদেশী সরকারের নির্দ্দেশিত বাঁধা ছক মেনে—তাতে আর যাই হোক,—দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির সাধনা তো করা যাবে না। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য তাঁর এই অনাগ্রহ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না তাঁর বিলেত যাত্রা—বাবার এবং অন্যান্যদের আগ্রহাতিশয্যে আই. সি. এস. হতেই বিলেত যেতে হ'ল সুভাষচন্দ্রকে।

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯ ভারত ত্যাগ করে ২০শে অক্টোবর পৌছলেন তিনি ইংল্যাণ্ডে—ভর্ত্তিও হয়ে গেলেন আই. সি. এস.-এ। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে আই. সি. এস.-এর চাকুরী করবেন না তিনি এমনি একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র (Mental & Moral Science)-এ

ট্রাইপোস্ নিয়ে। হিসেব ছিল তাঁর এই শিক্ষার সহায়তায় পরবর্ত্তী জীবনে শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবেন তিনি। এখানে ভর্ত্তি হওয়া অবশ্য খুব সহজ হয়নি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে,—কারণ ভর্ত্তির তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে ততদিনে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ছাত্র হিসাবে যেহেতু যথেষ্টই উজ্জ্বল ; নাছোড়বান্দা আগ্রহাতিশয্যে ভর্ত্তি হতে সমর্থ হলেন তিনি ওখানে।

সামনের আই. সি. এস. পরীক্ষায় বসবেন তিনি—হাতে সময় মাত্র আট/নয় মাস। এ পরীক্ষায় বসতে মনের দিক থেকে তেমন সায় নাই তাঁর, তবু বাবার নির্দ্দেশমতো বসবেনই তিনি এ পরীক্ষায়। দুষ্টবুদ্ধি চাপে মাথায়—আচ্ছা, পরীক্ষায় বসে যেমন তেমন উত্তর পত্র লিখে ইচ্ছে করে ফেল করলে কেমন হয় ! পরক্ষণেই মনে হয়—ছিঃ, ভালো ছাত্র হিসাবে কতো সুনাম তাঁর—যে কারণেই হোক যে কোনো পরীক্ষায়ই ফেল করলে কলঙ্কিত হবে না কি সে সুনাম, তাছাড়া ফেল করাটা যেমন অগৌরবের হবে, তেমনি ওটা পাস করে পরে তা ত্যাগ করলে তা হবে অনেক বেশী গৌরবের। বাবার কথা রক্ষা করা হল, আপন সুনামও অক্ষুন্ন রাখা গেল, আবার পরে ত্যাগ করে বরং গৌরব বৃদ্ধি ঘটবে—এ সব চিন্তা করে ঐ পরীক্ষায় বসলেন তিনি যথাসময়েই। অল্প দিনের প্রস্তুতি, তেমন সায় ছিল না এ পরীক্ষায় বসতে, উত্তর লিখতে পারলেন না সমস্ত প্রশ্নের। ১৯২০ সালের জুলাইতে শুরু হয়ে পুরো একমাস চলল্ এ পরীক্ষা—সেও এক বিরক্তিকর ব্যাপার সুভাষচন্দ্রের পক্ষে। তবু ১৯২০ সালের আগস্টে পরীক্ষার ফল বেরোতে দেখা গেল—কেবলমাত্র পাসই করেন নি সুভাষচন্দ্র, এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে মোটের উপর চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন তিনি।

আবারও চরম দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে। হয়তো বা অকৃতকার্য্য হওয়াই হোত সহজ সমাধান। সেরকম সম্ভাবনার কথাই তো বরং ভেবেছিলেন তিনি। কি করবেন তিনি এখন ?

বিবেকানন্দের ভাবধারায় প্রভাবিত সুভাষচন্দ্র বাল্য বয়স থেকেই—ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর তাঁর রচনাবলীও পাঠ করে ফেলেছেন তিনি, কতই বা বয়স তখন তাঁর···প্রায় ষোলো—তারপর এই প্রায় সাত/আট বৎসর নিরন্তর দ্বন্দ্ব তাঁর মনের সঙ্গে। ভোগের জীবন থেকে ত্যাগের জীবন শ্রেয় অনেক বেশী। সনাতন ধর্ম্মের আত্মমোক্ষ-প্রয়াসী প্রশ্নহীন গুরুবাদিতা, ভক্তিসর্বস্ব অবতারবাদ—এ সব তো ভেঙে চুর চুর করে দিয়েছেন তিনি। পিতার অমতে আই. সি. এস. ছাড়েন যদি তিনি তা-কি খুব অন্যায় করা হবে! অবাঙ্মনসগোচর ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন তুলে জীবসেবাই যে শিবসেবা সে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি—আর বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতকে স্বাধীন না করতে পারলে যে সার্থকভাবে জীবসেবা করা সম্ভব নয়—এ ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় তিনি। রাষ্ট্রশক্তি হাতে না পেলে মানবসেবা তথা সমাজসেবা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সব ভেসে ওঠে চোখের সামনে—চাপেকর ভাইরা, ক্ষুদিরাম, অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা

—এরা তো প্রাণই দিলেন—আর এরপরে তিলক, সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কি ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের হাতছানি হেলায় অগ্রাহ্য করে বেছে নেননি ত্যাগের জীবন ! ত্যাগই করবেন তিনি আই. সি. এস.—বাবা হয়তো খুবই ক্ষুণ্ণ হবেন, কিন্তু তিনি তো জানেন মা তাঁর মোটের উপর বেশ গান্ধীভক্ত, সমর্থনও করেন তিনি গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনকে।

নাঃ, আই. সি. এস. ত্যাগই করবেন তিনি। উকিল, ব্যারিষ্টার, সরকারী কর্ম্মী, শিক্ষক, ছাত্র যুবক কতোজনই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে। কৈ একজন আই. সি. এস.ও তো এগিয়ে আসেননি এখনো—তিনি হবেন প্রথম আই. সি. এস. এই ডাকে সাড়া দিতে। ইংরাজ নির্দ্দেশিত মতে নয়, আপন নির্ধারিত পথে মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, নিরক্ষর নিরন্ন, গৃহহীন, ভূমিহীন ভারতবাসীর সেবার ভার গ্রহণ করবেন তিনি, আর তার জন্য লৌহদৃঢ় স্নায়ু আর বজ্র কঠোর পেশীর সহায়তায় সর্বত্যাগী হয়ে নিরন্তর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবেন তিনি। কুসুমাস্তীর্ণ পথ বেয়ে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আত্মসুখের জন্য আরামদায়ক অবগাহন নয়, কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরে কঙ্করপূর্ণ প্রান্তরে জনসেবার জন্য আয়াসসাধ্য আত্মনিবেদনই করবেন তিনি।

বন্ধু-বান্ধবেরা বোঝায় সুভাষচন্দ্রকে—শ্রীরমেশ দত্ত মশাই কি আই. সি. এস. হওয়া সত্বেও দেশ সেবা করছেন না ? সুভাষচন্দ্রের সেই একই উক্তি—ওসব দেশ সেবা নিশ্চয়ই, কিন্তু বৃটিশ পরিচালিত পথে নির্দ্দিষ্ট ওসব, ওতে বৃটিশের স্বার্থরক্ষাও হয়। তিনি স্বাধীন মতে জনসেবা করতে চান যে ভাবে তার সুযোগ ওখানে কোথায় ? তাছাড়া ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য যে বৃহত্তর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে উন্মুখ তিনি তা সম্ভব হবে কি করে যদি আই. সি. এস-এর চাকরী নেন তিনি।

খুব অকিঞ্চিৎকর হলেও আই. সি. এস. ছাড়বার জুৎসই অজুহাত জুটে গেল একটা। আই. সি. এস.-এ শিক্ষানবিশির সময় চলছে তখন ! একটা অনুবাদ করতে দেওয়া হ'ল শিক্ষার্থীদেরকে—যার ফলে সুভাষচন্দ্রকে স্বহস্তে লিখতে হ'ত—'ভারতীয় সিপাহিরা অসৎ'—এমন একটা বাক্য। সুভাষচন্দ্রের জাত্যভিমানে আটকায় ও-কথা লিখতে—নির্দ্বিধায় আই. সি. এস. ছেড়ে দিলেন সুভাষচন্দ্র মাস আটেকের মাথায়। বাইশে এপ্রিল ১৯২১ সালে তৎকালীন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগুকে লিখিত-ভাবে জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর ঐ অভিপ্রায়ের কথা ; ইতিমধ্যে তিনি যে একশত পাউণ্ড ভাতা হিসাবে পেয়েছেন তাও প্রত্যর্পণ করবার কথা জানিয়েছিলেন ঐ চিঠিতে। আক্ষেপ ঝরে পড়ল বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহে—ইংরেজ সরকার হাতছাড়া করেছে এক অমূল্য রত্ন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন সুভাষচন্দ্র। ভারতীয়দেরকে প্রকাশ্যে ঘৃণা করতে কি প্রচ্ছন্ন ভাবেই না শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আই. সি. এস.-দের শিক্ষানবিশির সময়ে। 'ভারত বিদ্বেষী তীব্র ঘৃণাসূচক ও অবমাননাকর কত কথাই না চরম

বিবমিষার সঙ্গে সহ্য করতে হয়েছে সুভাষচন্দ্রকে। ভারতীয় সহিসেরা তাদের ঘোড়ারা যা খায় – তাই নাকি খায় —ভারতীয় ব্যবসায়ীরা নাকি অত্যন্ত অসাধু এসব উক্তি আছে তাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যেই। এসব পড়তে পড়তে প্রতিবাদও অবশ্য জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র কর্তৃপক্ষের অন্যতম মিঃ রবার্টসের কাছে। রবার্টস্ সাহেব কথাও দিয়েছিলেন তাঁকে এসব উক্তি বাদ দিয়ে দিবেন পাঠ্যক্রম থেকে; কিন্তু কই? সেই একই ধারা তো অব্যাহত আছে এখনো। রবার্টস্ সাহেব তাঁর কথা রাখতে পারেন নি ঠিকই, তবে অনুরোধ করেছিলেন যেন আই. সি. এস. থেকে পদত্যাগ না করেন। সুভাষচন্দ্র খুব স্বাভাবিক কারণেই রাখতে পারলেন না তাঁর এই অনুরোধ।

আত্মীয়স্বজন এমনকি আপন পিতার একান্ত ইচ্ছা মেনে নিয়েই কি থাকলেন তিনি আই. সি. এস-এ? এই পর্বে প্রচুর চিঠিপত্র লিখলেন তিনি। মেজদা শরৎচন্দ্রকে লিখলেন—আপসহীন আদর্শের দ্বারাই কেবল একটি জাতি গঠন সম্ভব; বন্ধুবর চারু গাঙ্গুলীকে চিঠি লিখলেন—সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেড়ানোতে আনন্দ আমার—কি করবে ক্ষমতা, সম্পত্তি বা সম্পদ!—এ পর্য্যায়ে সরাসরি চিঠি দেননি তিনি বাবাকে – কিন্তু মেজদার চিঠিতে জানতে পারলেন বাবার ভীষণ রকম ক্ষুন্ন হওয়ার কথা। এমন যে হবে এতো জানতেনই তিনি, কিন্তু যখন জানতে পারলেন মা মোটের উপর খুশীই—ঐ মেজদারই চিঠি থেকে, কি স্বস্তিবোধই যে করলেন তিনি। জন্মদাত্রী মা তাঁর, তাকে তাঁর জীবনধাত্রী মায়ের জন্য উৎসর্গ করতে গররাজী নন—এ কি কম আনন্দের সংবাদ তাঁর কাছে। জানকীনাথও শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের এই পদক্ষেপ—শুধু তাই নয়, বিসর্জন দিয়েছিলেন আপনার রায় বাহাদুর খেতাব।

মেজদা শরৎচন্দ্র খুব একটা অখুশী না হলেও, খুশীও হতে পারলেন না তেমন। তিনি চেয়েছিলেন—সুভাষচন্দ্র যোগ দিক্ আই. সি. এস-এ এবং তারপর না হয় ত্যাগ করুক তা, কিন্তু তা হলে তো সুভাষচন্দ্রকে আটকে থাকতে হবে আরও কয়েকটা মাস। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তিনি এখনই।

একাধিক চিঠি তিনি এসময় লিখেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-কেও। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১-এ যে চিঠি দিলেন তাঁকে। তাতে জানালেন আপনার বিস্তৃত পরিচিতি এবং মানসিক প্রস্তুতির কথা; সরাসরি ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে। তাঁর বিচারে—কংগ্রেস কেবল ভাঙছে এখন, এখনই নোতুন সৃষ্টি আরম্ভ করা চাই, আর তার জন্যে চাই অনেক দিনের চিন্তা আর গবেষণা। দিন পনের না পেরোতেই ২রা মার্চ ১৯২১-এ এখনই কি করতে চান তা জানালেন তিনি—হয় শিক্ষকতা করবেন, নয় সংবাদিকতায় নামবেন আর পরে না হয় সুবিধামত অন্যকিছু করবেন তিনি; আর আই. সি. এস. ছেড়ে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য তো বরণই করে নিয়েছেন তিনি—তাই কোনো রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্যতম ব্যবস্থা করতে পারলেই চলে যাবে তাঁর।

এঁদেরকে ছাড়াও অন্যান্য অনেককে এ সময় চিঠি লেখেন সুভাষচন্দ্র, আর সে সবের মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর ভারত ভাবনার তথা দেশপ্রীতির কথা, অন্যদিকে তেমনি তাঁর আপাতঅস্থির মনের পরিচয়ও ফুটে ওঠে। কাউকে লিখছেন—দেশে ফিরে এসে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা নিয়ে মানুষ তৈরী করার ব্রত গ্রহণ করবেন তিনি ;—কাউকে জানাচ্ছেন—কোনো সংবাদপত্রের দায়িত্ব নিয়ে জনজাগরণ ঘটাবেন এবার ;—কখনো লিখছেন—দেশময় ঘুরে বেড়াবেন, সংস্থা সমিতি ইত্যাদি স্থাপন করে জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জনহিতকর কাজ প্রত্যক্ষভাবে করবেন ;—আবার কখনও জানাচ্ছেন—রামকৃষ্ণ মিশন অথবা বোলপুর শান্তিনিকেতনে থেকে সাধুসন্তদের মতো করে জীবনযাপন করবেন তিনি। তবে সবার উপরে একটা কাজ অবশ্যই করবেন তিনি—তা হ'ল গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ।

১৯২১ সালে গোড়ার দিকে ফল প্রকাশিত হ'ল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস্ পরীক্ষার। ফল যদিও খুব একটা ভালো হয়নি—তাতেও সুভাষচন্দ্র যথারীতি সসম্মানেই উত্তীর্ণ। এতো অল্প সময়ের প্রস্তুতি, এতো মানসিক দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা, তবু তারই মধ্যে এই অভাবনীয় ফল—সুভাষচন্দ্র অবাক হ'লেও অবাক হননি অন্যেরা। মেধাবী ছাত্র তিনি—তার উপরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তিনি ছাত্রজীবনে পাঠগ্রহণে অবহেলা করবেন না আদৌ—তার স্বাভাবিক পরিণতি এমন তো হবেই।

অল্পদিনের ব্যবধানে পরপর দুটি কঠিন সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন তিনি। এর থেকে অনুমান করা চলে হয়তো বা এ সময়ে রাজনীতি এবং অন্যান্য ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিলেন তিনি। ঘটনা কিন্তু আদৌ ছিল না তা। প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালীন তাঁর ভিন্ন হৃদয় বন্ধু শ্রীদিলীপ রায় এখানেও সহবাসী ছিলেন তাঁর—তাঁর সঙ্গে পূর্বেকার মতই যথারীতি আলোচিত হ'ত আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ, বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ইত্যাদি। আর যাঁরা বন্ধু ছিলেন ওখানে—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; শ্রী সি· সি· দেশাই—এঁদের সঙ্গে চলত উত্তপ্ত রাজনৈতিক আলোচনা। ভারতবর্ষে ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে কতই না রাজনৈতিক আলোড়ন—মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট, ১৯১৮, ১৯১৯-এ ভারত শাসন আইন, রাউলাট এ্যাক্ট, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ১৯১৯; আর ভারতের বাইরেও বিশেষ করে রাশিয়াতে ১৯১৭-তে সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা, প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি, সুভাষচন্দ্রের সজীবমন খোঁজখবর রাখেন সবকিছুর। এ সবের সংবাদ সংগ্রহ, এসব নিয়ে তর্ক বিতর্ক অব্যাহত আছে তাঁর, আর ওখানে রয়েছে যে ইণ্ডিয়ান মজলিস—মহামান্য বিপ্লবী তিলকের মতো আদর্শ নেতা সদস্য ছিলেন যার একসময়ে, তার সদস্যপদ গ্রহণ করে এক উৎসাহী ভূমিকায় মুখর তিনি সেখানেও। সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ-মুক্তিকামী বিদ্রোহীমন এমন উত্তেজনাকর আবহাওয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে, তাও কি সম্ভব ?

অস্বাভাবিক রকমের সংযত জীবনযাপন করতেন এ সময়ে সুভাষচন্দ্র। এমনিতে যথেষ্ট নিয়মনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন উনি, এখানে সেই চিরাচরিত অভ্যাস যেন দৃঢ়ভূত হ'ল আরও। শ্রীদিলীপ রায় পরবর্তীকালে সাক্ষ্য দিয়েছেন—এই প্রবাসকালে সুভাষচন্দ্র নাকি কখনো কোনো ইংরেজ ললনার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে কথা বলতেন না পর্য্যন্ত—আর তাঁর বৃটিশ-বিদ্বেষ নাকি চরম তৃপ্ত হ'ত যখন ইংরেজরা জুতা পালিশ করে দিত তাঁর অথবা ইংরেজ ভৃত্যেরা হুকুম তামিল করত আদেশমাত্র।

এই সময়ে লণ্ডনে থাকাকালীন এক ভারতীয় বিশিষ্ট পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের। ডাঃ ধরমবীর সস্ত্রীক দুই কিশোরী কন্যাসহ তখন বাস করতেন সেখানে। সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও মাঝে মাঝে যেতেন এই ডাঃ ধরমবীরের বাড়ীতে। মিসেস্ ধরমবীরকে দিদি ডাকতেন তিনি—মিসেস্ ধরমবীরও পরম স্নেহে সমাদর করতেন সুভাসচন্দ্রকে। প্রবাসকালে মাতৃস্নেহের অভাব তাঁর কিছুটা পূরিত হয়েছিল এই মহিলার কাছ থেকেই।

ভারতবর্ষে ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ঘটেছিল ভারতের পটপ্রেক্ষায় গতির সঞ্চার, প্রবাসে তাঁর মধ্যে ঘটল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষায় ব্যাপ্তির সমাহার; এ পর্য্যন্ত ভারতে থাকতে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল যে বিস্তৃতির বিচ্ছুরণ, ইংল্যাণ্ডে থাকতে তাতে তিনি যেন যুক্ত করলেন যতির আহরণ। কৈশোরের দীক্ষাজনিত অঙ্কুরোদ্গম যৌবনের শিক্ষাসংযোগে পত্রে পল্লবে মুকুলিত হতে থাকে। গতির অস্থিরতায় যুক্ত হয় যতির সুস্থিরতা, উদ্দাম অগ্রসরমানতার সঙ্গে আত্মস্থ হওয়ার নিয়ন্ত্রণ।

কটকের প্রোটেস্টাণ্ট ইউরোপিয়ান স্কুল থেকে পাওয়া হয়েছে নিয়মানুবর্ত্তিতার শিক্ষা, ওখানকার র‍্যাভেনস্ কলেজিয়েট স্কুল থেকে নেওয়া হয়েছে দেশ প্রেমের দীক্ষা, কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পেলেন ইংরেজ বিদ্বেষের গভীরতা, আর ওখানকার স্কটিশচার্চ কলেজে থেকে দেখলেন রণকৌশলের প্রয়োজনীয়তা; সর্বশেষ এই ইংল্যাণ্ডে ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক মহান সে তাঁর সকল রকমের শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি আর প্রবণতা এক অভূতপূর্ব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে জন্ম দিল এক স্থিতধী কিন্তু বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের। বিশ্ব সমন্বয়ে চিরস্থায়ীভাবে সংস্থাপিত হওয়ার প্রাক্‌মুহূর্ত্তে উৎক্ষেপণ পর্বে স্তরক্রমে সংযোজিত হতে থাকে অগ্নিস্রাবী সেবক-সন্ন্যাসী-সৈনিক ইত্যাদি প্রজ্জ্বলনকারী উপাদানসমূহের কাম্য পরম্পরা।

এক নিঃস্বার্থ সম্পূর্ণ সমর্পিত জীবন সুরু করতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত হলেন সুভাষচন্দ্র জুলাই ১৯২১-এ।

কংগ্রেসে সৈনিক

আই· সি. এস· ছেড়ে বিলাত-ফেরৎ হলেন সুভাষচন্দ্র জাহাজ-যোগে। কি অপূর্ব মনিকাঞ্চন যোগ! ঐ জাহাজেই সহযাত্রী পেলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে। অনেক কিছুই আলোচিত হ'ল এক অগ্রগমন-প্রয়াসী, স্বাধীনতা-পিয়াসী উজ্জ্বল স্বয়ম্ভর যুবকের সঙ্গে এক ক্রান্তদর্শী অতলস্পর্শী প্রোজ্জ্বল স্বতন্ত্র মহর্ষির। কবিগুরুর আশিস্-সিঞ্চনে অভিসিক্ত হলেন তিনি; নিশ্চিন্ত হলেন সুভাষচন্দ্র, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বই দূরীভূত হ'ল তাঁর।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন অসহযোগ আন্দোলনের যাথার্থ্য নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি প্রবর্তিত অসহযোগের পক্ষে ছিলেন না কখনো, তাঁর দার্শনিক সুলভ বিশ্বমানবতার যুক্তি ছাড়াও বললেন তিনি—এই যে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে সবাই অসহযোগের ডাকে—অতঃ কিম্—পরিপূরণকারী ব্যবস্থাপনা কি ঐ শূন্যতা পূরণ করার পক্ষে যথেষ্ট? তা যদি না হয় তবে এই আন্দোলন তো ক্ষতিকারকই। গঠনমূলক কর্মসূচী কোথায় এর মধ্যে;—পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকে তার বিজ্ঞান, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হলে সে তো বরং স্থবিরত্বের কারণই হবে।

সরাসরি বাড়ী ফিরলেন না সুভাষচন্দ্র। জাহাজ ২১শে জুলাই, ১৯২১—বোম্বাই বন্দরে ভীড়লে গেলেন উনি গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধীজি তখন অবস্থান করছেন বোম্বাইতেই। নেতাজীর গান্ধীজির প্রতি সারা জীবনের সশ্রদ্ধ বিরোধিতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী তাঁর এই প্রথমতম সাক্ষাৎকার। তাঁদের এই প্রথম দর্শন তাঁদের পারস্পরিক যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন ও বটে। সুভাষচন্দ্রের পরনে পুরো সাহেবী পোষাক—আর গান্ধীজী তখনই তথাকথিত অর্দ্ধনগ্ন ফকির। আপন পোষাকের কারণে সলজ্জ সুভাষ ক্ষমা চাইলেন গান্ধীজির কাছে, গান্ধীজির উচ্চকিত হাসিতে তরলও হয়ে গেল সুভাষচন্দ্রের সে সংকোচ। কিন্তু মনের দ্বিধা কাটল কই? প্রাচীন ভারতের সারল্য আর সাত্ত্বিকতার মূর্ত্তরূপ তিনি—কিন্তু বর্তমান দিনের ভারত যার গড়ে ওঠা উচিত এমনকি পাশ্চাত্যের সঙ্গেও 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'-র সুসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে—গান্ধীজির চিন্তা-ভাবনায় তার ঠাঁই কোথায়! ত্যাগ আর সারল্য মানে আর যাই হোক দারিদ্র্য আর দৌর্ব্বল্য নয় নিশ্চয়ই। সাহেবী পোষাক ছেড়ে গান্ধীজির অনুকরণে সুভাষচন্দ্র খদ্দর আঁকড়ে ধরলেন ঐ সময় থেকে নিবিড় করে কিন্তু বহিরঙ্গের এই পরিবর্তন তার মনের পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয় না আদৌ। দেশপ্রেমের বিশুদ্ধ বীজ ভারতের তৃণমূল পর্যন্ত সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন গান্ধীজি—সুভাষচন্দ্র কি পারবেন না, আপন মানসিকতায় গান্ধীজিকে সংক্রামিত করে ঐ উদ্বেল আন্দোলনকে একটু অন্যভাবে পরিচালিত করতে।

কংগ্রেসের নেতৃত্বভার নিয়েই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে গান্ধীজি সারা ভারতে অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছেন তখনই, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সংশয় এই অসহযোগের পথ ধরে ক্ষমতার হস্তান্তর, তা কি আদৌ সম্ভব? জটিল এই প্রশ্ন জেগেছে তাঁর মনে, সমাধান চাই তার। তা ছাড়া গান্ধীজি যে বলছেন—এক বৎসরের মধ্যেই ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করবেন তিনি—তাই বা সম্ভব হবে কিভাবে? পরিষ্কার এই প্রশ্নই রাখলেন সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সামনে; গান্ধীজির উত্তর—সম্ভব, হৃদয় পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে (By Change of heart)। সংশয় মুক্তি ঘটে না সুভাষচন্দ্রের। গান্ধীজির আবেদনে হয়তো বা হতে পারে হৃদয় পরিবর্তন ভারতীয়দের, কিন্তু ইংরেজদের যে তা হবে তার সম্ভাবনা কতটুকু? তার লক্ষণই বা আদৌ দেখা যাচ্ছে কোথায়? গান্ধীজির সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে আর সুমিষ্ট ভাষণে যথেষ্ট আকর্ষণ বোধ করেন সুভাষচন্দ্র, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তাঁর ঐ উত্তরে।

আরও প্রশ্ন তাঁর—অসহযোগ আন্দোলন মানে তো সরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেরিয়ে আসা, সরকারী খেতাব ও সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করা, সরকার মনোনীত সদস্যপদ ত্যাগ করা, আইন আদালত বর্জন ও সরকারী অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ না করা, এবং পাশাপাশি চরকা কাটা, খাদি ব্যবহার করা, মাদক বর্জন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, স্বদেশী দ্রব্যাদি তৈরী ও ব্যবহার—এসব বোঝায়, কিন্তু এ সব করে এক বৎসরের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হবে কিভাবে—তার সুস্পষ্ট উত্তর মিলল না গান্ধীজির কাছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশেরও অনুরূপ সংশয় ছিল অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে, তাঁকে স্বমতে আনতে সমর্থ হয়েছেন গান্ধীজি—শুধু তাই নয়, তারই সহায়তায় সমর্থ হয়েছেন সংশয়বাদী বামপন্থী আর সন্ত্রাসবাদীদেরকে এই আন্দোলনে সামিল করতে—দেশবন্ধু নিশ্চয়ই পারবেন সুভাষচন্দ্রকে বোঝাতে। পরামর্শ দিলেন গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রকে দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

কোলকাতায় ফিরেই সুভাষচন্দ্র দেখা করলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে, গান্ধীজির নির্দেশ মেনে। সুভাষচন্দ্র আগের থেকেই পরিচিত ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের, অল্পদিন পূর্বেই চিঠিপত্র মারফৎ জেনেছেন তিনি সুভাষচন্দ্রের মনোবাসনা—এখন তাঁকে সামনে পেয়ে পরম সন্তুষ্ট হলেন চিত্তরঞ্জন। তিনি যেমন এক যোগ্য সহকারী পেয়ে খুশী হলেন, তেমনি তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবীও পরমপ্রীত হলেন তাঁর মধ্যে এক পুত্র-সন্তান প্রাপ্তির আনন্দে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বাসন্তীদেবীর বাৎসল্য সম্পর্ক পরবর্ত্তী সময়ে এমন গভীর হয়েছিল যে অল্পদিন মধ্যে স্বয়ং প্রভাবতী দেবীই বললেন যে, বাসন্তী দেবীই তাঁর আসল মা আর তিনি স্বয়ং তাঁর ধাত্রী মা মাত্র। গুরুশিষ্যের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রভিত্তিক মধুর সম্পর্ক পারিবারিক পিতাপুত্রবৎ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত হতে দেরী হয়নি আদৌ। সুভাষচন্দ্রের তারুণ্যের দীপ্তি, ত্যাগীর ভাবমূর্ত্তি, উদ্দীপক ভাষণ শক্তি এবং প্রশাসনিক দক্ষতায় মুগ্ধ হলেন চিত্তরঞ্জন অল্পদিন মধ্যেই।

বাড়ীতে বাবা মা ছাড়াও অন্যান্য স্বজনেরা বড়ো হতাশ বোধ করেন সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে। জানকীনাথের প্রতিটি পুত্রই যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত স্ব স্ব ক্ষেত্রে, সুভাষচন্দ্রকে তাঁদের বড়ো বেমানান লাগে এঁদের মধ্যে। একমাত্র মেজদা শরৎচন্দ্র কিন্তু উল্লসিত বোধ করেন খুবই, সেই সঙ্গে মেজ বৌদি বিভাবতী দেবীও সস্নেহ প্রশ্রয়ে আশ্বস্ত করেন তাঁকে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির মহাহবে বলিপ্রদত্ত হতে চলেছে আদরেরর সুবি তাঁদের, এতো বরং পরম শ্লাঘ্য ব্যাপার একটা—স্পর্শমণি সে, তার প্রেরনায় স্বর্ণসৈনিক হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে অপেক্ষমান যে শত সহস্র ভারতীয়, তাদের ডাক তাদের এই ভাই উপেক্ষা করবে, তাও কি সম্ভব ? তুচ্ছ গোলামীর জীবন কখনই বরণ করতে পারে না সুভাষ।

দেশবন্ধুর প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে সুরু হ'ল সুভাষচন্দ্রের অনলস কর্মযজ্ঞ। গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়েই তো আই. সি. এস. ত্যাগ করেছেন তিনি—যেটুকু সংশয় ছিল অসহযোগের পন্থা নিয়ে দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে আপাততঃ দূরীভূত হয়েছে তা—ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি কাজে। বিলাতী বর্জন করতে হবে, এ ব্যাপারে তিনি তো আগ্রহান্বিত বিদ্যালয়-জীবন থেকেই—এখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের তরফে তাঁর উপর পড়ল এই কাজের দায়িত্বভার—মহোৎসাহে তুলে নিলেন তিনি সে ভার আপন স্কন্ধে। সঙ্গে চলতে থাকে কংগ্রেস আদর্শ প্রচার সহায়ক আনুষঙ্গিক কার্য্যাবলী। বিলেত থেকে পত্র মারফৎ অনেক ইচ্ছার সঙ্গে সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণের ইচ্ছার কথা জানিয়ে ছিলেন তিনি—সেই সুবাদে পেলেন ক্রমে ক্রমে বাংলার কথা (১৯২১) আত্মশক্তি ১৯২২) ও পরে পরে ফরওয়ার্ড (১৯২৩) পত্রিকাসমূহের সম্পাদনা এবং / অথবা পরিচালনার ভার। একান্ত আন্তরিকতায় সুভাষচন্দ্র তুলে নেন সে সমস্ত কর্মভারও। পাশাপাশি বিলাতী বস্ত্রসম্ভারের বহ্ন্যুৎসব হতে থাকে ক্রমে ব্যাপকতর।

আরও একটা কাজের ভার পেলেন সুভাষচন্দ্র। স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্রেরা যে সব বেরিয়ে পড়ছে তাদের পরিবর্ত্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে যে জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ—তারই মধ্যে একটি—১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে অবস্থিত—কলিকাতা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষতা করবার ভার দেওয়া হয়েছে তার উপরে। এখানে তিনি সহকর্মী হিসাবে পেলেন বাল্যবন্ধু হেমন্ত সরকার ছাড়াও ব্যারিষ্টার শ্রীকিরণশঙ্কর রায় আর কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে, জাতীয় বিদ্যলেয় সমূহের তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষাগ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে ঐ সালেই অর্থাৎ ১৯২১-এ একই বাড়ীতে যে গড়ে তোলা হয়েছে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন—তারও কাজকর্ম পরম দায়িত্বশীলতায় সঙ্গে দেখাশোনা করতেন তিনি-আর কিরণশঙ্কর রায় "কলিকাতা বিদ্যাপীঠ"-এর শিক্ষকতা করা ছাড়াও পালন করতেন এই গৌড়ীয় "সর্ববিদ্যায়তন"-এর সম্পাদকের দায়িত্ব।

আপন উদ্যোগে এ সময় তিনি করে ফেললেন আরও একটি মহৎ কাজ। একদল

বিপ্লবপন্থীদের সহায়তায় গড়ে তোলা হ'ল বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। সামরিক কায়দায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হ'ত তাদের। স্কটিশচার্চ কলেজে ছাত্র থাকাকালীন ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর-এর সদস্য হিসাবে যে যৎসামান্য সামরিক শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি তার প্রায়োগিক প্রকাশ ঘটতে থাকে এখানে। সেনানী হওয়ার শিক্ষানবিশি নয়, সেনানায়ক হওয়ার শিক্ষানবিশি যেন নেওয়া হ'ল তাঁর এ পর্য্যায়ে।

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর—ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ ভারত পরিদর্শনে আসবেন,—ইরাজ সবকারের একান্ত ইচ্ছা—ভারতীয়েরা যথাযোগ্য মর্য্যাদায় অভ্যর্থনা জানাক্ তাঁকে; কিন্তু শুনবেন কেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সে কথা। অসহযোগ তখন সব কিছুতে। কাজেই ওদিন ডেকে দেওয়া হ'ল সারাভারত হরতাল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে কোলকাতায় পালিত হ'ল সে দিনটি; ঐ সময়কার সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিকতা আখ্যাত হ'ল বৃটিশ সংবাদপত্র কর্ত্তৃকই Bull dog tenacity হিসাবে। চরম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল্ ইংরেজ;—একদিন বাদেই ১৯শে নভেম্বর বেআইনি ঘোষণা করল তারা—প্রথমে বাংলা সরকার এক ইস্তাহারের মাধ্যমে, এবং পরে ভারত সরকার দ্বারা সারা ভারতে—কংগ্রেস জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে এবং খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকেও। কংগ্রেস নিস্পৃহ থাকতে পারল না এ ঘটনায়—তীব্রতর করে তোলা হ'ল আন্দোলন।

স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ একনিষ্ঠভাবে করে তোলার স্বার্থে সুভাষচন্দ্র এ সময় ছেড়ে দিলেন কলকাতা বিদ্যাপীঠ-এর অধ্যক্ষপদ। নিষেধাজ্ঞা থাকায় খুব বেশী স্বেচ্ছাসেবক না পাওয়া যাওয়ার কারণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ঠিক করলেন তাঁর ছেলে চিররঞ্জন আর স্ত্রী বাসন্তী দেবী এগিয়ে আসবেন স্বেচ্ছাসেবক হতে—সেই সঙ্গে অবশ্য ফতোয়া দিলেন তিনি সুভাষচন্দ্রের এগিয়ে আসা চলবে না এ কাজে, কারণ স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার অবশ্যম্ভাবী শাস্তি যেহেতু কারাদণ্ড তাই সুভাষচন্দ্রের যাওয়া চলবে না কারান্তরালে—বাইরে তাঁর অনেক কাজ। এ সময়ে বাসন্তীদেবী গ্রেপ্তার হলে সে সংবাদে কোলকাতা হয়ে উঠল আন্দোলনে উত্তাল। বৃটিশ সরকার বাধ্য হল ঐ রাত্রেই বাসন্তীদেবীকে ছেড়ে দিতে। গ্রেপ্তারের আশংকায় জনগণ খুব বেশী এগিয়ে আসছিলেন না স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লেখাতে—এখন এই বাসন্তীদেবীকে গ্রেপ্তার করার ফলে হাজারে হাজারে এগিয়ে আসতে থাকেন তাঁরা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে বৃটিশ সরকার।

এ সময়ে ঘটে বেশ একটি মজার ঘটনা। বাসন্তীদেবী ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরলেন যখন সুভাষচন্দ্র ছিলেন না সেখানে। খানিক পরে ওখানে গিয়ে বাসন্তী দেবীকে দেখে চমকে উঠেন তিনি, আর সুরু করে দেন অঝোর ধারায় কান্না। ঐ যে কাঁদলেন সুভাষচন্দ্র এর ফলে দেশবন্ধু ঠাট্টা করে তাঁর নাম রাখলেন—crying captain—ছিঁচ কাদুনে নেতা। অবরুদ্ধ আবেগের এই যে তীব্র বহিঃপ্রকাশ-এ mere cry-নিছক কান্না-না থেকে পরবর্ত্তী কালে রূপান্তরিত

হ'ল অপ্রতিরোধ্য সম্বেগের—war cry—রণহুঙ্কার-এ ; আবেগাপ্লুত অশ্রুবর্ষণ উন্নীত হয় অতি উদাত্ত অস্ত্রগর্জনে। তখন অবশ্য সুভাষচন্দ্র নকল ক্যাপ্টেন মাত্র নন, রীতিমত আসল জেনারেল। ঠাট্টা করে এই crying captain ছাড়া দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে ডাকতেন যুবক-বৃদ্ধ বলেও মাঝে মাঝে,তাঁর ধীরস্থির আচরণের কারণে।

যাই হোক দমন পীড়নের সমস্ত তীব্রতা অগ্রাহ্য করে ঘনীভূত হতে থাকে অসহযোগ আন্দোলন—প্রতিক্রিয়ায় খদ্দর বিক্রি পর্য্যন্ত বেআইনি ঘোষণা করে ইংরেজ সরকার। কিন্তু এতো সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এল এ কাজে যে শেষ পর্য্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হ'ল সরকারী কর্তৃপক্ষ. তা হলে কি হয়, গ্রেপ্তার করা হ'ল সুভাষচন্দ্রকে ১০ই ডিসেম্বর ১৯২১-এ ; দেশবন্ধুও গ্রেপ্তার হলেন এ সময়। কি অপরাধে যে আটক হতে হ'ল তাঁকে, ভেবে পান না সুভাষচন্দ্র। এমনই অবাক হয়ে ছিলেন তিনি এই ঘটনায় যে বিচারকালে বিস্ময়াভিভূত প্রশ্ন রেখেছিলেন তিনি—"Have I robbed a fowl—আমি কি মুর্গী চুরি করেছি ?"

গর্বিত বোধ করেন পিতা জানকীনাথ। সুভাষের জন্তেই রায়বাহাদুর খেতাব ত্যাগ করেছেন তিনি—এই প্রথম লিখিতভাবে শরৎচন্দ্র বসুকে এক চিঠি মারফৎ আপন মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেন তিনি, সুভাষচন্দ্রও পরম প্রীতবোধ করেন এ সংবাদে। যে বাবা এক সময় পড়ার ঘরে টাঙানো বিপ্লবীদের ছবি ছিঁড়িয়েছেন, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রশংসা করে তাঁকে দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়েছেন এবং তাঁর আই· সি এস. ত্যাগে দুঃখিত বোধ করেছেন—বর্তমানে তিনি কিনা আদৌ মুষড়ে না পড়ে গর্বিত বোধ করছেন তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে। সুভাষচন্দ্রের পিছনটান আর থাকল না কিছু! দাদা শরৎচন্দ্র বসুও সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এ ঘটনার পর থেকে।

দু'মাস হাজতবাস আর ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড—মোট আট মাস আটকে থাকতে হ'ল এঁদেরকে। অবশ্য শাপে বর হ'ল এ ঘটনা, ঐ সময় আলিপুর জেলে পাশাপাশি সেলে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল দু'জনের। গুরুশিষ্য একত্রে থাকার কারণে অখণ্ড অবসর পেলেন গুরুত্বপূর্ণ মতামত বিনিময়ের ও প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনার। প্রাজ্ঞগুরুর প্রত্যক্ষ ও সযত্ন পরিচর্য্যায় সমৃদ্ধতর নেতৃত্ব গুণে পুষ্ট হতে থাকেন সুভাষচন্দ্র। ওনারা ভাবেন—সারা ভারতবর্ষই তো কারাগার একটা— তার মধ্যে এই যে এমন নিরিবিলি নিরুপদ্রব মন্ত্রণালয় পাওয়া গিয়েছে এখানে—এতো বরং পরম ভাগ্যের ব্যাপারই।

ওখানে থাকতে সুভাষচন্দ্র একবেলা রান্না করতেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্তে ; এ নিয়ে পরবর্ত্তী জীবনে বরং গর্ববোধই করতেন সুভাষচন্দ্র। অতি ঘনিষ্ঠতা পরবর্ত্তী সময়ে সুসম্পর্ক রাখার পক্ষে অতি অনিষ্টকর-এ আপ্তবাক্য কিন্তু প্রযোজ্য ছিল না এই দু'জনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সুভাষচন্দ্র যদি প্রশ্নহীন আনুগত্য সব দিনের জন্য কারও প্রতি জানিয়ে থাকেন তা ছিল এই দেশবন্ধুর প্রতি—এ কথা নিজেই স্বীকার করেছেন

তিনি। দেশবন্ধু অধিকদিন জীবিত থাকলে এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি ঘটত সে সম্ভাবনার কথা অবশ্য জোর করে বলা যায় না।

বাইরে অসহযোগ আন্দোলন উত্তাল তখন, সমানে চলছে বিদেশী বর্জন আর বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব, এই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র আর চিত্তরঞ্জনের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হয়ে আরও দুর্বার হয়ে ওঠে সে আন্দোলন। এই অভাবনীয় উত্তেজনার সঙ্গে যুক্ত হ'ল আরও এক নতুন মাত্রা—উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলায় চৌরিচৌরার হত্যাকাণ্ড, সুরাট জেলায় বারদৌলি সত্যাগ্রহ সুরুর প্রাক্কালেই ঘটে গেল সে ঘটনা। এক নিরীহ কংগ্রেসী মিছিল থানাকর্মীদের আচরণে উত্যক্ত হয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২-এ আক্রমণ করেছে ঐ থানা; লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ছাড়াও মৃত্যু হয়েছে বাইশজন থানা কর্মীর। গান্ধীজি বাধ্য হলেন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করতে—এমন নৃশংস ব্যবহার তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না—অহিংসার পূজারী তিনি—জনসাধারণের আরও অধিক পরিমাণে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন তাঁর অহিংসা মন্ত্রে, তবেই না সার্থক হবে তাঁর নির্দেশিত অসহযোগ আন্দোলন।

গ্রেপ্তার হতে হল গান্ধীজিকেও। ১৯২২ সালের ৩রা মার্চ গ্রেপ্তার হলেন তিনি এবং তিন বৎসরের কারাদণ্ড হ'ল তাঁর। আন্দোলন এভাবে মাঝ পথে প্রত্যাহৃত হওয়ার কারণে চরম আশাহত হলেন বিশেষতঃ বাংলা আর মহারাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ; দেশবন্ধু, মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও চরম হতাশ বোধ করেন গান্ধীজির এই পদক্ষেপের ফলে। দেশবন্ধু ক্ষুণ্ন হলেন একটু বেশীই—অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে তাঁর নিজেরই যে খুব একটা উৎসাহ ছিল এমন নয়, অথচ তাঁরই সহায়তায় এ ব্যাপারে গান্ধীজি সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন সন্ত্রাসবাদী এবং কংগ্রেসী বামপন্থী সংশয়বাদীদের—এখন দেশবন্ধু কি ব্যাখ্যা দিবেন এই পশ্চাদপসরণের।

সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই ঘটল উত্তরবঙ্গে এক বিধ্বংসী বন্যা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সভাপতি করে গড়ে তোলা হ'ল এক ত্রাণ সমিতি আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সেবক সুভাষ ঝাঁপিয়ে পড়লেন বন্যার্তদের উদ্ধার ও সাহায্য কার্য্যে। পুরো প্রায় চার মাস থাকলেন তিনি এ সময়ে আর্তত্রাণ সমিতির কেন্দ্র সান্তাহারে। খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, আরাম-বিশ্রাম সমস্ত ব্যাপারেই চরম কৃচ্ছসাধন করতে হ'ল তাঁকে এ সময়ে। দুর্গা পূজার এমন যে পরম ভক্ত তিনি—এবার বাবার আহ্বানেও গেলেন না পারিবারিক পূজার উৎসবে যোগ দিতে। ও বৎসরের দুর্গা পূজা সারলেন তিনি অসহায় দুর্গত মানুষজনদের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। এই সেবা কাজে সুযোগ্য সহযোগিতা পেলেন তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের কাছ থেকেও; সঙ্গে দেশবন্ধুর প্রেরণা তো ছিলই। জনপ্রিয়তার কি স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যেই না উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র এ সময়ে। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন পর্য্যন্ত

পরম মুগ্ধতায় মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন এ কাজের। একদিকে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও সরকারের নিস্পৃহ-নিষ্ক্রিয়তা, অন্যদিকে দুর্গতদের প্রতি কংগ্রেসের এই সেবাকার্য্য—সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকেও করে তোলে প্রভূত জনপ্রিয়।

কংগ্রেসে গান্ধীজির আস্থাভাজন হয়ে থাকা আর খুব বেশী দিন সম্ভব হ'ল না সুভাষচন্দ্রের পক্ষে। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারেব প্রশ্নে মতদ্বৈধতা তো ছিলই—১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়া অধিবেশনে কংগ্রেস হয়ে গেল দ্বিধা-বিভক্ত। দেশবন্ধু সভাপতি সেবার কংগ্রেসের, উনি চাইলেন সামনে যে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন আসছে তাতে অংশগ্রহণ করতে, সমর্থনও পেলেন মতিলাল নেহেরু, বিঠল্ ভাই প্যাটেল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ; কিন্তু গান্ধীজির নেতৃত্বে তাঁর সমর্থকেরা বিরোধী তাঁর, দেশবন্ধুর যুক্তি—আইন সভায় প্রবেশ করে সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিয়ে ইংরেজকে জেরবার করবার সহজতর পথ খুলে দেবে এই পদক্ষেপ। গান্ধীজি মানতে নারাজ সে যুক্তি ; তাঁর সমর্থকদের নিয়ে পুরাতন পন্থীই থাকতে চান তিনি ; দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বাকীরা পরিবর্ত্তনপন্থী। দেশবন্ধু সমর্থ হলেন না তাঁর প্রস্তাব পাশ করাতে। গড়ে তুললেন তিনি কাউন্সিল পার্টি এবং পরে পরে স্বরাজ্যদল। দেশবন্ধু কংগ্রেস সভাপতি ছেড়ে সভাপতিত্ব হলেন এদলের আর সম্পাদক হলেন মতিলাল নেহেরু ; সুভাষচন্দ্র যে দেশবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ দলে এলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

স্বরাজ্যদল তো গড়া হ'ল, তার প্রচার চাই, জনসমর্থন চাই, সাংবিধানিক দৃঢ়তা চাই—এসব কববে কে ? সব ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র, বের হতে সুরু করল দুটো পত্রিকা ফরওয়ার্ড ইংরাজীতে ; সুভাষচন্দ্র এটির সম্পাদক হলেন না বটে, কিন্তু প্রচার, পরিচালনা, প্রকাশনা, সব কিছুর ভার পড়ল তাঁর উপরে। আর একটি যে কাগজ ছিল বাংলায়—বাংলার কথা—সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত থেকে সেটিও যোগ্যতার সঙ্গে দেখাশোনা করতে থাকলেন তিনি। ১৯২৩-এ কাউন্সিল নির্বাচনে নেতৃত্ব দিলেন সুভাষচন্দ্র, অভাবনীয় সাফল্যও লাভ করল স্বরাজ্যদল, এ ছাড়াও ওই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে সে দায়িত্বভারও তিনি বহন করলেন সাফল্যসহই। সার্থক যুবনেতা সুভাষচন্দ্র সব্যসাচীর দক্ষতা ও তৎপরতায় সম্পাদন করতে থাকেন সর্বপ্রকার কর্মানুষ্ঠান।

স্বরাজ্যদল সম্পর্কে অবশ্য উল্লেখ্য এই ঘটনা যে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে স্বরাজ্যদলের আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার প্রস্তাব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল আর ঐ বৎসরই নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দলটি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করলে সম্পাদিত হ'ল গান্ধী-দাশ চুক্তি আর তার ফলস্বরূপ ১৯২৪ সাল থেকে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হল স্বরাজ্যদলকে ; অন্যভাবে বলতে গেলে আপন সর্ত্ত অপরিবর্ত্তিত রেখেই স্বরাজ্যদল অন্তর্ভুক্ত হ'ল কংগ্রেসের। এরপর ঠিক হল স্বরাজ্যদলের উপর দায়িত্ব থাকবে

রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করবার ভার, আর গান্ধীজি থাকবেন খাদি আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়ে। স্বরাজ্যদল অবশ্য ব্যর্থ হল কার্য্যকরী কিছু করতে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কোনো আইন পাশ হলেও একা গভর্ন'র তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে নাকচ করে দেন সেসব—নাকচ করে দেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে, আর এরপর ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু তিরোহিত হলে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেল স্বরাজ্য দলটিই।

কাজ, কাজ আর কাজ। আবারও এক অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কাজের গুরুভার বর্তায় তাঁর উপরে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৯২৩ সালে পাশ হয়েছে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট আর ১৯২৪ সালে স্বরাজ্যদল কোলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে লাভ করল অভূতপূর্ব সাফল্য। দেশবন্ধু হলেন কোলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র, ডেপুটি মেয়র হলেন মিঃ সুরাবর্দী আর সুভাষচন্দ্রকে নিযুক্ত করা হ'ল মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক। সেটা ১৯২৪ সালের ১৪ই এপ্রিল। সব কাজের ভার এখন সুভাষচন্দ্রের উপরে, বয়স তখন তাঁর কতো আর, সবে মাত্র সাতাশ।

সুভাষচন্দ্র যে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেলেন—তা কিন্তু করা গেল না খুব স্বচ্ছন্দে। বাধা এল দুদিক থেকে—এক ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে আর এক কংগ্রেসের একাংশের তরফ থেকে। চাকরিটিতে নিয়োগ ছিল ইংরেজ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ—প্রথম প্রথম সরকার রাজী হ'ল সুভাষচন্দ্রের ঐ পদে নিয়োগ অনুমোদন করতে। তাতেই জিদ্ চাপল দেশবন্ধুর। সুভাষচন্দ্রও প্রথম প্রথম রাজী ছিলেন না এ পদ গ্রহণ করতে। দেশবন্ধুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে এমনকি কেঁদেও ফেলেন তিনি ; শেষপর্য্যন্ত আর অনুরোধ নয়—দেশবন্ধু আদেশই করলেন তাঁকে এ পদ গ্রহণ করতে। সুভাষচন্দ্র যোগ দিলেন ঐ পদে ; দ্বিতীয় আপত্তি এল কংগ্রেসীদের একাংশ থেকে—তাঁরা চান দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নিয়োগ ওই পদে। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার তিনি—মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা অভিধায় আখ্যাত তিনি তখন। ওখানে ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন সফলভাবে পরিচালনা করে, অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে তিনিও ছেড়েছেন ব্যারিস্টারী। তাঁর দাবী কম কিসে। অনেকে যে অভিযোগ করেন কায়স্থ চিত্তরঞ্জনের কায়স্থপ্রীতি সুভাষচন্দ্রের নিয়োগের কারণ সে কথা হয়তো ঠিক নয়, আসলে বৃটিশ বিরোধিতাই ছিল এই নিয়োগের কারণ। সুভাষচন্দ্র ছাড়া অন্য কাউকে নিয়োগে করালে তা হ'ত বৃটিশ ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ। এই যে এসময়ে কংগ্রেসের একাংশের বিরাগ ভাজন হলেন দেশবন্ধু তথা সুভাষচন্দ্র—আরও কিছু কারণ আছে তার পক্ষে, প্রথম কারণ হ'ল কোলকাতা কর্পোরেশনে মুসলমানদের অধিকসংখ্যায় নিয়োগ। তেত্রিশজন নোতুন নিয়োগের মধ্যে পঁচিশ জনই হলেন মুসলমান। ১৯২৩-এ গৃহীত বেঙ্গল প্যাক্ট অনুসারে মুসলমানদের যা প্রাপ্য হয় এ সংখ্যা ছিল

তার থেকেও বেশী। তার চেয়ে বড়ো কথা ১৯২৩ সালের বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত এই প্যাক্ট অনুমোদিত হয়নি ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে কোকনদে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনে। আরও একটা সামান্ত হলেও বিশেষ কারণ ছিল এই অসন্তুষ্টির। নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি—এসব ব্যাপারে স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি চাইলেন স্বদেশী কর্তাদের কাছে অন্যায় সুযোগ নিতে—স্বাভাবিকভাবেই চিত্তরঞ্জন প্রমুখ কর্তৃপক্ষের দ্বারা সেসব অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

কোলকাতা কর্পোরেশনের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিকের পদে বৃত হয়ে সুভাষচন্দ্র ছেড়ে দিলেন 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদনার ভার, আর যথেষ্টই কমিয়ে ফেললেন রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ। যখন যা করেন সুভাষচন্দ্র, তা করতে চান যথেষ্ট নিষ্ঠা সহকারেই, তাই এই বৃহত্তর পটভূমিকায় অধিকতর দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। নিজে খদ্দর পরেন, বিলাতী বর্জন মান্য করে অন্যদের-কেও উৎসাহিত করেন খদ্দর পরতে। শেষ পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের সকল কর্মচারীদের সরকারী পোষাকই করা হ'ল খদ্দর। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট ও বস্তি উন্নয়ন সমস্ত কিছুই সুপরিকল্পিতভাবে করতে থাকেন তিনি। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিলেন উনি। এমনই কাজ-পাগল তিনি ছিলেন ঐ সময়ে যে, এক-একদিন সকালবেলা বেরিয়ে গেলেও কাজ সেরে বাড়ী ফিরতে রাত্রি হয়ে যেত তাঁর। ঐহিক জীবনের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী হয়ে পড়লেন এ সময়েও।

কাজের জন্য মাস মাইনে ছিল তাঁর তিন হাজার টাকা। সুভাষচন্দ্র নিতেন মাত্র দেড় হাজার টাকা ; তাও এ টাকার অধিকাংশই ব্যয় করতেন তিনি জনসেবায়—বিশেষতঃ ছাত্রদেরকে আর দুঃস্থদেরকে সাহায্য করতে। আমূল বদলে দিলেন তিনি কোলকাতার চেহারা আপন কর্ম্ম-কুশলতায়; দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন এর ফলে—কিন্তু হলে কি হয় মাত্র ছয় মাসের মতো কাজ করতে পারলেন তিনি এই পদে। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর আবার গ্রেপ্তার হতে হ'ল সুভাষচন্দ্রকে।

এবার গ্রেপ্তার হওয়ার আপাত কারণ সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন উনি ; অতএব নাই বা থাকল কোনও প্রমাণ, সন্ত্রাসবাদী সুভাষচন্দ্রও। চার্লস্ টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ১২ই জানুয়ারী ১৯২৪ আর্নেষ্ট ডে-কে হত্যা করেছে গোপীনাথ সাহা। প্রায় বিনা বিচারে ফাঁসি হ'ল তাঁর ১লা মার্চ ১৯২৪-এ। এই ফাঁসির প্রতিবাদে এখানে-ওখানে সভাসমিতি করে বেড়াচ্ছেন সুভাষচন্দ্র। ওঁকে আর বাইরে রাখা নিরাপদ নয় মোটেও। তাছাড়া উনি তো কম্যুনিস্ট একজন, নামেই মাত্র কংগ্রেস। রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাঁর। ইংরেজ সরকারের এ অনুমান অবশ্য একেবারে ভিত্তিহীন নয়, পরে ১৯২৬ সালে বি. টি. রণদিভে প্রমুখ কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন রাশিয়াতে কমিনটার্ণের সভায় যোগদানের জন্যে। শুধু কি তাই, দূর প্রাচ্যের পথে বেআইনি অস্ত্র আমদানী করার

ষড়যন্ত্রের অভিযোগও আরোপ করা হ'ল তাঁর উপরে—এমনও অভিযোগ করা হ'ল, তিনি নাকি এ সব কাজে নির্বিচারে ব্যয় করে চলেছেন কর্পোরেশনের টাকাকড়ি। এমন একটা উচ্চপদে থেকেও গ্রেপ্তার এড়াতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রকে এবার আটক করা হ'ল তিন আইনে অর্থাৎ বহু পুরাতন ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে। এ আইন অনুসারে যে কাউকে, যে কোনও সন্দেহে আটকে রাখা যায় যতদিন খুশী। ১৯১৯ সালের রাউলাট অ্যাক্টেও অবশ্য ছিল প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা। সুভাষচন্দ্রের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা খর্ব্ব করা—এ কারণে তাঁকে আটক করা দরকার—এই যুক্তিতে ইন্ধন জোগাল ঐ সময়কার আরও একটি ঘটনা। ভোরবেলায় রাস্তা ধোওয়ার সময়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল কর্পোরেশনের এক সাফাই কর্মী। সুভাষচন্দ্র তদন্ত চান তার। কিন্তু ঐ পাড়া যেহেতু ইংরেজ অধ্যুষিত, ইংরাজ সরকার আশংকা করল এই তদন্তে ধরা পড়তে পারে কোনো ইংরেজ—তাই আদৌ কর্ণপাত করল না ইংরাজ সরকার সুভাষচন্দ্রের এই আবেদনে। উল্টে ইংরেজ সংবাদপত্র এই ঘটনাকে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্র বলে চালাতে চায়।

আটক করে সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে রাখা হ'ল আলিপুর নিউ সেণ্ট্রাল জেলে। ওখান থেকেই সুভাষচন্দ্র দেখাশোনা করতে লাগলেন কোলকাতা কর্পোরেশনের কাজ মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক হিসাবে। সহ্য হ'ল না ইংরাজ সরকারের; তাই ওখান থেকে ওনাকে স্থানান্তরিত করা হ'ল বহরমপুর সেণ্ট্রাল জেলে, এবং অবশেষে তাঁকে আদৌ ভারতে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে ২৫শে জানুয়ারী ১৯২৫ সালের এক নির্দ্দেশ বলে তৎকালীন এ্যাসিস্টেণ্ট ইন্‌সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিস মিঃ লোম্যানের তত্ত্বাবধানে পাঠানোর ব্যবস্থা হল সুদূর মান্দালয় জেলে। কোলকাতায় কারাবাস কালে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র—এটিও তাঁর ভারত থেকে নির্বাসিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন যে সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশ তখন ছিলেন না কোলকাতায়। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের সংবাদে তাড়াতাড়ি কোলকাতায় ফিরলেন তিনি। কোলকাতায় ফিরে ২৯শে অক্টোবর ১৯২৪ সালে কোলকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় আবেগ-তাড়িত উষ্মায় যে ভাষণ রেখেছিলেন তিনি, তা ছিল তাঁর ইতিপূর্বে আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্তদের পক্ষে সওয়ালের মতোই ঐতিহাসিক। "If love of country is a crime, I am a criminal"—দেশপ্রীতি যদি অপরাধ হয়, তবে অপরাধী আমিও। আর শুধু কর্পোরেশনের কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক কেন, মেয়রও তো সমান অপরাধী। একই অভিযোগে আমি নিজেকেও দোষী স্বীকার করছি আর তা যদি অপরাধই হয় তবে প্রতিটি ভারতীয়েরই যা উচিত বলে আমি মনে করি, সেই কর্ত্তব্য অস্বীকার করার চেয়ে বরং ফাঁসি যেতেও আমি প্রস্তুত।

দেশবন্ধু এ সময় প্রাণপাত চেষ্টা করলেন সুভাষচন্দ্রকে মুক্ত করতে; সভা সমিতি করতে ছুটে বেড়ালেন সারা ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত—কিন্তু কার্য্যকরী

করতে পারলেন না কিছুই ; মাঝখান থেকে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ডাক্তারের পরামর্শক্রমে দার্জিলিং-এ বিশ্রাম নিতে গিয়ে প্রয়াত হলেন ১৯২৫-এর ১৬ই জুন। দেশবন্ধু প্রয়াত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই ক্রমবিলুপ্ত হয়ে গেল ১৯২৩-এর ১লা জানুয়ারীতে গড়া তাঁর স্বরাজ্য দল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আপাততঃ ইংরেজ সরকার ; গান্ধীজি যাই বলুন আর যাই করুন তা আপত্তিকর হলেও ততখানি ক্ষতিকর হয়নি ইংরেজদের পক্ষে—কিন্তু একি সুরু করেছিল এই স্বরাজ্য দল। যাক্ গে, তার নেতা এখন প্রয়াত, আর একনিষ্ঠ কর্মী এখন নির্বাসিত ! সেই সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সের সুভাষ তখনই ইংরেজ সরকারের কাছে এক আতঙ্ক বিশেষ !

দেশবন্ধুর এই আকস্মিক মৃত্যু আর সে সময়ে সুভাষচন্দ্রের এই নির্বাসন দারুণভাবে দুর্বল করে দিল বাংলায় কংগ্রেসকে। কংগ্রেসের ভার বর্ত্তাল নরমপন্থী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপর আর এই সময়ে কংগ্রেসের অবস্থা এমনই বেহাল হয়ে পড়েছিল যে পরবর্ত্তীকালীন মেয়র নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রকে হারতে হয়েছিল এক অখ্যাত নরমপন্থী শ্রীবিজয় বসুর কাছে।

সুদূর মান্দালয়েও কারাভ্যন্তরে সমান বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র। দুর্গাপূজা নিয়ে যে বিশেষ দুর্বলতা আছে সুভাষচন্দ্রের—যে পূজাকে পূজামাত্র নয়, ধর্মীয় জাতীয় উৎসব মনে করেন তিনি—সেই পূজাকে করতে দিতে হবে ঐ মান্দালয় জেলে ; কারাবাসের প্রথম বৎসর ১৯২৫ সালের পূজার প্রাকালে এমন দাবী তুললেন তিনি। শুধু তাই নয় এ পূজার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে জেল কর্ত্তৃপক্ষকে। খৃষ্টান জেলবন্দীদের ধর্মানুষ্ঠানের জন্য যদি অর্থবরাদ্দ থাকে তবে তাঁরা বঞ্চিত হবেন কেন এ সুযোগ থেকে। ওখানকার তৎকালীন জেল সুপার মেজর ফিণ্ড্‌লে অনুমতি দিলেন এ পূজা করতে। মেজর ফিণ্ড্‌লে এই অনুমতি দানের কারণে ভৎর্সিত হলেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে —এবং স্বাভাবিকভাবেই পূজার ব্যয়নির্বাহের জন্যে কোনো অর্থসহায়তাই পেলেন না জেল বন্দীরা। লিখিত আবেদন জানালেন তাঁরা উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের কাছে—তাতে স্বাক্ষর করলেন জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ প্রমুখ ওখানে নির্বাসিত বিশিষ্ট বিপ্লবীরা। টনক নড়ে না তবু সরকারের, অবশেষে সুরু হ'ল দীর্ঘ অনশন। পুরো একপক্ষকাল সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অনশন চলার পর নরম হ'ল ইংরেজ সরকার। সম্মানজনক সমাধান করতে বাধ্য হ'ল ওখানকার সরকার।

জয়ের গর্বে উৎফুল্ল বোধ করেন জেলবন্দীরা ; কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে বিনা বিচারে আটকে আছেন ওখানে এতদিন, তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছে কোথায় ? সুসভ্য ইংরেজ সরকার কোনো উৎসাহই দেখায় না এ ব্যাপারে। ১৯২৬-এর শেষের দিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক নির্বাচনে এক উদারপন্থী নেতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করলেন তিনি। সুভাষচন্দ্র অবশ্য আশা করেছিলেন বিনা

প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই নির্বাচিত হবেন তিনি—সে যাই হোক, এই নির্বাচনও তাঁর মুক্তির ব্যাপারে সহায়তা করতে পারল না কিছুই।

১৯২৬ সালের শীতকালে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন সুভাষচন্দ্র। ঐ সালেরই ডিসেম্বর মাসে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। সেখানে এক মেডিক্যাল বোর্ড পরীক্ষা করলেন তাঁকে। এই বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন সুভাষ-চন্দ্রের দাদা ডাঃ শ্রীসুনীল চন্দ্র বসুও। সুভাষচন্দ্রের মুক্তির স্বপক্ষে সুপারিশ করলেন তাঁরা। এ সময় তাঁর মুক্তি ঘটেও যেতে পারত হয়তো, কিন্তু তিনি এক জেল কর্তা মিঃ ফ্লাওয়ার উডের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়লেন নিয়মিত খবরের কাগজ-পড়তে পাওয়ার অধিকারের প্রশ্নে। এরপর সুভাষচন্দ্রকে স্থানান্তরিত করা হ'ল ইয়াসিন জেলে। ওখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ—একারণে তখন ওখানে আবার পেলেন জেলসুপার হিসাবে মেজর ফিগুলেকে। এবারও মিঃ ফিগুলে সদয় ব্যবহার করলেন সুভাষচন্দ্রের প্রতি—সহানুভূতি সূচক নোট দিলেন তিনি সুভাষচন্দ্রের কারা মুক্তির স্বপক্ষে।

শারীরিক কারণে ওদিকে যখন মুক্তির চেষ্টা চলছে সুভাষচন্দ্রের, আর এদিকে ভারতেও যখন তাঁর মুক্তির জন্য সচেষ্ট ভারতীয়েরা বৃটিশ পার্লামেন্টেও তখন স্যার পেথিক লরেন্স প্রমুখ সাংসদেরা প্রশ্ন তুলেছেন এই অন্যায় আটকের বিরুদ্ধে। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে এই প্রশ্নে বৃটিশ পার্লামেণ্ট হ'ল উত্তাল। ওদিকে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে ক্রমাগত; আশংকা করা হ'ল—হয়তো বা দুরারোগ্য ক্ষয় রোগেই আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। এপ্রিল ১৯২৭-এ উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়লেন উনি—তবুও মুক্তি ঘটল না তাঁর; সর্ত্ত দিল ইংরেজ সরকার সুইজারল্যাণ্ডে যেতে পারেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে, তবে যাতায়াতের খরচ তো বটেই, চিকিৎসার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে তাঁকে নিজেকে। আর এই যাত্রাপথে ভারতের মাটি স্পর্শ করা চলবে না তাঁর। সুভাষচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই রাজী হলেন না অবমাননা-কর এই মুক্তির সর্ত্তে। নিরুপায় সরকার তাঁর মুক্তির আদেশ স্বাক্ষর করল ১১ই মে ১৯২৭-এ।

তবুও মুক্তি পেলেন না সুভাষচন্দ্র। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ নানান টালবাহানা করতে থাকে যদি রদ করা যায় এই মুক্তির আদেশ। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য মুক্তই হলেন সুভাষচন্দ্র। ১৫ই মে জাহাজবাহিত হয়ে নীত হলেন তিনি ভাগীরথীর নদীমুখে বাংলার গভর্ণরের নিজস্ব লঞ্চে—ওখানে এক মেডিক্যাল বোর্ড পরীক্ষা করলেন তাঁকে। এ বোর্ডে ছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার ছাড়াও দু'জন ইংরেজ ডাক্তার যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গভর্ণরের নিজস্ব চিকিৎসক। তাঁরা মুক্ত করতে বললেন সুভাষচন্দ্রকে, আর সুভাষচন্দ্র মুক্ত হলেন পরদিনই—১৬ই মে ১৯২৭।

প্রথম কারাবাস সময়ে সুভাষচন্দ্র প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন স্বদেশে আলিপুর জেলে পিতৃপ্রতিম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের; এই দ্বিতীয় কারাবাসে প্রবাসে মান্দালয়

জেলে পরোক্ষ সান্নিধ্য যেন পেলেন তিনি আর এক রাজনৈতিক পিতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্ব —বালগঙ্গাধর তিলকের। তিলক এখানে ভোগ করে গিয়েছেন প্রায় ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, ১৯০৮ সালে তাঁর কেশরী পত্রিকায় ক্ষুদিরামের প্রশংসা করে প্রবন্ধ লেখার জন্যে। আজীবন বিপ্লবের সাধনা করেছেন তিনি—অথচ এই মান্দালয় জেলে বসেই তো রচনা করলেন অপূর্ব গীতাভাষ্য। ধূলোয় ভর্ত্তি, নোংরা পরিবেশ মান্দালয় জেলের ; তবুও স্থানটিকে এক পরম তীর্থক্ষেত্রের মতোই মনে হয় তাঁর। একটা মহৎ কাজ সেরে ফেললেন সুভাষচন্দ্র ঐ মান্দালয় জেলে থাকাকালীন—ওখানে বাহাদুর শা' জাফরের সমাধিস্থলে গিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে নোতুন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করলেন তিনি। এই বাহাদুর শা' জাফরকে কেন্দ্র করেই তো বিদ্রোহী সিপাহীরা স্বপ্ন দেখেছিলেন এক সময়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের।

কারাবাস অনেক মহৎ সাহিত্যসৃষ্টিরই কারণ হয়েছে—এ কথা বিশ্বের বিভিন্ন মনীষী সম্বন্ধে যেমন, ভারতের ক্ষেত্রেও তেমনই সত্যি। সুভাষচন্দ্র এই কারাবাস-কালে লিখে ফেললেন এক ছোট্ট কিন্তু অমূল্য গ্রন্থ—তরুণের স্বপ্ন। তরুণ সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নসাধ্য ভারতের ছবি পরম আন্তরিকতায় অঙ্কিত করেছেন তাতে। সুভাষচন্দ্র অবশ্য যত না লিখতেন, পড়তেন তার থেকে অনেক বেশী—আর যাও বা লিখতেন তার মধ্যে চিঠিপত্রের সংখ্যাই সমধিক। যে সব চিঠি লিখেছেন এ সময়ে তা থেকে তাঁর ভারতপ্রীতির ছবি যেমন ফুটে ওঠে, তেমনই মানবপ্রীতির ছবিও বড়ো স্পষ্ট পরিস্ফুট। দেশবন্ধু তিরোহিত হওয়ার সময়ে যে চিঠি লিখলেন তিনি মেজদা শরৎচন্দ্রকে, সেই চিঠিটি তো এক অমূল্য দলিল এ প্রসঙ্গে। আটবারের জেল খাটা দাগী কয়েদী মাথুর শেষ ছাড়া পেয়ে আশ্রয় নিয়েছে দেশবন্ধুর কাছে—সুভাষচন্দ্রের আশংকা হয়তো বা দেশবন্ধু-জামাতা শ্রীসুধীর রায় আর আশ্রয় দেবেন না তাঁকে। তাই দাদাকে লিখলেন তিনি—তাঁর ফেরা পর্য্যন্ত যেন কোনও অসুবিধা না হয় মাথুরের—প্রয়োজন হলে তিনিই যেন দায়ভার নেন তাঁর। অনেক ছাত্র দেশবন্ধুর সহায়তার উপর নির্ভরশীল—মেজদাকে তো বটেই, বন্ধুবান্ধবদেরকেও চিঠি লিখছেন যেন দেশবন্ধুর প্রয়াণ-কারণে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় তাঁরা!

এই কারাবাস শেষে সুভাষচন্দ্র ফিরলেন যখন ভারতবর্ষে যুবজনতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য দেশনেতা আখ্যায় ভূষিত হলেন তিনি। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার আমদানী হয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষে ততদিনে, প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিরও। সুভাষচন্দ্র যেন সেই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী যুবজনতার আশা ভরসাস্থল একজন। এ কারণে এবং এই সময় থেকেই যোগ্য একজন সহযোগী তিনি পেয়ে গেলেন অগ্রজপ্রতিম জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে। আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনায়, পুষ্ট হয়ে জওহরলাল তখনই ভারতের রাজনৈতিক আকাশে উদীয়মান এক উজ্জ্বল তারকা!

যুবনেতা শব্দবন্ধটি বর্তমানে বহুশ্রুত। ভারতবর্ষের বুকে সুভাষচন্দ্রই প্রথম সার্থক

যুবনেতা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইতিপূর্বে অনেক যুবকই এগিয়ে এসেছেন—প্রাণদানও করেছেন তাঁরা, কিন্তু উপযুক্ত নেতার ভূমিকায় অধিষ্ঠান তাঁদের ক্বচিৎদৃষ্ট। নেতার প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনও যুবকের উজ্জ্বল আবির্ভাব প্রথম সুভাষচন্দ্রের। সুভাষচন্দ্রের এ ভূমিকার সূচনা অবশ্য তাঁর ইংল্যাণ্ড থেকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার পর থেকেই। ঐ সময় কোলকাতায় মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে যে যুব সম্মেলন হয়েছিল তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে যে অপূর্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও উদ্দীপক ভাষণ রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং যা পরে 'তরুণের আহ্বান' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সুভাষ-রচনাবলীতে তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। প্রবাসের কারাবাস সেরে ভারতবর্ষে ফিরে যুবক নেতা সুভাষচন্দ্র উন্নীত হলেন স্বীকৃত যুবনেতায়।

কারামুক্তির পর এখন আর অসুস্থতা বোধ করেন না সুভাষচন্দ্র। এমনই হয়েছে বারবার। কারারুদ্ধ হলেই বড়ো অসুস্থ বোধ করেন তিনি—অথচ মুক্তি পেলেই প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ—ঝাঁপিয়ে পড়েন কাজে। মান্দালয় থেকে ফিরে শিলং-এ গেলেন বিশ্রাম নিতে, তারপর শুরু হল সুভাষচন্দ্রের নিরলস কর্মযজ্ঞ, ওখানে অল্প বিশ্রামের পর থেকেই।

১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীতে সাইমন কমিশন আসছে ভারতে গালভরা প্রতিশ্রুতি নিয়ে; ভারতীয়রা মেনে নেবেন না এই কমিশন। থাকুক এতে যতো হাজারো উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি, ভারতীয়দের দাবী ভারতীয় সদস্য রাখতে হবে ওতে—তা যখন নেই—অতএব গো ব্যাক্ সাইমন—সাইমন, ফিরে যাও। সুভাষচন্দ্র সারা ভারতে প্রচার করে বেড়াতে থাকেন এই প্রতিবাদের কথা। সারাভারতে তখনই তিনি অন্যতম জনপ্রিয় নেতা একজন—সারা ভারত বিচরণক্ষেত্র তাঁর তখন থেকেই।

ইংরেজরা যে অকথ্য অত্যাচার করল এ সময়ে তাতে গুরুতর আহত হয়ে অল্পদিন পরে মৃত্যুবরণ করতে হ'ল লালা লাজপত রায়কে—গোবিন্দবল্লভ পন্থকে হয়ে যেতে হ'ল সারা জীবনের মত পঙ্গু। এ সময় ভারতসচিব বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জ যে, ভারতীয়রা তাদের নিজস্ব একটা সংবিধান রচনা করতে পারবে না—এর মোকাবিলা করে মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে যে Nehru Report Nehru Constitution নেহেরু রিপোর্ট বা নেহেরু সংবিধান তৈরী হল। তারও সদস্য হিসাবে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় রাখলেন সুভাষচন্দ্র।

১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশন বসল কোলকাতায়—পার্ক সার্কাসে; সভাপতি মতিলাল নেহেরু। দেশবন্ধুর সমমত পোষকতার কারণে সুভাষচন্দ্রের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন উনি। সে কারণেও বটে, আবার আপন শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্বগুণ ও বাঙালীসুলভ মর্য্যাদাবোধের কারণেও বটে, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (GOC) রূপে প্রায় সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় অভ্যর্থনা জানালেন কংগ্রেস সভাপতি-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকেও দারুণ আড়ম্বড়পূর্ণতা সহকারে শোভাযাত্রায় সামিল

করা হল মহিলাদেরও যা তৎকালে অভাবনীয়। এমন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সুভাষচন্দ্র সহ সমগ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জমকালো আধা সামরিক পোষাক, গার্ড অফ অনার ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, মুগ্ধ করল সবাইকে। এতসব বাহুল্য কিন্তু সহজভাবে নিতে পারলেন না গান্ধীজি, গোটা ব্যাপারটাকেই পার্ক সার্কাসের সার্কাস বলে ব্যঙ্গ করলেন তিনি। সরল, সাদাসিধে, ভারতীয় আচরণের প্রতিফলন তিনি দেখতে চান কংগ্রেসেরও সর্বত্র— তারমধ্যে এসব একধরনের অনাচার বোধ হয় তাঁর কাছে।

এই আড়ম্বরপূর্ণতা তো বহিরঙ্গের দিক, অন্য একটা ব্যাপারও এ সময় থেকেই সুভাষচন্দ্রকে করে তুলল রাজনীতিগতভাবেই গান্ধী-বিরোধী। এ অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব রাখলেন পূর্ণ স্বাধীনতার। প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিকের এক সুশৃঙ্খল মিছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে এসে সামিল হলেন এ দাবীতে। জওহরলালও সমর্থন করলেন এ প্রস্তাবকে, কিন্তু গান্ধীজি অনড় থাকলেন তাঁর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দাবীর প্রস্তাবে এবং তীব্র বিরোধিতা করলেন সুভাষচন্দ্রের। স্বাভাবিকভাবেই সুভাষচন্দ্র ব্যর্থ হলেন আপন প্রস্তাব পাশ করাতে, আর সে সময় থেকেই সেই যে গান্ধীজির কংগ্রেসে একাধিপত্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে শুরু করলেন সুভাষচন্দ্র, তা প্রায় সম্পূর্ণতঃই অব্যাহত থাকল চিরকাল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য জওহরলাল নেহেরু কি রাজনৈতিক মতাদর্শে, কি অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনায় সে সময় সুভাষ-সমর্থকই, গান্ধী-বিরোধী না হলেও গান্ধীপন্থী নন পুরোপুরি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে দৃঢ়তায় আঁকড়ে ছিলেন আপন নীতি ও বক্তব্য, দোদুল্যমান জওহরলাল কখনো থাকতে পারেননি তেমনটি ; বরং তাঁর নিজেরই ভাষায় গান্ধীজির সম্মোহনী যাদুকরীতে শেষ পর্য্যন্ত সম্মোহিতই হয়েছিলেন তিনি এবং নানান ঐতিহাসিক কারণে তিনি যে কট্টর সুভাষ-বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন এবং পরে পরে গান্ধীপন্থা পরিহারকারীও—সে তো ঘটনাই।

কোলকাতা কংগ্রেসে আপন মতামতকে কার্য্যকরী করতে না পারার এই ব্যর্থতায় আদৌ পশ্চাদপসরণ করলেন না সুভাষচন্দ্র। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহায়তায় গড়ে তুললেন—"নিখিল ভারত স্বাধীনতা লীগ।" অবশেষে জওহরলাল যখন কংগ্রেসের সভাপতি হলেন ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে, পাশ হল তাঁর ঐ পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী-প্রস্তাব। এই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ইতিপূর্বে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে—লাহোর কংগ্রেসে তা স্বীকৃত হ'ল। গান্ধীজি এটির সম্পর্কে বললেন—তাড়াহুড়ো করে রচনা করা ও পরিণতির কথা না ভেবেই গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময় থেকেই কংগ্রেসে বামপন্থীর প্রসারতার শুরু।

এ দাবী পাশ হওয়াতেই থেমে থাকলেন না তিনি—ওই সময়েই সোচ্চার হলেন তিনি ভারতে এক সমান্তরাল সরকার গঠন করার ব্যাপারে। ১৯১৬ সালে মাদ্রাজের আদিয়ারে অ্যানি বেসান্ত—এবং ঐ বৎসরই বোম্বাইতে বালগঙ্গাধর তিলক এই দাবীতেই তো গড়ে তুলেছিলেন হোমরুল আন্দোলন! আয়ার্ল্যাণ্ডে ডি. ভ্যালেরা যদি পারেন তো ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয় কেন? ১৯২৮ সালে

কোলকাতা কংগ্রেসে এ কথা তুললেও এমন সোচ্চার ছিলেন না তিনি তখন ; যাই হোক, জওহরলালের নেতৃত্বের পরেও কংগ্রেস তখনই এতটা বিপ্লবী হতে পারেনি যে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পাশ করলেও পাশ করবে ভারতে সমান্তরাল সরকার গঠন করবার মতো এমন একটি বিপ্লবাত্মক প্রস্তাব।

সমান্তরাল সরকার গঠন করার প্রস্তাব না হয় পাশ হয়নি, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তো পাশ হয়েছে, কিন্তু তা কার্য্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয় উদ্যোগ কোথায়? কিছু বৃটিশ বিরোধী প্রস্তাব পাশ করানোর মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ থাকবে কংগ্রেসের কাজ! কংগ্রেসের সেই যে পুরানো "তিন দিনের তামাসা"-র চরিত্র তার থেকে বর্তমান কংগ্রেস এগিয়েছে আর কতটুক? সুভাষচন্দ্র অধৈর্য্যবোধ করেন—তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় সংক্রামিত হচ্ছেন কোথায় অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ! আয়ার্ল্যাণ্ডে সিন্‌ফিন্ আন্দোলনে জেরবার হয়ে সেখানে বৃটিশ সরকার কি বাধ্য হয়নি স্বাধীনতা দান করতে ১৯২১ সালে! সেখানে তো এই সময় প্রাক্ স্বাধীনতা পর্য্যায়ে গড়ে তোলা হয়েছিল সমান্তরাল সরকার। ছোট্ট একটা দেশ আয়ার্ল্যাণ্ডে যা সম্ভব তা কেন সম্ভব হবে না এই ভারতবর্ষে। এখানকার শ্রমিক, কৃষক, যুবক, ছাত্র—সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে সংহত করতে এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পূরণ করতে যে নির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী দাবী করছেন সুভাষচন্দ্র, তা গ্রহণ করার উদ্যোগ কোথায় এখানে। অরণ্যে-রোদনে পরিণত হয় সুভাষচন্দ্রের সমস্ত আবেদন নিবেদন, মাঝখান থেকে কয়েকজন সহকর্মী সহ সুভাষচন্দ্রকে বাদ পড়তে হ'ল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে।

এদিকে আবার অহিংস আন্দোলন হয়ে উঠছে দুর্বার, এর সূচনা ঘটল "হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোশিয়েশনের" ৯ই আগস্ট ১৯২৫-এ কাকোরীর কাছে এক ট্রেন ডাকাতি করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। অসহযোগ আন্দোলনের আবেদনে যা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল সাময়িকভাবে, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়াতে এবং তারপরেও কংগ্রেসের এই নিস্পৃহতার কারণে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সেই তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। ১৯২৮ সালে চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর দত্ত, ভগৎ সিং, অজয় ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ পূর্বতন এবং বর্তমানে সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোশিয়েশনকে পুনর্গঠিত করে নূতন করে গড়ে তুলেছেন এক সন্ত্রাসবাদী দল—হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এসোশিয়েশন। পুলিস ইন্সপেক্টর মিঃ সাণ্ডার্স লাহোরে নিহত হলেন ১৭ই নভেম্বর ১৯২৮-এ ভগৎ সিং-এর রিভলবারের গুলিতে। দিল্লীর এ্যাসেমব্লি হাউসে ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল বোমা ছুঁড়লেন ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত। যতীন দাস প্রমুখ বিপ্লবীরা সমান সক্রিয় বাংলার বুকে। সাহারানপুর আর লাহোরে দুটি বোমা তৈরীর কারখানা ধরা পড়ল। ধৃত হলেন বহু বিপ্লবী—১৯২৯-এ শুরু হ'ল বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। সুভাষচন্দ্র ভাবেন এই বিপ্লবীবৃন্দ কোনো এক কেন্দ্রীয়ভাবে সুসংহত হয়ে সর্বভারতীয় বিস্তৃতিলাভ করতে না পারলে কার্য্যকরী হতে পারবেন কতটুকু!

নব পর্য্যায়ে এই যে আবার মাতৃমুক্তি মন্ত্রে নিবেদিত প্রাণ এতগুলি তাজা তরুণের ব্যর্থ অভ্যুত্থান আর আত্মদান—এর জন্য দায়ী পরোক্ষভাবে হলেও কংগ্রেসই তার নরমপন্থার কারণে। এঁদের নিখাদ দেশপ্রেমকে কোনো ভাবে কি কাজে লাগানো যায় না কার্য্যকরীভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে।

ইংরাজ সরকার অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর—প্রতিবাদে অনশন করে ৬৪ দিন পরে লাহোরে কারান্তরালেই ১৯২৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মারা গেলেন যতীন দাস। সরকার ফতোয়া দিলেন—তার শবানুগমনও বেআইনি—তাই তাতে অংশ গ্রহণ করে গ্রেপ্তার হলেন অনেকে। এ সময় গান্ধীজি নীরব থাকলেও সুভাষচন্দ্র এ মৃত্যুকে মহিমান্বিত করলেন দধীচির তপস্যাসিদ্ধ বলে, ঐ সময় ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র পালন করলেন—নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক বন্দী দিবস। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতে পালিত হবে 'স্বাধীনতা দিবস'। সবাই ঐদিন শপথ নেবেন স্বাধীনতার ; ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করল এই পুণ্যদিবস উদ্‌যাপনও। সুভাষচন্দ্র মানবেন কেন সে নিষেধাজ্ঞা—খোদ্ কোলকাতার বুকেই নেতৃত্ব দিলেন এ সম্পর্কিত প্রচার কার্য্যের। এ তো বড়ো দুঃসাহস সুভাষচন্দ্রের। আবারও গ্রেপ্তার হতে হল তাঁকে। বিচারের প্রহসনে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল তাঁর ; ১৯৩০-এর ২৩শে জানুয়ারী আপন জন্মদিনে আবারও কারাবাস শুরু হ'ল সুভাষচন্দ্রের।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হ'ল না সুভাষচন্দ্রের। সে তো হ'লই না, উল্টে ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন হওয়ার ফলে ২১শে এপ্রিল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কারাবন্দীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হ'ল, সুভাষচন্দ্রকেও ভোগ করতে হ'ল তা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াতেই ঐ কারাগারের অধ্যক্ষ এন. এস. সিম্পসনকে আপন অফিস ঘরেই প্রাণ দিতে হয়েছিল ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ,—সংঘটিত হ'ল বিখ্যাত অলিন্দ যুদ্ধ, যার পরিণামে প্রাণ দিতে হ'ল বিনয়-বাদল-দীনেশকে।

ইতিমধ্যে ১৯৩০ সালে সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হয়েছেন সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁর এই সর্বভারতীয় স্বীকৃতি, বিচারের প্রহসন, অন্যায় কারাবাস তাঁকে দ্রুত উন্নীত করল সারা ভারতে অবিসম্বাদী নেতৃত্বে। এবার যদিও সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ড হ'ল এক বৎসরের জন্য, তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত ভোগ করতে হয়নি কারাবাসের এই পূর্ণ মেয়াদ। ১৯৩০ সালের আগস্টে কারারুদ্ধ অবস্থায়ই কোলকাতার মেয়র নির্বাচিত হলেন তিনি, আর পরমাসেই অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ মুক্তি ঘটল তাঁর।

এমন সময় ঘটে গেল আবারও এক দুর্ঘটনা—কংগ্রেস বিভাজন, দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থীদের মধ্যে। বাংলায় দক্ষিণপন্থীদের নেতা নির্বাচিত হলেন যতীন্দ্রমোহন

সেনগুপ্ত আর সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ অবস্থাতেই নির্বাচিত হলেন বামপন্থীদের নেতা। দক্ষিণপন্থীরা গান্ধীপন্থী কংগ্রেস আর বামপন্থীরা কংগ্রেস-ই তবে গান্ধীপন্থার পরিপন্থী। ক্রমে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকেন সুভাষচন্দ্র—তাঁর আবেদন কি তবে খুবই বৈপ্লবিক বর্তমান কংগ্রেসের পরিস্থিতিতে? ডাক শুনে তার তেমন করে কেউ এগিয়ে আসছে কোথায়? অবশেষে একলা চলার পথ বেছে নিয়ে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ, আর গড়ে তুললেন—কংগ্রেস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাসের শুরু দেশবন্ধুর তিরোধানর পর থেকেই। বর্তমানে তা একেবারে তলানিতে ঠেকে অব্যাহতই আছে। দেশবন্ধুর প্রয়াণ সময়ে সুভাষচন্দ্র বারবার অনুরোধ করেছিলেন বাসন্তী দেবীকে এখানকার কংগ্রেসের হাল ধরতে। বাসন্তী দেবী রাজী না হওয়াতে খুবই ক্ষুন্ন হয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন বাংলার Big-five অর্থাৎ পঞ্চ প্রধান নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, শরৎচন্দ্র বসু ও বিধানচন্দ্র রায়—এঁদের মধ্যে এক তুলসী গোস্বামী ছাড়া সবাই ব্যস্ত যে যার কাজে। সুভাষচন্দ্রও এ সময় মান্দালয় জেলে। তখন কিছু করার ছিল না তাঁর—এখন কিছু কি করতে পারবেন তিনি?

গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস এ সময় আড়মোড়া ভাঙল আর একবার। সুভাষচন্দ্রের চাপ বরাবর তো ছিলই এখন আবার সাময়িক যুদ্ধ বিরতির পর দুর্বার হয়ে উঠছে সন্ত্রাসবাদীরা। শুরু করলেন গান্ধীজি তাঁর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিখ্যাত আন্দোলন—আইন অমান্য আন্দোলন। এ আন্দোলন সূচনা করলেন গান্ধীজি লবণ আইন অমান্য করার মাধ্যমে। তখন সবচেয়ে ঘৃণ্য ধিক্কারজনক আইন ছিল এই লবণ আইন—সমুদ্রের লোনা জল শুকিয়ে সাধারণতম মানুষও যে তৈরী করতে পারত তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য লবণ—তাও আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে ইংরেজ সরকার তাদের ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। শুরু হ'ল লবণ সত্যাগ্রহ—সুবিখ্যাত ডাণ্ডীযাত্রা; ১২ই মার্চ ১৯৩০-এ সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন অনুগামী-সহ যাত্রা শুরু করে ৫ই এপ্রিল প্রায় আড়াইশ' (২৪১) মাইল পথ অতিক্রম করে গান্ধীজি পৌঁছলেন ডাণ্ডীতে—সেখানে তাঁরা সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করবেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে। করলেনও তা পরদিন—৬ই এপ্রিল ১৯৩০-এ। সারা ভারত একই সঙ্গে হয়ে উঠলো উত্তাল!

সে সময়কার ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের চিত্র পরিস্ফুট করতে এ উল্লেখটুকুই বোধহয় যথেষ্ট হবে যে—ওদিকে গান্ধীজির দীর্ঘ পদযাত্রা যখন সবে শেষ তার কয়েক-দিন পরেই ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০-এ সংঘটিত হ'ল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—প্রতিষ্ঠিত হ'ল ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান গভর্ণমেণ্ট। ঐ বৎসরই ৮ই ডিসেম্বর কোলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ অভিযান চালিয়ে অলিন্দ যুদ্ধে শহীদ হলেন বিনয়-বাদল-দীনেশ—মেদিনীপুরে বার্ষিক উৎসবের মত করে নিহত করা হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে বেঙ্গল-

ভলানটিয়ার্সের হুঁসিয়ারী অগ্রাহ্য করে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করার কারণে—পেডি ডগলাস বার্জ; তারপর ঘটল জালালাবাদের যুদ্ধ এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৯৩৪ সালে মাস্টারদা সূর্য্য সেনের ফাঁসি। বাংলার বাইরেও সারা ভারতেই এমনই চিত্র তখন; ভারতের এক শ্রেণীর যুব সমাজ আস্থা রাখতে পারছেন না গান্ধীজির নেতৃত্বে। সুভাষচন্দ্র হলেন এই যুব সমাজেরই বিশ্বাসভাজন অবিসম্বাদী নেতা।

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় যখন সুভাষচন্দ্র তখন কারাভ্যন্তরে। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কত তরুণ, কিশোর, যুবকও যে কারারুদ্ধ হলেন! সুভাষচন্দ্রের মনে হয় সব মিলিয়ে এই আন্দোলনের ফলে যুবশক্তির একাংশের কি অনর্থক অপব্যয়ই না হচ্ছে! প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা চাই এদেরকে। সন্ত্রাসবাদীদের সংযত ও সংহত করে এবং এই আবেগতাড়িত যুবকবৃন্দকেও এক সর্বাত্মক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করে অগ্রসর হতে পারলে তবেই সফল করতে পারা যাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন।

আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহনের জন্য গ্রেপ্তার বরণ করে সুভাষচন্দ্রের সহবন্দী হতে নীত হলেন যাঁরা, সুভাষচন্দ্র চাইলেন—ঐ কারাপ্রাঙ্গণেই তাদের রাজনৈতিক শিক্ষাদান করবার ব্যবস্থা করবেন তিনি। স্বাভাবিক কারণেই রাজী হ'ল না ইংরেজ সরকার। সহবন্দীদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনাও নিষিদ্ধ। একি অবিচার ইংরেজ প্রভুর—অগত্যা সুভাষচন্দ্র শুরু করলেন আমরণ অনশন। ইংরেজ সরকার অনমনীয় থাকাতে এই অনশন ভাঙতে হস্তক্ষেপ করতে হ'ল সুভাষচন্দ্রের গুরু-মা বাসন্তীদেবী-কে। তাঁর সামনে যে অনেক কাজ, এ মৃত্যু যতই গৌরবের হোক, সামনের সেই অজস্র কার্য্যাবলী সম্পন্ন করবে কে?

১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের কোলকাতার মেয়র পদে নির্বাচিত হয়ে মুক্ত হওয়ার মাস দুই পরে ইংরেজ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানালেন সমাধানের সূত্র খুঁজতে এক গোলটেবিল বৈঠকে। সুভাষচন্দ্র দৃঢ়-নিশ্চয় কোন লাভ হবে না এ বৈঠকে যোগ দিয়ে; গান্ধীজি অথবা অন্য কোনও কংগ্রেস নেতা অবশ্য যোগ দিলেনও না এ বৈঠকে—যোগ দিলেন মাত্র শিখ ও মুসলিম প্রতিনিধিরা—পরবর্ত্তী দ্বিতীয় বৈঠকে অবশ্য যোগ দিলেন গান্ধীজি—এবং যথারীতি সুভাষচন্দ্রের পূর্বানুমানমত লাভ হ'ল না কিছুই; শূন্য হাতেই ফিরতে হ'ল তাঁকে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩১-এ। আবারও কিছু দিন পরে ডাকা হ'ল তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক—এবারও অবশ্য যথারীতি কংগ্রেস বর্জন করল এ বৈঠক।

বৃহত্তর গণ্ডগোলের আশংকায় বেআইনি ঘোষণা করা হ'ল কংগ্রেসকে। ওদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ধারণ করে তীব্রতর আকারে। সুভাষচন্দ্র নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারলেন না এ সময়ে—গঠন করে ফেললেন একটা অ্যাকশন কমিটি—গোপনে সংগঠিত করে চললেন সারা বাংলায় তীব্র আন্দোলন। ১৯৩১-এর সুরুতেই আবার কারারুদ্ধ হলেন সুভাষচন্দ্র, তাঁর অপরাধ-সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মালদা শহরে

প্রবেশ করেছেন তিনি। এ পর্যায়ে এক সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হ'ল তাঁকে। মুক্ত না হতে হতেই আবারও কারাদণ্ড—এ বার ছ'মাস সশ্রম। ইতিমধ্যে অবশ্য ৫ই মার্চ ১৯৩১-এ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ঐ চুক্তির অন্যতম সর্তানুসারে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে মুক্ত হলেন সুভাষচন্দ্রও।

এ সময় সুভাষচন্দ্র আবারও ক্ষুন্ন হলেন গান্ধীজির উপরে মুখ্যতঃ দুটো কারণে—এক, গান্ধী-আরউইন চুক্তি করে আইন অমান্য আন্দোলনের স্তিমিতিকরণ। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডীতে লবণ আইন অমান্য করে যে আন্দোলনের সূচনা করা হ'ল তা প্রায় প্রত্যাহারই করে নেওয়া হ'ল ৫ই মার্চ ১৯৩১-এ উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরে এই চুক্তির সর্তাবলী পরবর্তী গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলিংডন যথাযথ না মানার ফলে গান্ধীজিকে শুরু করতে হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে আবারও এই আন্দোলন, মুখ্য হাতিয়ার যার ছিল ট্যাক্স বন্ধ করা—এবং এ সমগ্র আন্দোলনটিই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত হয় মার্চ, ১৯৩৪-এ।

ক্ষুন্ন হওয়ার দ্বিতীয় কারণ ছিল—এই গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে হাজারো রাজবন্দী মুক্ত হলেও মুক্তি পেলেন না ভগৎ সিং রাজগুরু, শুকদেব প্রমুখ বিপ্লবীরা কারণ তাঁরা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ; চুক্তির মাস শেষ হওয়ার আগেই ফাঁসি হয়ে গেল তাঁদের। সুভাষচন্দ্রের ক্ষোভ—অনুরূপ ঘটনায় এই ইংরাজ সরকারই আয়ার্ল্যাণ্ডের সিনফিন নেতাদের প্রাণদণ্ডাদেশ বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এখানে তা না হওয়ার কারণ—নেতৃত্বের দুর্বলতা ছাড়া আর কি? মনে রাখা দরকার জওহরলাল নেহেরুও খোলা মনে সায় দিতে পারেননি এই গান্ধী আরউইন চুক্তিতে—তাঁর নিজের ভাষায় এক বাধ্য সৈনিকের মত তিনি এটা মেনে নিয়েছিলেন মাত্র। এমন বাধ্য সৈনিক কোনো দিনই হতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র—বরাবরের তিনি বিদ্রোহী সৈনিক।

ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের মুক্তির ব্যবস্থা না করে এবং আইন অমান্য আন্দোলন দুর্বল করে দিয়ে একি করলেন গান্ধীজি! স্বাধীনতা আন্দোলন কি তবে এমনি করেই দু'পা এগোতে-না-এগোতেই তিন পা পিছিয়ে গিয়ে এমনি করে পিছাতেই থাকবে? সরাসরি সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞেস করবেন গান্ধীজিকে—ঠিক্ কি চান তিনি! অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জিত হবে, সে তো হাস্যকর হয়ে গেছে কবেই, এর পর ১৯২৯-এ যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী-প্রস্তাব গৃহীত হ'ল—তাও কি তবে এমনি করেই অর্থহীন হয়ে যাবে!

১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেস চলছে যখন, সুভাষচন্দ্র তখন সভাপতিত্ব করেছেন ভগৎ সিং প্রতিষ্ঠিত নওজোয়ান ভারত সভার অধিবেশনে। এখানে তিনি কঠোর সমালোচনা করলেন কুখ্যাত দিল্লী চুক্তির, ব্যাখ্যা করলেন সবিস্তারে দেশে শ্রমিক, নারী ও অনুন্নত শ্রেণীরও ভূমিকা, স্বাধীন ভারতের সমাজবাদী রূপরেখাও আঁকলেন একটি, উষ্মাও প্রকাশ করলেন গান্ধীজি সম্পর্কে—তাঁকে দুর্বল ও ইংরেজদের মোকা-

বিদায় অসমর্থ বলে। হলে কি হয় গান্ধীজির প্রভাবে আচ্ছন্ন তখন সারা ভারতের প্রথম শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ—সুভাষচন্দ্র অসমর্থ হলেন এমনকি সমন্বয়তাবলম্বী জওহরলালেরও সমর্থন আদায় করতে।

সুভাষচন্দ্র হয়তো বা অস্থিরচিত্ত কখনো কখনো, কিন্তু জহরলাল তো অস্থিরচিত্ত সর্বক্ষণই। গান্ধীজির যাদুকরীতে সম্মোহিত তিনি, বাধ্যসৈনিক তিনি তাঁর—আপন মতে দৃঢ় থাকবার অবকাশ তাঁর কোথায়? আপন মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে লিপ্ত হয়ে তাঁর বিরাগভাজন হওয়ার চেয়ে নিরুত্তাপ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে গান্ধীজির হাত থেকে নেতৃত্বভার অর্জনই তো বরং নিরাপদ অনেক বেশী। ফেবিয়ান সোস্যালিজমে বিশ্বাসী নেহেরু, বামপন্থী হয়েও গান্ধী সমর্থক, সুভাষ-সমর্থক হয়েও আন্দোলন বিমুখ—এমনি করে প্রায় এক দশক "শো-বয়"-এর ভূমিকায় পরম দক্ষতায় ট্রাপিজের খেলা খেলতে খেলতে কাটিয়ে দিয়েছেন মোটামুটি ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত, আর ঐ সময়ে পুনর্বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়ে সেই যে মত আর পথ পরিবর্তন করলেন, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর তাঁর অন্ততঃ ঘনিষ্ঠ বনিবনা হয়নি কখনো।

কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে বিশেষ আমন্ত্রণে যোগ দিলেন সুভাষচন্দ্র। সেখানে গান্ধীজিকে দারুণভাবে আক্রান্ত হতে হ'ল গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট সম্পাদিত করবার জন্য। গান্ধীজি বেশ বুঝতে পারেন, শুধু সুভাষচন্দ্রই নয়, অন্যান্য নেতৃবৃন্দও বিশেষ বিরোধী তাঁর—কিন্তু তবুও অনড় থাকেন তিনি—প্রয়োজনবোধ করেন না বিরোধীদের বক্তব্যে বিশেষ কর্ণপাত করবার।

আবারও গ্রেপ্তার হতে হ'ল সুভাষচন্দ্রকে ১৯৩২-এর ২রা জানুয়ারী। কারণ, সেই কুখ্যাত তিন আইন—না দেখাতে হ'ল কোনো কারণ, না করতে হ'ল কোনও বিচারের প্রহসন। যেমন ঘটেছে ইতিপূর্বে—এবারও তেমনই কারারুদ্ধ হয়েই অসুস্থ-বোধ করলেন তিনি। প্রথমে রাখা হ'ল তাঁকে সিউনি জেলে—সেখান থেকে জব্বলপুর হয়ে পীড়া বৃদ্ধির কারণে নীত হলেন তিনি মাদ্রাজ-এর পেনিটেনস্যারীতে। এই মাদ্রাজে থাকাকালীন ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ল তাঁর ক্ষয়রোগ এবং গল-ব্লাডারের অসুস্থতাও। এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে সারাভারত আবারও উত্তাল হ'ল সুভাষচন্দ্রের মুক্তির জন্য। ওখান থেকে সুভাষচন্দ্রকে সরিয়ে নিয়ে ভাওয়ালি; পরে লখনউ হয়ে বোম্বাই বন্দর থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী এম. এস. গঙ্গা জাহাজে চড়িয়ে বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হ'ল তাঁকে। ভেনিস হয়ে ভিয়েনা পৌছলেন তিনি ৮ই মার্চ, ১৯৩৩-এ।

রোগমুক্তির আপাত উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে বাইরে পাঠানো হলেও তাঁর এ বিদেশ গমন নিঃসর্ত করা হ'ল না কিন্তু। পরিষ্কার বলে দেওয়া হ'ল জার্মানী আর যুক্তরাজ্যে যাওয়া চলবে না তাঁর। ইংল্যাণ্ড তিনি এ যাত্রায় যেতে পারেন নি ঠিকই, কিন্তু জার্মানী তিনি স্বচ্ছন্দে যেতে পেরেছিলেন একাধিকবার—অষ্ট্রিয়ায় অবস্থিত জার্মান

দূতাবাসের কর্তৃপক্ষের সহৃদয় সহায়তায়। ১৩ই মে ১৯৩৩-এ এ ব্যাপারে আপন পাশপোর্ট বৈধ করে নিতে সমর্থ হলেন তিনি।

ঠিক নির্বাসনও নয় আবার ঠিক স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিদেশ ভ্রমণও নয়—এ যাত্রায় বিদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হলেন তিনি। এখানে আবারও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হ'ল তাঁর সমমতাবলম্বী সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী বিঠ্‌লভাই প্যাটেলের সঙ্গে। চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা না হওয়ার কারণে ওখান থেকে গেলেন তিনি সুইজারল্যাণ্ডে। ওখানে কিছুটা সুস্থ হয়েই শুরু করলেন ইউরোপ পরিক্রমা,—গেলেন ইটালি, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, যুগোশ্লাভিয়া, আয়ার্ল্যাণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে। মেয়র তিনি, তাই বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করেন তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে নগর পরিকল্পনা।

এ সময়ই চরম উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন তিনি—প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) জের মিটতে না মিটতেই ধীরে ধীরে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে সমগ্র ইউরোপ, আর এই অশান্তির মূলে যে জার্মানীর আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক ভূমিকা তাও বেশ বুঝতে পারলেন তিনি। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী জার্মানীর চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে হিটলার যেন সুদে আসলে শোধ তুলতে উঠে পড়ে লেগেছেন জার্মানীর প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়োত্তর চরম অবমাননাকর ব্যবহার প্রাপ্তির।

ইউরোপ পরিক্রমা সেরে ভিয়েনাতে ফিরে বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতিতে—১৯৩৪ সালের মার্চে যে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়েছে আইন অমান্য আন্দোলন—তার তীব্র নিন্দা করে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। আবারও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেল একটা—সমমতাবলম্বী সহমর্মী, অল্পদিনের জন্য হলেও একই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহবাসী বিঠলভাই প্যাটেলের সাহচর্য্য বেশীদিন পেলেন না তিনি; ওখানকার স্বাস্থ্য নিবাসেই মৃত্যু ঘটল বিঠলভাই প্যাটেলের। সুভাষচন্দ্র অসুস্থতা স্বত্ত্বেও স্বহস্তে ব্যবস্থা করলেন তাঁর শবদেহ ভারতবর্ষে পাঠানোর। এই বিঠ্‌লভাই প্যাটেল প্রায় লক্ষাধিক টাকা উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রকে দেশোদ্ধারের কাজে মূলতঃ বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচার কার্য্যে ব্যয় করবার জন্য; সুভাষচন্দ্র অবশ্য ব্যবহার করতে সমর্থ হলেন না সে টাকা—বিঠলভাই প্যাটেলের ভাই বল্লভ ভাই প্যাটেলের আদালতের সহায়তায় সে টাকা আপন হস্তগত করতে সমর্থ হওয়ায়।

বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করেন সুভাষচন্দ্র। একে অসুস্থ তার উপর সক্রিয়ভাবে কোনো কিছুতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না তিনি এখানে। সময়টি কিন্তু তিনি সদ্ব্যবহার করলেন সার্থকভাবে, লিখতে শুরু করলেন এক মূল্যবান পুস্তিকা—দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম্, ১৯২০-৩৪। এতে নিখুঁত করে ধরে রাখলেন তিনি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাম্প্রতিকতম ইতিহাস। বইটি প্রকাশিত হ'ল লণ্ডনে

১৯৩৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী—প্রশংসিত হ'ল অভাবনীয়রূপে গুণীজন কর্তৃক। রমাঁ র'লা তার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫-এর এক পত্রে উচ্ছ্বসিতভাবে লিখলেন বইটি সম্পর্কে—এমন কাজের লোকের পক্ষে এমন স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী—এ তো অভাবনীয় অসম্ভব ব্যাপার একটি। বইটি অবশ্য নিষিদ্ধ হ'ল ভারতে ভারত সরকার কর্তৃক। এ-সময়েই সুভাষচন্দ্রের আলাপ হয় এমিলি শেংকলের সঙ্গে—এই পর্বে তিনি টাইপিষ্ট-কাম-সেক্রেটারী ছিলেন সুভাষচন্দ্রের। আলোচ্য পুস্তিকাটির দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ ১৯৩৪-৪২, রচিত হয়েছিল ১৯৪২-এ সুভাষচন্দ্রের জার্মানীতে থাকার সময়ে।

এ সময়ে একটা আমন্ত্রণ পেলেন সুভাষচন্দ্র লণ্ডন থেকে। ওখানকার এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—ভারতীয় গণতান্ত্রিক সমিতি—তার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে হবে সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্রের এবারকার প্রবাসযাত্রার পূর্বসর্তানুসারে ইংরেজ সরকার বাদ সাধলেন তাঁর লণ্ডন যাত্রায়, শুধু লণ্ডনই বা কেন পরে পরে নিষিদ্ধ করা হ'ল তার আমেরিকা এমনকি রাশিয়া যাত্রাও। সুভাষচন্দ্র সশরীরে লণ্ডনে ঐ অধিবেশনে যোগ দিতে পারলেন না বটে, তবে লিখে পাঠালেন অমূল্য ভাষণ একখানি। এতেও সেই একই বিদ্রোহের সুর—স্বাধীনতা চাই, পূর্ণ স্বাধীনতা—মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য সর্তাধীন কোনো খণ্ডিত স্বাধীনতা নয়, সবার জন্য মুক্ত স্বচ্ছ-স্বাধীনতা। খুব স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের আবারও বিরাগভাজন হলেন তিনি ; স্বাস্থ্যোদ্ধারের অজুহাতে যে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল সুভাষচন্দ্রকে, এ বার পাকা করে দেওয়া হ'ল। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হ'ল তাঁর।

এই যে লিখিত ভাষণ, যা পঠিত হ'ল ভারতীয় গণতান্ত্রিক সমিতির অধিবেশনে এক কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য মিঃ শাকলাতওয়ালা কর্তৃক ১৪ই জুন ১৯৩৩-এ। এটিই 'লণ্ডন থিসিস' হিসাবে বিখ্যাত। প্রাসঙ্গিক সংযোজন হিসাবে এখানে বলা যায় যে ১৯৩৩ সালের সুরুর দিকে সুভাষচন্দ্র সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন যখন, তখন কম্যুনিস্ট পার্টির তিন সদস্যের এক দলের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার ঘটে তাঁর। বৃটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির খ্যাতনামা সদস্য রজনী পাম দত্তের ভাই ক্লিমেন্স দত্তও ছিলেন ঐ দলে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার ক্রমাগ্রগতির কারণে সুভাষচন্দ্র তখন ভীষণভাবে আকৃষ্ট রাশিয়ার প্রতি। ওখানে কথা হ'ল ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে রাশিয়ার সামরিক সহায়তা গ্রহণ করবার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হবেন তিনি—ভারতে এ জন্যে গড়ে তোলা হবে হিন্দুস্থানী সাম্যবাদী সংঘ—নামক একটি দল। সশরীরে লণ্ডনে উপস্থিত থাকতে পারলে সুভাষচন্দ্র কি বলতেন বলা যায় না, কিন্তু তাঁর লিখিত ভাষণে ছিল না রাশিয়ার কমিনটার্ণ থেকে এই সামরিক সহায়তা নেওয়ার উল্লেখ। যতখানি একান্ত ভাবে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা পেতে আশা করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে ঠিক ততখানি আপন তাঁরা ভাবতে পারলেন না আর তাঁকে।

ভারতে আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সুভাষচন্দ্রের, তবুও এক চরম দুর্ঘটনার কারণে সুভাষচন্দ্রকে সাময়িকভাবে ফিরতে দেওয়া হ'ল স্বদেশে। পিতা

জানকীনাথ মৃত্যুশয্যায়—সুভাষচন্দ্র কি শেষ দেখা দেখতে পাবেন না তাঁকে ! স্বভাবত্য ইংরাজ সরকার টালাবাহানা করেন বারবার, ফলে দেশে ফেরার সম্মতি পেতে দেরী হ'ল অনেক। সম্মতি প্রাপ্তিমাত্রেই স্বদেশাভিমুখে রওনা হলেন সুভাষচন্দ্র। বিমান করাচী পৌছানো মাত্রই খানাতল্লাসী করা হ'ল তাঁর, আপত্তিকর পাওয়া গেল না তেমন কিছুই—সঙ্গে ছিল ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম—বইটির এক টাইপ করা পাণ্ডুলিপি—বাজেয়াপ্ত করা হ'ল সেটিকে। ওখানেই জানতে পারলেন তিনি তাঁর বাবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার কথা। বিমান কোলকাতা পৌছানো মাত্র আবারও হেনস্থা একপ্রস্থ—নানান সর্ত আরোপিত করে তাঁকে থাকতে দেওয়া হ'ল কোলকাতায়। মাত্র সাতদিন থাকতে পারবেন তিনি—বাইরে বেরানো চলবে না আদৌ—কথাও বলা চলবে না বাইরের কারও সঙ্গে, আর চিঠিপত্র সব পরীক্ষা করে তবেই সে সব তুলে দেওয়া হবে তাঁর হাতে—এমনি সব। সবকিছু সর্ত মেনে নিয়েই সুভাষচন্দ্র ফিরলেন বাড়িতে। রোগশয্যায় পিতৃমুখ দর্শন তো হয়ই নি—এতসব করেও পিতার মৃত মুখ দর্শনের সৌভাগ্যটুকুও জুটল না তাঁর। পিতার মুখ দর্শন তো হ'ল না, তাঁর পারলৌকিকে ক্রিয়াকর্ম্মাদিতেও কি উপস্থিত থাকতে পারবেন না সুভাষচন্দ্র ? অনেক অনুনয় বিনয়ের ফলে সদয় হলেন সদাশয় ইংরেজ সরকার, বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল তাঁর বাড়ীতে থাকবার মেয়াদ কিন্তু শ্রাদ্ধাদি কাজকর্ম হয়ে গেলেই ভারত ত্যাগ করতে হবে তাঁকে। তাই করতে হ'ল সুভাষচন্দ্রকে—৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৪-এ স্বদেশে ফিরেছিলেন তিনি, ফিরে গেলেন অল্পদিন পরেই।

সুভাষচন্দ্র আবার ফিরলেন ভিয়েনাতে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ডাক্তারেরা রায় দিলেন এবার অস্ত্রোপচার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই করা হলে রোগমুক্ত হলেন তিনি। এবার আবার অখণ্ড অবসর, আবারও শুরু করলেন তিনি এক পুস্তিকা প্রণয়ন করতে। এবার লিখলেন হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল মুভমেণ্ট। এবারও সহায়তায় সেই এমিলি শেংকল। কী গভীর নিষ্ঠায়ই না তিনি সব কাজ করতেন সুভাষচন্দ্রের। এই এমিলি শেংকলই হলেন ক্রমে সুভাষচন্দ্রের প্রণয়িনী ও পরে পত্নী। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন দু'জনে।

সুভাষচন্দ্র বিয়ে করেছেন—এ সংবাদ যখন জানা গেল ভারতবর্ষে অনেক পরে, সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছাড়াও অনেক নিন্দামন্দও শোনা গেল সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে। এক সময় ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করেছেন যিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে, যৌন সংযম পালন করেছেন বরাবর, ইংল্যাণ্ডে থাকতে এমনকি মুখ তুলে তাকাতেন না কোনো ইংরাজ ললনার দিকে এবং সর্বোপরি বিবেকানন্দের আদর্শপুষ্ট কর্মযোগী একজন—তাঁর পক্ষে এ দৌর্ব্বল্য তো বরং ভ্রষ্টাচারিতারই লক্ষণ, চরম বিচ্যুতি একটা। সুভাষচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজনেরা অবশ্য স্বচ্ছন্দে মেনে নিয়েছিলেন এই বিবাহের ঘটনা—এ সময়কার নানা চিঠিপত্রের মধ্যেও যথেষ্ট প্রমাণ মেলে ঐ বিবাহের। এমিলি শেংকল অবশ্য ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও বহুদিন জীবিত থাকা সত্বেও এক বারের জন্যও আসেননি এই

ভারতবর্ষে, যদিও নেতাজী কন্যা শ্রীমতি অনিতা পাফ, একাধিকবার এসেছেন এখানে সুযোগ মত।

এই যে এবারকার সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ প্রবাসকাল এবং বাধ্যতামূলক অবসর যাপন, এ সময়ে একাধিক পুস্তিকা প্রণয়ন তো করলেনই—পাঠগ্রহণও করলেন প্রচুর। হেগেল, মার্ক্স থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতির ইতিহাস পর্যন্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করলেন তিনি। ভারতের যে কোনও সমস্যাই আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও গতিপ্রকৃতির পটপ্রেক্ষায় আলোচিত হওয়া দরকার বেশ গভীরভাবেই বুঝতে পারেন তিনি। এ সময় তিনি পরিচিতও হলেন পাশ্চাত্য অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে।

তৎকালীন প্রখ্যাত মনিষী রোমা রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটল তাঁর এপ্রিল ১৯৩৫-এ। কি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করেন এই ঋদ্ধ মনীষীটি ভারতবর্ষের প্রতি। ভারতবর্ষ বুদ্ধের দেশ, শ্রীচৈতন্যের দেশ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের দেশ। আধ্যাত্মিকতাবোধে সমৃদ্ধ, সর্বপ্রকার কলুষতা, কল্মষতামুক্ত, সরলতা ও মানবিকতা পূর্ণ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, এই বিশ্ববহির্ভূত স্বপ্নের দেশই বা একটা। বর্তমানে গান্ধীজি বয়ে চলেছেন রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই ভারতীয় সদ্‌গুণসমূহের অব্যাহত প্রবাহ। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বেশ বুঝতে পারেন সুভাষচন্দ্র—মত পথের মিল তাঁর সঙ্গে না থাকতে পারে গান্ধীজির—কিন্তু কি অসীম শ্রদ্ধার আসনেই না আসীন তিনি বিশ্ববাসীর সামনে। ভারতবর্ষের আন্তর্নিহিত সৌম্য রূপটি কি সনিষ্ঠ আন্তরিকতারই না উজ্জ্বল করে ধরে রেখেছেন তিনি বিশ্ববাসীর সামনে, এই সর্বব্যাপ্ত প্রায়ান্ধকার দিনগুলিতেও। সুভাষচন্দ্রের মাথা নত হয়ে আসে শ্রদ্ধায় গান্ধীজির প্রতি, রোমা রোলাঁর প্রতি—কিন্তু বুঝে উঠতে পারেন না তিনি—তাঁর অহিংসপন্থা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে কিভাবে এবং কতটুকু!

আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রখ্যাত নেতা ডি. ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল তাঁর দেশে ফেরবার ঠিক আগেকার রাত্রে। সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা দেশ স্বাধীন করবার প্রয়াসে উনি তখন আদর্শ সুভাষচন্দ্রের সামনে। কতবারই না উনি বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করেছেন তাঁর নাম—আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করবার সময়ে, আর তাঁর সেই স্বপ্নের নায়ক বর্তমানে সশরীরে উপস্থিত সামনে তাঁর। ডি. ভালেরার অসীম কষ্ট স্বীকারের কাহিনী স্মরণ করে নোতুন করে প্রেরণা পান তিনি এরপর আবারও অধিকতর কষ্ট স্বীকার করবার।

পরিচিত হলেন তিনি ইটালীর মুসোলিনির সঙ্গেও। এ পর্যায়ে অনেকবারই দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে—শেষ সাক্ষাৎকার ঘটল লণ্ডন থেকে বোম্বাই ফেরার পথে রোমে। মুসোলিনির উৎকট ফ্যাসিবাদ অতোটা উগ্র হয়ে উঠেনি তখনো—তাই তাঁর তীব্র বৃটিশ বিরোধিতা আকৃষ্ট করল সুভাষচন্দ্রকে, মনে মনে ভাবেন তিনি—এদের এই বৃটিশ বিরোধিতা কি কোনো ভাবে কাজে লাগানো যায় না ভারতের

স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বার্থে। মুসোলিনী এ সময়ে পরিচিত ছিলেন অন্যান্য অনেক ভারতীয় ছাড়াও এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির সঙ্গেও। এঁরাও কিন্তু এসময় গুণমুগ্ধই ছিলেন তাঁর। মুসোলিনী আমূল বদলে গিয়েছিলেন এরপর হিটলারের সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার কারণে। সুভাষচন্দ্র আপন আকাঙ্খা মত সহায়তা অবশ্যই পেয়েছিলেন মুসোলিনীর কাছ থেকে, তখন অবশ্য তিনি চলে গিয়েছিলেন চরম নিন্দিতের পর্যায়ে।

এমন সব প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব ছাড়াও সুভাষচন্দ্র এ সময় পরিচিত হলেন—আরও অনেক মনীষীর সঙ্গে—আন্দ্রে জিদ্, আন্দ্রে-মার্লো, চেক্ প্রেসিডেন্ট মিঃ বেনেস্, বিদগ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক লেসনী—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সব নাম। এঁদের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসতে পারায় তিনি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ঐসব দেশের সাধারণ অধিবাসীবৃন্দেরও পরম প্রিয়জন।

ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছেন সুভাষচন্দ্র। স্বাভাবিকভাবে ক্রমে অধৈর্যও হয়ে উঠছেন তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য থাকার কারণে এই প্রবাসে। ১৯৩৬ সালের প্রথমভাগে স্বদেশে ফেরবার জন্য মনস্থ করলেন তিনি। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাঁকে তো প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাস্থ্যোদ্ধার কারণে বিদেশে পাঠানোর অনুমতি দেয়নি, দিয়েছে তো শাস্তিস্বরূপ নির্বাসন। ইংরাজ সবকারের তরফে সম্মতি আসে না তাঁর প্রত্যাবর্তনের। ভারতের সন্ত্রাসবাসী আন্দোলন এ সময় জেরবার করে তুলছে তাদেরকে—সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করার কারণেই তো তার এবারকার নির্বাসন দণ্ড—আর এ সময় তাকে প্রত্যাবৃত হতে দেওয়ার অর্থ তো প্রত্যক্ষতঃই সন্ত্রাসবাদকে আরও উগ্র হতে সহায়তা করা। বড়ো অস্থির বোধ করেন সুভাষচন্দ্র।

এই নির্বাসন মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন স্পৃহার সঙ্গে যুক্ত হ'ল এবার স্বয়ং জহরলালের এক আমন্ত্রণ। এ বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি—তাঁর একান্ত ইচ্ছা সুভাষচন্দ্র উপস্থিত থাকুন ঐ অধিবেশনে : বৃটিশ সরকার রাজী না হওয়ার কারণে নিষেধ অমান্য করেই স্বদেশে ফিরলেন সুভাষচন্দ্র। জাহাজে চড়লেন ২৭শে মার্চ ১৯৩৬ ; আর দেশে ফিরলেন ১৯৩৬-এর ৮ই এপ্রিল। যথারীতি আবারও তিন আইনে গ্রেপ্তার হতে হ'ল তাঁকে। পৌছবার দিন ৮ই এপ্রিল সারারাত আটকে থাকলেন তিনি আর্থার রোড পুলিস ফাঁড়িতে। ওখানে কয়েক-দিন আটক করে রাখার পর ১৩ই এপ্রিল ১৯৩৬-এ স্থানান্তরিত করা হ'ল তাঁকে যারবেদা জেলে।

আবারও একবার সারা ভারতের জনসাধারণ সোচ্চার হ'লেন তাঁর মুক্তির দাবীতে। জনগণের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ সময় দাবী করলেন তাঁর বিনাসর্তে মুক্তি—এ সময় তিনি ভূষিতও করলেন তাঁকে দেশনায়ক আখ্যায়। পালিত হ'ল—নিখিল ভারত সুভাষ দিবস—তবুও মুক্তি ঘটল না তাঁর। বরং ঝামেলা এড়াতে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হতে থাকল এ জেল থেকে ও জেলে। আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র এবং তা বেড়ে গেলে তাঁকে মুক্তিদানের অছিলায় অন্তরীণ করা হ'ল তাঁর

মেজদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর কার্শিয়াং এর শৈলাবাসে। বাড়িটি অবশ্য কার্শিয়াং-এ ঠিক না—ওটি ছিল ওখান থেকে একটু দূরে গিধা পাহাড়ে! ওখানে বেশ কিছুদিন বাস করলেও শরীর সারল না তাঁর; অবশেষে জনআন্দোলনের নিরবচ্ছিন্ন দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে সুভাষচন্দ্রকে আনা হ'ল কোলকাতায়, এখানে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পরীক্ষা করবার জন্য এবং শেষপর্যন্ত নিঃসর্ত মুক্তি দেওয়া হ'ল তাঁকে ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ। মুক্ত হওয়ার অল্পদিন পরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে ডালহৌসি পাহাড়ে গেলেন তিনি—ওখানে থাকলেন ডাঃ ধরমবীরের বাড়ীতে। এই ধরমবীর পরিবারের সঙ্গে তিনি যে লণ্ডনে থাকতেই পরিচিত হয়েছিলেন সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—এখানে ডাঃ ধরমবীর ও তাঁর পত্নী মিসেস ধরমবীর অত্যন্ত স্নেহ যত্ন সহকারেই আন্তরিক আতিথেয়তা প্রদর্শন করলেন সুভাষচন্দ্রের প্রতি। প্রায় পুরো পাঁচ মাস থাকলেন তিনি সেখানে।

সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার আগেই ওখান থেকে ফিরলেন তিনি—আর ফিরেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজে—ঘুরে বেড়াতে থাকলেন এখানে ওখানে। আবার ভেঙে গেল স্বাস্থ্য তাঁর; এবং আবারও গেলেন প্রবাসে—অষ্ট্রিয়াতে—১৮ই নভেম্বর ১৯৩৭-এ। এ যাত্রায় মাস দেড়েক প্রবাসে কাটিয়ে ইংল্যাণ্ড হয়ে ভারতবর্ষে ফিরলেন তিনি—১১ই জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে। এ পর্যায়েও আবার লিখলেন পুস্তিকা একখানি—ভারত পথিক; এবং সহায়তায় স্বাভাবিকভাবেই সেই শ্রীমতি এমিলি শেংকল।

এ সময় হয়তো বা প্রবাসে আরও কিছুদিন কাটাতে পারতেন উনি, কিন্তু এবারে তাঁর নাম আলোচিত হতে সুরু করেছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্রান্ত সভাপতি হিসাবে। এ ব্যাপারে মুখ্য উদ্যোগ ছিল বামপন্থীদের;—স্বয়ং গান্ধীজিরও খুব একটা আপত্তি ছিল না এ ব্যাপারে।—এর আগে দেশবন্ধু, জওহরলাল প্রমুখ প্রতিবাদীদেরকে বশ করেছেন তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত করে; হয়তো বা সুভাষচন্দ্রকেও তেমনি করেই স্ববশে আনা যাবে এই আশায়!

শারীর বিচারে সুভাষচন্দ্র এখন বিধ্বস্ত অনেকটাই—মানসপুষ্টিতে কিন্তু সমৃদ্ধ অনেকখানি; কংগ্রেসের এক একনিষ্ঠ সৈনিক হিসাবে দীর্ঘ প্রায় ষোল বৎসর বস্তুতঃ প্রায় ব্যর্থ যুদ্ধই চালিয়ে এলেন তিনি—এবার সম্ভাবনা সৈনাপত্য প্রাপ্তির। তারপরও কি ব্যর্থই হবেন তিনি? এবার আর কিছুই কি করবার সুযোগ আসবে না তাঁর!

কংগ্রেসে সেনাপতি

ইতিমধ্যে বেশ একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে ভারতবর্ষে এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসেরও। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জার সম্রাটকে অপসারিত করে ১৯১৭ সালে ঘটে গিয়েছে বিশ্ব-আলোড়নকারী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর তার বার্ত্তা সার্থকভাবে পৌঁছে গিয়েছে ভারতবর্ষেও। শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতবর্ষে ফিরলেন রাশিয়া থেকে ১৯২২ সালে আর যেন সশরীরে বয়ে আনলেন মুক্তির সেই রঙীন স্বপ্নের সম্ভাবনার কথা। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল কানপুরে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি'র। কংগ্রেসে থেকেও বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রায় সবাই সামিল হ'লেন এদলে অন্যান্যরা ছাড়াও। অবশ্য রাশিয়ার তাসখন্দ শহরে এ পার্টি'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২০-তে প্রবাসী বিপ্লবী ভারতীয়দের উদ্যোগে। ঐ ১৯২০-তেই ভারতে মূলতঃ বামপন্থী প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আর ১৯২৬-২৭-এ প্রতিষ্ঠিত হ'ল ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টি'র।

বামপন্থী বা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বাকী একাংশ যাঁরা এসব দলে যোগ দিলেন না তাঁরা আলাদা থাকলেও উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মতই প্রভাবিত করতে চেষ্টা করলেন কংগ্রেসকে আপনাদের মতাদর্শে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর তার অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনা কোন পথে চালিত হওয়া উচিত এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এঁরা সবাই। ১৯৩৫ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি' বেআইনী ঘোষিত হলে—এঁদের অনেকে যোগ দিলেন কংগ্রেসে আর মূলতঃ এদেরকে সন্তুষ্ট করতেই ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসে তৈরী হ'ল কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট ফোরাম। জওহরলাল, জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেব, অশোক মেহতা, অজয় ঘোষ, রামমনোহর লোহিয়া, পি· সি· যোশী প্রমুখ তরুণ নেতৃবৃন্দ থাকলেন এই দলে ; সমমানসিকতার কারণে সুভাষচন্দ্র এদের কাছে আদর্শ নেতা একজন যদিও এই কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট ফোরাম তৈরীর সময়ে সুভাষচন্দ্র ছিলেন বিদেশে।

এই ১৯৩৪ সালেই ঘটে গেল আরও একটা ব্যাপার। এ সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন শেষপর্যন্ত পুরোপুরি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন গান্ধীজি আর ছেড়ে দিলেন চরম বীতশ্রদ্ধায় এমনকি কংগ্রেসের চার আনার সদস্য পদও। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি—এবার থেকে দরিদ্র, দলিত, ব্রাত্য ও অবহেলিত হরিজনদের মঙ্গলের জন্য সারাক্ষণ আত্মনিয়োগ করবেন। এই ১৯৩৪ সাল যেন সেই একদশক আগেকার অর্থাৎ ১৯২৪ সালেরই পুনরাবৃত্তি। সেবার গান্ধী—দাশ চুক্তির ফলে ঠিক হয়েছিল—আর রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠন নিয়ে থাকবেন না গান্ধীজি —ওসব করবেন দেশবন্ধু প্রমুখ অন্যেরা, উনি থাকবেন খাদি আন্দোলন জাতীয় জন-সচেতনতামূলক কাজকর্ম নিয়ে।

মূলতঃ এই বামপন্থীদের আগ্রহাতিশয্যেই এবং স্বাভাবিকভাবে গান্ধীজির

সম্মতিক্রমেও বটে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হলেন ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের। মতাদর্শের বিচারে গান্ধীজির এমন সম্মতি থাকার কথা নয়—কারণ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপায় হিসাবে আন্দোলন করার পন্থায় উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক—সুভাষচন্দ্র যে এই বিদেশ-বাস কালে বদলে গেছেন খুব, এমনও লক্ষণ দেখা যায়নি কিছু—তবু গান্ধীজি এ ব্যবস্থা চাইলেন মূলতঃ দুটো কারণে—এক, এর ফলে হয়তো বা নমনীয় করা যাবে সুভাষচন্দ্রকে আর দুই, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরামের অভিপ্রায়ও পূর্ণ করা যাবে এই পদক্ষেপের দ্বারা।

গান্ধীজির এই সম্মতি মনে রাখা দরকার যতখানি না রাজনৈতিক তার তুলনায় অনেক বেশী কূটনৈতিক। এই বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশকে একসময়ে এমনি করে গয়া কংগ্রেসের সভাপতি করে বশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি—তাঁর সে বশ করবার আশা অবশ্য ভুল প্রতিপন্ন হয়েছিল তখনই—তা হোক্, তারপর এই ১৯৩৬-এ তো ভালই বশ করতে সমর্থ হয়েছেন জহরলালকে কংগ্রেসের সভাপতি করে দিয়ে—সুভাষচন্দ্রকে যদি সেভাবে স্ববশে আনা যায়, মন্দ কি ? সুভাষচন্দ্র অবশ্য বশ মানলেন না এত সহজে ওই পদপ্রাপ্তির কারণে ;—উল্টে এত দিন যে বিরোধিতা চালিয়ে এসেছেন গান্ধীজির সঙ্গে তা বর্দ্ধিতই হ'ল অনেকগুণ ; কংগ্রেসকে আন্দোলনমুখী করে তুলবেন তিনি। দেশনায়ক তো সুভাষচন্দ্র ছিলেনই—এই সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ভূষিত করলেন তাঁকে রাষ্ট্রনেতা আখ্যায়, অভিষিক্ত করলেন আন্তরিক আশীষ-সিঞ্চনে।

১৯৩৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ হিসাবে যে দীর্ঘ অমূল্য বক্তৃতা রাখলেন তিনি—তা সর্বার্থেই সুভাচন্দ্রের আদর্শ ও চিন্তাভাবনার পূর্ণ-পরিচায়ক। আপন ইতিকর্ত্তব্যের সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরলেন তিনি। কংগ্রেসকে কোন পথে পরিচালিত করতে চান তা হয়ে ওঠে পরিষ্কার। তাবৎ নেতৃবৃন্দ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তাঁর সেই ভাষণের—পি. সি. যোশী তো অভিনন্দিত করলেন তাঁর সেই ভাষণকে—The best ever—সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ—এমন শিরোপা দিয়ে।

কি ছিল না তাঁর সেই ভাষণে। অধ্যাত্মবাদী স্বাদেশিকতার এক বর্ণময় জীবন্ত ছবি তিনি এতে অঙ্কিত করলেন,—আর ভারতবর্ষ তার সুসমৃদ্ধ অতীতের উপর ভর করে যে ভবিষ্যৎ রচনা করবে তার রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, সামাজিক ইত্যাদি নীতিপ্রকৃতি কি হবে তার সবকিছুরই স্পষ্ট রূপরেখা মেলে ধরলেন তিনি।

কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন তিনি—ভারতবর্ষ কেবল তার নিজের স্বার্থেই সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না—এই সাম্রাজ্যবাদ দূরীভূত করতে হবে সমগ্র বিশ্ব থেকেই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে রাখতে হবে অহিংসই কিন্তু সদা সক্রিয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় যাতে প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যের উন্নয়ন সুষমভাবে সম্পন্ন করা যায়, আর প্রকৃত গণতন্ত্রের বাতাবরণ গড়ে তুলতে বহুদলীয়

শাসন ব্যবস্থা থাকবে সেখানে। সাম্রাজ্যবাদের নিন্দার সঙ্গে তীব্র নিন্দা জানালেন নয়া-সাম্রাজ্যবাদ নাৎসীবাদের। বললেন—ভারতবর্ষের মুক্তি তো কেবল ভারতেরই জন্য নয়—এর অর্থই হ'ল বিশ্বমানবাত্মারও মুক্তি ; আপস নয়, চাই অবিরাম সংগ্রাম, হোক্ না তা অহিংস সংগ্রাম-ই। আর এ কারণেই ইংরেজদেরকে চরমপত্র তিনি দিতে চাইলেন এখনই।

এ সময়েই বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তিনি সজাগ থাকতে বললেন সবাইকে। আবেদন রাখলেন তিনি—আন্তরিক আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে হবে সব-রকমের সাম্প্রদায়িক সমস্যা। ইংরেজরা যে নানান অর্থহীন অজুহাতে টালবাহানা করে অনর্থক বিলম্বিত করছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে, আর তলে তলে অতি-সন্তর্পণে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে উদ্যোগ নিতে চলেছে ভারত ভাগের, এ ব্যাপারেও সতর্ক করলেন তিনি সবাইকে। স্বাধীনতা দান করতে গিয়ে আয়ার্ল্যাণ্ড-এর বিভাজনের ইতিহাস উপস্থাপিত করলেন তিনি—আর বিশ্ব ইতিহাসের নজীর দেখিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাম্রাজ্যসমূহের উত্থান পতনের কাহিনী বিবৃত করে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনও যে আশু এবং অবশ্যম্ভাবী তাও উল্লেখ করলেন তিনি।

ভারতের ভাবগত ঐক্য আছে ঠিকই কিন্তু তার ভাষাগত ঐক্যের জন্য চাই সারা ভারতে একটি মাত্র ভাষা ; উনি চাইলেন—তা হোক হিন্দুস্থানী এবং তা লেখা হোক রোমান হরফে। রাজনৈতিক ঐক্যের কারণে ভাষাগত ঐক্যও যে বিশেষ প্রয়োজন—এমন কথা বললেন তিনি ঐ সময়েই। তিনি চান ভারতের ভবিষ্যৎ রচিত হোক মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে, তবে তা কখনই ভারতের জাতীয় সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, নিয়মানুগত্য ও প্রেম এই পাঁচটি আবশ্যিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সবার জন্যে নিশ্চিত করা হোক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য তো রীতিমত ব্যাপক ও বৈপ্লবিকও, রাশিয়ার আদলে ভারতের জন্যও চাই সুষম উন্নয়নের স্বার্থে পরিকল্পিত অর্থনীতি। এ কারণে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেই গঠন করে ফেললেন এক পরিকল্পনা কমিশন—তার সভাপতি করলেন জহরলালকে আর সম্পাদক নিযুক্ত করলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এক নেতা শ্রী কে. টি. শাহ-কে, উল্লেখ করলেন তিনি—ব্যাপক ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, চাই জমিদারী উচ্ছেদ, কৃষিঋণ মুকুব, সস্তা মূলধন, বিস্তৃত সমবায় ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ। উৎপাদন ও বণ্টনের সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুভব করলেন উনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও পরিমিত নিয়ন্ত্রণের! সঙ্গে একটা দূরদর্শী চিন্তাও ব্যক্ত করতে ভুল করলেন না উনি জনসমস্যার তথা অতি-প্রজতার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে। স্বাধীনতা তো চাই-ই—কিন্তু তার সঙ্গে যে অবশ্যই চাই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আর তা যে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতিতে সম্ভব নয়

—চাই আধুনিক উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যাপক প্রয়োগ—খুব স্পষ্ট করেই রাখলেন এ বক্তব্য।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন চাইলেন সাম্রাজ্যবাদের এবং সেই সঙ্গে নয়া সাম্রাজ্য-বাদ ফ্যাসিবাদের বিনাশ, তেমনই চাইলেন রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে। বিশ্বের বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিগত উন্নতির সুযোগ গ্রহণ করতে হবে—মুখ ফিরিয়ে রাখলে চলবে না ঐসব অগ্রগতির দিক থেকে। যদিও সাম্যবাদী দেশ রাশিয়া, ওটি সাম্রাজ্যবাদী তো নয়—আর ঐ অবস্থানে থেকেই বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের মোকাবিলা করতে হবে।

সুপরিকল্পিত পরিচ্ছন্ন ভাষণ এবং পরিকল্পনা কমিশন গঠন—এ ছাড়াও আরও একটা ভাল কাজ করলেন উনি এ সময়ে। দুর্গত চীনের সাহায্যার্থে ডাঃ অটলের নেতৃত্বে একটা মেডিক্যাল মিশন পাঠালেন ওখানে। সুভাষচন্দ্রের সেবাপরায়ণতার আন্তর্জাতিকতার দ্যোতক হয়ে থাকল এই ঘটনাটি।

অচিন্ত্যপূর্ব ও অপরিমিত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর দার্শনিক সুলভ স্বচ্ছ সাবলীলতায় বিচিত্র বর্ণভঙ্গিমায় এক স্বপ্নরঙিন ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করলেন উনি এক দক্ষ শিল্পীর নিখুঁত মুন্সিয়ানায় এই সভাপতিত্ব কালীন। ভারতের ঐতিহ্য, কৃষ্টি আর সমৃদ্ধ সভ্যতাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভারত—এমন এক স্বপ্নিল আশা ব্যক্ত করলেন তাঁর অভিভাষণে ও আচরণে। আধুনিক চিন্তা সমৃদ্ধপ্রায় এমনই এক বক্তব্য রেখেছিলেন জহরলাল ইতিপূর্বে তাঁর লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই ভাষণ ছিল অনেক বেশী ব্যাপক, বিস্তৃত, গুরুত্বপূর্ণ ও বিপ্লবাত্মকও।

এতো স্পষ্টবাদিতা, এ ধরনের আধুনিকতা, এমন বিদ্রোহপনা, এ জাতীয় অসহিষ্ণুতা সহ্য হ'ল না গান্ধীবাদীদের। স্বয়ং গান্ধীজিও উষ্মা প্রকাশ করলেন এ ব্যাপারে, দূরত্ব বেড়ে চলে দু'জনের মধ্যে। আসন্ন সম্ভাব্য বিরোধ এড়াতে উদ্যোগ নিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—ডেকে পাঠালেন উভয়কে শান্তিনিকেতনে, কিন্তু আদৌ ফলপ্রসূ হ'ল না তাঁর প্রয়াস। অনড় থাকেন গান্ধীজি, মনে মনে ঠিক করলেন—আর আদৌ বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না সুভাষচন্দ্রকে—কোনও ভাবে।

নাছোড়বান্দা সুভাষচন্দ্রও। স্বমতানুসারে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন এই প্রথম এতো দিন তো ব্যর্থ প্রতিবাদীর ভূমিকায় অনর্থক বাদানুবাদ-ই করে এসেছেন উনি—তাতে মিথ্যা শক্তিক্ষয়ই হয়েছে শুধু, কাজের কাজ হয়নি কোনো—এবার সময় এসেছে সদর্থক কিছু করবার—হাল ছাড়বেন না তিনি কোনো মতেই। দুর্ভাগ্য সুভাষচন্দ্রের—তিনি ব্যর্থ হলেন তেমন কোনো সুযোগ পেতে—চরম অনভিপ্রেত ব্যাপার ঘটে গেল একটা কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে—ত্রিপুরী কংগ্রেসে।

এক বৎসরের স্বল্পকালীন সভাপতিত্বের মেয়াদে কতটুকুই বা আর করা যায়—সুভাষচন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেনই এবারও কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য। গান্ধীজিও

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—আটকাবেনই তাঁকে। তিনি সচেষ্ট হলেন প্রথম শ্রেণীর কোনও কংগ্রেস নেতাকে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্ত রাজী করাতে। ব্যর্থ হলেন তেমন কাউকে পেতে ;—আবুল কালাম আজাদ সরাসরি প্রত্যাখ্যান-ই করলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার প্রস্তাব—এমনকি জহরলাল নেহেরুও রাজী হলেন না দাঁড়াতে, শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া। যথারীতি ভোটাভুটি হ'ল—সুভাষচন্দ্র জিতলেন ১৫৮০—১৩৭৭ ভোটে। গান্ধীজি খেদ প্রকাশ করলেন—এই পরাজয়কে আপন পরাজয় বলে বিবৃতি দিয়ে ; ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন তিনি আপন অনুগামীবর্গকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়ে।

এই প্রথম ভোটাভুটি হ'ল কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি-হয়ে এমন স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় রাখবেন, এতখানি আশংকা করেননি গান্ধীজি। নেতাজীও অন্যান্যদের মত তাঁর নেপথ্য হস্তধৃত সূত্রচালিত পুত্তলিবৎ আচরণ করবেন—এমনটাই ভেবেছিলেন. কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কথাবার্তায় আচার-আচরণে তার লেশমাত্রও দেখতে পাননি তিনি। অবশ্য এমনও ভাবতে পারতেন তিনি--যেমন করে দেশবন্ধুকে, জহরলালকে সাময়িকভাবে হলেও বাগে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন তেমন করেই বাগে আনবেন সুভাষচন্দ্রকেও। তাও সম্ভব হ'ল না তার পক্ষে। গান্ধীজি অবশ্য তেমন আপস আসবার মত সুযোগই পেলেন না এবার তাঁর অনুচর বর্গের অসহিষ্ণুতার কারণে। তাঁদের আশঙ্কা—স্বাধীনতা হয়তো বা খুব দূরে নয়—ক্ষমতার অলিন্দে উত্তীর্ণ হতে গেলে বর্তমান অবস্থায় সুভাষ-বিরোধী হওয়া ছাড়া গত্যন্তরই বা কি ? সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আহৃত হলে তাঁদের ঠাঁই নিতান্ত গৌণ হওয়ায়ই সম্ভাবনা।

যাই হোক, গান্ধীজি, গান্ধীজি বলেই তাঁর কাছে দেশের আশা যে অনেক। গান্ধীজি এ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত এর আগে হ'ন নি এমন তো নয়—দেশবন্ধুর কাছে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে তিনি তো শেষ পর্যন্ত আক্ষরিক অর্থে পরাজিতই হয়েছিলেন—তবু তো শেষ পর্য্যন্ত আপস করেছিলেন তাঁর সঙ্গে—নেহেরুও তো অনেক ব্যাপারে প্রতিবাদী হয়েছেন তাঁর—তাঁর সঙ্গে তো একসঙ্গে চলতে অসুবিধে হয়নি—আর ইংরেজদের সঙ্গে তো প্রতিটি পদক্ষেপেই এ পর্যন্ত কূটনৈতিক চালে পরাজিত হয়ে আপস করে পিছিয়ে যাওয়ারই সম্পর্ক। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এমন অসহিষ্ণুতা বড়ো বেমানান, তাঁর চরিত্র এবং এ যাবৎ কাল আচরণের সঙ্গে। হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি হওয়া ঘটেছিল তাঁর সমর্থনেই, এবার ত্রিপুরাতে বিরোধিতা করলেও হয়তো বা সময় নিতে পারতেন সুভাষচন্দ্রকে সমঝে স্বমতে আনতে, কিন্তু আপন সমর্থকদের বাধায়—যাঁরা ক্ষমতা প্রাপ্তির লালসার কারণে এবং ক্ষমতাচ্যুতির আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রতি, মূলতঃ তাঁদের কারণেই সমর্থ হলেন না আপসমূলক কিছু করতে। ডাঃ সীতারামাইয়ার

পরাজয়ে প্রথম উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন গান্ধীজিই, সেকথা মনে রেখেও বলা যায়—সে উষ্মা ছিল যতখানি না স্বয়ং গান্ধীজির, তার থেকে বেশী তাঁর সমর্থকদের। গান্ধীজির কথা গান্ধীবাদীদের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার যুগ পেরিয়ে গান্ধীবাদীদের কথা গান্ধীজির মুখ দিয়ে প্রকাশিত হওয়ার সময়ের সুরু তখনই হয়ে গিয়েছে ; আর এরপর তো গান্ধীজিকে অস্বীকার করেই তাদের নিজেদের কথা নিজেদের মুখেই উচ্চারিত হওয়ায় সুরুর যুগ। বলতে দ্বিধা নেই—ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগেই!

সেকথা পরে—এবার এই যে নির্বাচন যুদ্ধে জয়ী হলেন সুভাষচন্দ্র—এর কারণ কিন্তু সেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরামের সক্রিয় সহযোগিতা ; কম্যুনিস্ট এবং সোস্যালিস্ট-দুই বামপন্থী দলই ভোট দিলেন তাঁর পক্ষে। এবং এ প্রসঙ্গে একথাও অবশ্য উল্লেখ্য যে এবার বাংলার থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট কিন্তু পড়ল না সুভাষচন্দ্রের পক্ষে। সে যাই হোক, সুভাষচন্দ্র আপন চরম আপস বিরোধী ভূমিকায় দৃঢ়সংকল্প এখন ;—একটুও পিছু হঠবেন না তিনি—বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করে তোলার প্রশ্নে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্র গেলেন ওয়ার্দ্ধাতে ;—গান্ধীজির সঙ্গে সেখানকার সেবাগ্রামে দীর্ঘ আলোচনা হ'ল তাঁর। ১৯২৮-২৯ সালে প্রস্তাব রেখেছিলেন তিনি ভারতে সমান্তরাল সরকার গঠন করবার, গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করবার প্রাক্কালে—তখন ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি আপন প্রস্তাব পাশ করাতে—এখন সেই সূত্র ধরে বৃটিশ সরকারকে চরমপত্র দিতে চান তিনি। গান্ধীজি কিছুতেই রাজী হলেন না এ প্রস্তাবে—উল্টে বর্তমান অবস্থায় বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ যে আদৌ কাজই করবেন না সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে—এ কথা বলে নিরুৎসাহ করেন তাঁকে। আশা ছিল জহরলাল হয়তো বা সায় দিবেন তাঁর প্রস্তাবে—দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে—লাভ হ'ল না কিছু। বড়ো হতাশ বোধ করেন সুভাষচন্দ্র। সর্বাধিনায়ককে যদি সেনানায়কেরা এবং তাঁদের অসাংবিধানিক সর্বময় কর্তা সহায়তা না দেন, সৈনিকদের কাছ থেকে তবে পাওয়ার আশা আর কতটুকু!

এসে গেল ত্রিপুরী কংগ্রেস। চরম মানসিক অস্বস্তি ও অশান্তি তো ছিলই। এ-সময় আবার ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে যুক্ত হ'ল শারীরিক অক্ষমতাও। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা এমন পর্যায়ে গেল যে এ্যাম্বুলেন্স বাহিত হয়ে তাঁকে আসতে হ'ল কোলকাতার বাড়ী থেকে ষ্টেশন পর্যন্ত তো বটেই এমনকি অধিবেশনে ভাষণ দানের সময়ে বাসস্থান থেকে অধিবেশন পর্যন্তও। এ সময়কার নিরবচ্ছিন্ন অসুস্থতার কারণে শোভাযাত্রার সময়েও সশরীরে যোগ দিতে পারলেন না তিনি—সেখানে বাহিত হ'ল তাঁর বড়ো প্রতিকৃতি একখানি। দারুন এই অসুস্থতা সত্বেও চিকিৎসকদের নিষেধ উপেক্ষা করেই ১০৩ ডিগ্রী জ্বর নিয়েও সভাপতিত্ব করলেন ওখানে।

স্বাভাবিকভাবেই এই অসুস্থতার কারণে এবার তাঁর ভাষণ খুব একটা জোরালো হ'ল না, কিন্তু বক্তব্য ছিল আপন চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই যথেষ্ট

বৈপ্লবিকই। এক্ষেত্রে মূল বক্তব্য ছিল তাঁর—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজ বেশ কোণঠাসা এখন—বস্তুতঃ বিশ্বের বিরোধী শক্তির কাছে নতজানু অবস্থা তার। এই তো সুবর্ণ সুযোগ তাদেরকে শেষ আঘাত হানবার। চরমপত্র দিতে হবে তাদেরকে—নানান অছিলায় ইংরেজ সরকার যে মাঝে মাঝে করুণার নিষ্ঠীবন বিতরণ করে সন্তুষ্ট করতে চাইছে ভারতবাসীকে। নেতৃবৃন্দের উচিত হবে না সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে আন্দোলন বিমুখ হওয়া। এ-প্রসঙ্গে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ধারা বলে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের কথা উল্লেখ করলেন তিনি—এ-নির্বাচনে জয়লাভ করে কংগ্রেস কয়েকটি প্রদেশে শাসন ক্ষমতায় বসেছে ঠিকই, কিন্তু আসল বিচারে এর দ্বারা তো বরং ইংরেজ সরকারের সহযোগিতাই করা হচ্ছে—তাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা জাতীয় কিছু আদায় করা হ'ল কই। এতো এক ধরনের দাসত্ব স্বীকারের নামান্তর।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য জহরলালও এই ভারত শাসন আইন সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—দাসত্বের এক নতুন পর্যায়। সুভাষচন্দ্র চান ইংরেজদের চরম আঘাত হানতে হবে এখনই। কথাবার্তা সমস্তই গান্ধীবিরোধী হলেও ভাষণকালে এবং অন্য সময়েও গান্ধীজির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে কিন্তু তাঁর কার্পণ্য দেখা যায়নি কখনো। ইংরেজদের এক নিগূঢ় উদ্দেশ্যের প্রতি এ সময় তিনি আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সকলের—সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে ভারত ভাগ করবার ব্যবস্থা পাকা করতে উঠে পড়ে লেগেছে ওরা সংগোপনে অতি কৌশলে।

নীতির সংঘাতে ততখানি নয়; আসলে আপনাদের অমনঃপুত ব্যক্তি নেতাজীর নেতৃত্বের কারণে সহ্য হল না তাঁর এই তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবার কথা অন্যান্য নেতৃবৃন্দের। তাই যদি না হবে তবে সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করে তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে ১৯৪২ সালে কেন গৃহীত হ'ল প্রায় অনুরূপ বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত—ইংরাজ, ভারত ছাড়ো। ইতিমধ্যে কি এমন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় যে এ যাবৎ আপসপন্থী কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হ'ল এমন একটি চরম সিদ্ধান্ত! ১৯৪২-এর আগষ্ট অন্দোলনকে বলা যেতে পারে—কংগ্রেস থেকে সুভাষকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস ক্ষেত্রে সুভাষবাদের আবাদ। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এ জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে পাঠ গ্রহণকারী সামরিক শৃঙ্খলাবোধে সুশিক্ষিত সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এমনতর একটি আন্দোলন হয়তো বা হতে পারত অনেক বেশী কার্যকরী, কিন্তু ভারত ছাড়ো—আন্দোলনটি সুরু থেকেই নেতৃত্বহীন হয়ে স্বয়ং গান্ধীজি কর্তৃক তাঁরই ভাষায়—ঈশ্বর অথবা নৈরাজ্যের হাতে সমর্পিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খল তো হলই—হয়ে উঠলো কোথাও কোথাও সহিংসও; করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গের মরেঙ্গেই ঘটল বেশী। বিপ্লব সংগঠিত করে বিপ্লবী হওয়ার সুযোগই দেওয়া হ'ল না সুভাষচন্দ্রকে—স্বকীয় বিদ্রোহকে স্বদেশী বিপ্লবে রূপান্তরিত করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আবারও বিদ্রোহী-ই হতে হ'ল তাঁকে;—সুভাষচন্দ্রকে থেকে যেতে হ'ল আজীবন বিদ্রোহী।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবে গান্ধী-বিরোধী কোনও নেতার নেতৃত্বে তাই কি হয়! গান্ধীবাদীরা নিজেদের ক্ষমতা অক্ষত রাখতে গান্ধীজীর ক্ষোভপ্রশমনের অছিলায় উদ্যোগ নিলেন সুভাষচন্দ্রের ডানা ছেঁটে ফেলবার। ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯-এ এক যোগে পদত্যাগ করলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল, প্রমুখ বারো জন সদস্য; আলাদা এক বিবৃতি দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জহরলালও, তাঁর পদত্যাগ তাঁর নিজের ভাষায় Not quite correct, yet correct enough—পুরোপুরি সঠিক না হলেও যথেষ্টই ঠিক। গান্ধীবাদীদের সঙ্গে এক গোত্রে রাখতে পারছেন না নিজেকে, আবার সহ্য করতে পারছেন না সুভাষচন্দ্রকেও—এমনি করে হেঁয়ালী ভরা ভাষায় আপন ভূমিকা ব্যক্ত করলেন তিনি। ৭ই মার্চ ১৯৩৯-এ উপস্থাপিত করা হ'ল পন্থ প্রস্তাব; অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে গান্ধীজির কথা পুরোপুরি মেনে নিয়ে, যার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় সভাপতি যিনিই থাকুন না কেন, কংগ্রেস চলবে গান্ধীজির অঙ্গুলি হেলনে।

সুভাষচন্দ্র বেশ বুঝতে পারেন কংগ্রেসে তাঁর সভাপতিত্ব ঘিরে এক জঘন্য চক্রান্তের জালে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে তাঁকে। তখনো অসুস্থ তিনি, তবু আলোচনায় বসলেন এ প্রস্তাব নিয়ে যদি সর্বজনগ্রাহ্য সুষ্ঠ সমাধান কিছু করা যায়। অনঢ় বিরোধীরা। অবশেষে ১২ই মার্চ ১৯৩৯-এ অসুস্থতার কারণে সুভাষচন্দ্র অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পাশ হয়ে গেল এ প্রস্তাব। সুভাষচন্দ্রকে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত করতে মুখ্য ভূমিকা ছিল যে বামপন্থী অর্থাৎ সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দের, তাঁরাও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমর্থন করলেন এই প্রস্তাব। অবশেষে কংগ্রেসের সম্ভাব্য ভাঙন রোধ করতে সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন সুভাষচন্দ্র কোলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ১৯৩৯-এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে।

পন্থ প্রস্তাব নিয়ে যে ভোটাভুটি হ'ল বামপন্থীদের মধ্যে সাম্যবাদীরা সরাসরি ভোট দিলেন তাঁর পক্ষেই—এস. এ. ডাঙ্গে, অজয় ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নির্দেশক্রমে। সমাজতন্ত্রীরা, যাদের নেতৃত্বে আসীন তখন নরেন্দ্রদেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ—অবশ্য বিরত থাকলেন এই ভোট দান থেকে। এদের অঙ্ক ছিল—সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ঠিকই কিন্তু তার তাবৎ নেতারাই যখন বিরোধী তাঁর, তার হাত ধরে ভারতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার সম্ভাবনা কতটুকু? গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে তার প্রসার সম্ভাবনা চেষ্টা করে দেখবার সুযোগ বরং অনেক বেশী। তাঁদেরকে সমর্থন জানিয়ে তাঁদের আস্থা অর্জন করতে পারলে তাদের মাধ্যমেই বরং ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে অনেকখানিই সহজ। অবশ্য এর বাইরেও আন্তর্জাতিক হিসেব-নিকেশ এমনকি আন্তর্জাতিক আদেশ নির্দেশ থাকার সম্ভাবনাও

অসম্ভব কিছু নয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ অবশ্য তাঁর দলের পক্ষে এই আচরণের জন্য ত্রুটি স্বীকার করলেন পর বৎসরই আর কম্যুনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সম্যক মূল্যায়ন করে ত্রুটি স্বীকার করে প্রথম ১৯৬২ সালে তৎকালীন দলীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষের মাধ্যমে।

সুভাষচন্দ্রের পরিত্যক্ত আসনে সমাসীন হলেন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ। গান্ধীজির গণতান্ত্রিক প্রকাশ্য অসহযোগ বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যাহৃত ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও তাঁর এই অগণতান্ত্রিক অপ্রকাশ্য অসহযোগ কিন্তু পরিপূর্ণ সার্থকতা ও চরিতার্থতা লাভ করল সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে।

আবারও নিঃসঙ্গ হলেন সুভাষচন্দ্র যদিও এবার অন্য ধরনের। অকৃত্রিম আশিস্ বর্ষিত হয় তাঁর উপরে এই পদত্যাগের কারণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক, যদিও প্রথম প্রথম তিনি বিরত করবার চেষ্টা করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে এই পদত্যাগ থেকে। তবু সুভাষচন্দ্রের এই পদক্ষেপকে পরম মর্যাদাবোধ ও সহিষ্ণুতার পরিচায়ক বলে উল্লেখ করলেন তিনি। তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হ'ল সুভাষচন্দ্রের উপরে। তোমার আপাত পরাজয় স্থায়ী বিজয়ে পরিণত হবে—একথা বলে এই পদত্যাগকে পরম গৌরবান্বিত করলেন তিনি। ক্রান্তদর্শী কবিগুরুর এই ভবিষ্যৎদৃষ্টি ব্যর্থ হয়নি প্রকৃত প্রস্তাবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্থায়ী বিজয় সুভাষচন্দ্রের হাত ধরে এল না ঠিকই—কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক কোণঠাসা হয়ে একক নেতৃত্বে যে অতুলনীয় বীরত্বের নিদর্শন রাখলেন তিনি তা মহাকালরূপী ইতিহাসের বুকে অঙ্কন করে দিল স্থায়ী বিজয়ের অভ্রান্ত স্বাক্ষর। স্বাধীনতার যুদ্ধ জয়ে অর্জিত হ'ল যে বিজয়—তেমন বিজয়, তেমন স্বাধীনতা অবশ্যই কাম্য ছিল না সুভাষচন্দ্রের—তাঁর বিজয় অন্যরূপী—তাঁর বিজয় – শৌর্যের, বীরত্বের, অসম সাহসিকতার, অনমনীয় মনোবলের, অপ্রতিরোধ্য অগ্রগমনবর্তীতার আর অতুলনীয় চরিত্রবলের।

সেই কোন্ ১৯২১ সাল থেকে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সৈনিক থেকে বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেননি তিনি, শেষ দু'বছরে সেনাপতি থেকেও আবারও একই ভাবে ব্যর্থ তিনি—বেশ বুঝতে পারেন সুভাষচন্দ্র—দক্ষিণপন্থী, বিপ্লব বিমুখ, আপস কামী—এই দলে থেকে কিছুই করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে—এবার ভাবলেন তিনি এই স্থবির দলটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে কিছু করা যায় কিনা,—দেখবেন তিনি এবার।

এই নবপর্বের কর্মোদ্যমের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ফরওয়ার্ড ব্লক—১৯৩৯ সালের ২২শে জুন। সমমতাবলম্বী বামপন্থী ও সক্রিয় আন্দোলনে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দকে নিয়ে প্রয়াস পেলেন এই দল গড়ে তুলতে। গান্ধীজির নিরলস অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিপুল জনজাগরণ ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সেই জাগ্রত জনগণকে আন্দোলনমুখী করে তুলবার প্রকৃষ্ট প্রয়াস কোথায়! আপাতঃ হতাশ সুভাষ, নিরুপায়

সুভাষ, বামপন্থায় বিশ্বাসী সুভাষ সমমতযুক্ত সহযোদ্ধাদেরকে সংহত করে গ্রহণ করবেন এমন একটি বলিষ্ঠ কার্যকরী পদক্ষেপ—এই-ই তো স্বাভাবিক।

খুব আশা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র—১৯২৪ সালে যেমন করে স্বরাজ্য দলকে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল—তেমনি করেই এবারেও হয়তো কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করবার সুযোগ পাবেন তিনি—কিন্তু পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ-এর সভাপতিত্বে খুব স্বাভাবিক-ভাবেই বহিষ্কৃত করা হ'ল তাঁকে কংগ্রেস থেকে প্রথম তিন বৎসরের জন্য এবং পরে বরাবরের জন্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক দলকে চিহ্নিত হতে হ'ল আলাদা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দল হিসেবে—খুব সঙ্গত কারণেই।

কংগ্রেসে আর কোনো দিনই ফেরা হয়নি সুভাষচন্দ্রের। এরপর তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রইল না কেবলমাত্র ভারতাভ্যন্তরে—তা হ'ল বিশ্বের বিস্তীর্ণ রণপ্রান্তরে। শুরু হ'ল বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত স্বাধীনচেতা দৃঢ় চিত্ত সম্মুখবর্তীতার এক অবিশ্রান্ত কর্মমুখর বিস্ময়কর জীবন।

নতুন রাজনৈতিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ফেললেন সুভাষচন্দ্র—একটি ভাঙবার আর অন্যটি গড়বার। প্রথমটি ডালহৌসি স্কোয়ারে অবস্থিত হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ, আর দ্বিতীয়টি মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠা।

হলওয়েল মনুমেণ্ট এক কল্পিত কুকীর্তির স্মারক হয়ে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল খোদ কোলকাতার কেন্দ্রস্থলে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা নাকি এক ছোট্ট অপরিসর আলো-বাতাস হীন ঘরে বেশ কিছু ইংরেজকে বন্দী করে রেখে মৃত্যুর কারণ হয়েছেন তাঁদের, অন্ধকূপ হত্যা করেছেন তাদেরকে। কিন্তু এ কাহিনী তো অসম্ভব, অবাস্তর এবং সে কারণে মিথ্যে,—ভারতবর্ষীয়দেরকে হেয়, অমানুষ ও হীনপ্রতিপন্ন করবার চক্রান্ত একটা। ভারতের বুকে এমন একটা মিথ্যা কলঙ্কের স্মারক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে, সহ্য করতে পারেন না কোনও আত্মসম্মান বোধযুক্ত মানুষই। সুভাষচন্দ্রের অনমনীয় দাবী—অপসারিত করতে হবে ওটিকে। হ'লও তাই—সতর্ক পুলিসি আরক্ষা দৃঢ় প্রতিরোধ ও অত্যাচার চালিয়েও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবী ও সত্যাগ্রহীদের কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকারে বাধ্য হল। পিছু হঠতে হ'ল ইংরাজ সরকারকে। সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা সত্বেও অপসারিত হল মনুমেণ্টটি ১৯৪০ সালে। কংগ্রেস থেকে বাইরে এসে প্রথমতম আন্দোলনেই জয়ী হলেন সুভাষচন্দ্র আপন একক ও অবাধ নেতৃত্বের কারণে।

ঐ ১৯৪০ সালেই দ্বারোদঘাটন হ'ল মহাজাতি সদনের। কি বিপুল আগ্রহ আর উদ্দীপনারই না সৃষ্টি করল এই উপলক্ষ্যে জনগণের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্রের অর্থ সংগ্রহের অভিযান ও সহযোগিতার আহ্বান। রবীন্দ্রনাথ আবারও একবার আশীষধন্য করলেন সুভাষচন্দ্রকে ১৯শে আগস্ট ১৯৩৯-এ এই সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। এ ছাড়াও আরও একটা কাজ করলেন তিনি ঐ সময়ে—১৭ই মার্চ ১৯৫০ সাল থেকে রামগড়ে অনুষ্ঠিত হ'ল তাঁর বিখ্যাত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও আপস বিরোধী সম্মেলন। সাম্রাজ্যবাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করে এবং তার বিরোধিতা করে যে ভাষণ রাখলেন সুভাষচন্দ্র ঐ সম্মেলনে—বর্তমানেও তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কংগ্রেসের অধিবেশনও ঐ সময় হচ্ছিল অদূরেই। সুভাষচন্দ্র ফিরবার পথে সাক্ষাৎ করতে ভুললেন না গান্ধীজির সঙ্গে।

কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে স্বাধীন এখন সুভাষচন্দ্র; আপন আদর্শানুসারে নির্দ্বিধায় বাধাহীনভাবে পথ চলতে অসুবিধা নাই কোনও। দলীয় মুখপত্র বের করতে শুরু করলেন একটা—ফরওয়ার্ড ব্লক। উত্তেজনাকর প্রবন্ধাদি লিখে চললেন তাতে। জ্বালাময়ী বক্তৃতাও দিয়ে বেড়াতে লাগলেন সর্বত্র। আবারও স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বিগ্ন বোধ করে ইংরেজ সরকার। এবার তাদের উদ্বেগের মাত্রা বরং অনেক বেশীই—আগে হয়তো বা কংগ্রেস দলটিই এসব কাজ করলে সংযত করতে

পারত তাঁকে, এখন কংগ্রেসের সে ভূমিকাটুকুও তো নিতে হবে ইংরেজকেই !' সুভাষচন্দ্রকে মুক্ত রাখা নিরাপদ মনে করল না ইংরেজ সরকার—রাজদ্রোহের অপরাধে জুলাই ১৯৪০-এর গোড়াতেই গ্রেপ্তার হতে হল তাঁকে। আবার শুরু হল কারাজীবন তাঁর। যথারীতি ইংরেজ সরকার কর্তৃক শুরু হ'ল সেই চিরাচরিত অহেতুক উৎপীড়ন এবং অনর্থক ও অযৌক্তিক বাধানিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করল। এই জেলবন্দী অবস্থাতেই নির্বাচিত হলেন তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে এবং কোলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানও। এসব কিছুতে কিছুই যায় আসে না ইংরেজ সরকারের—সে কারণে সুভাষচন্দ্র বাধ্য হলেন নভেম্বর মাসে অনশন শুরু করতে। তৎকালীন বাংলার রাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন অনুরোধ জানালেন তাঁকে অনশন ভঙ্গ করতে—ফল হল না কিছুই।' মেজদা শরৎচন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে প্রত্যাহার করতে বললেন এ অনশন। তাতেও লাভ হল না কিছুই—চিকিৎসকেরা সাবধান করলেন ভবিষ্যৎ আশংকা করে—ব্যর্থ হ'ল সে সাবধানবানীও। নিরুপায় সরকার বাধ্য হল সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিতে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের গোড়াতেই।

সুভাষচন্দ্র বাড়ী ফিরলেন মুক্ত হয়েই। কিন্তু তিনি তাঁদের ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়ীতে ফিরতে না ফিরতেই বিরাট পুলিস বাহিনী ঘিরে ফেলল সে বাড়ী। স্বগৃহে অন্তরীণ হলেন সুভাষচন্দ্র। বাইরের কারাবাস থেকে যেন আপন আবাসস্থলের কারাবাসে নীত হলেন তিনি ; সুভাষচন্দ্র ভাবেন বরং ভালই হ'ল তাঁর পক্ষে ; অখণ্ড সুযোগ পাবেন তিনি এবার ভবিষ্যতের সুপরিকল্পিত সংগ্রাম সফল করবার সদর্থক কর্ম পদ্ধতি নিরুপণের। মহানিষ্ক্রমণের ছক কাটা শুরু হল সুচতুরতার সঙ্গে। ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে অনেক আন্দোলন দেখলেন তিনি—সব নিষ্ফল, নঞর্থক,—অনেক আন্দোলন করলেনও তিনি—সব বাধাপ্রাপ্ত, ব্যর্থ। দেশের মধ্যে থেকে কি আপন নেতৃত্বে—কি অন্য নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে আর যে কিছু করা সম্ভব—তা ভাবতে পারছেন না তিনি আর ; তা যদি হ'ত তবে তাঁর ভাষায় -I would not have been so foolish as to undertake this unnecessary risk. সত্যিই তো ভারতভূমিতে থেকে কার্যকরী কিছু করাই যেত যদি তবে কেন অমন অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়ার মত নির্বোধের কাজ করতে যেতেন উনি। ভারতের তৎকালীন স্বাধীনতা যোদ্ধাদের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসসম্মত ভাবে বিচারের প্রয়োজন। সে ঝুঁকিটা ছিল কতখানি অপ্রয়োজনীয়—আর সে কাজটাই বা ছিল কতখানি নির্বোধ সুলভ।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জার্মানীকে যে চরম অপমানিত করা হয়েছে, তার উপযুক্ত বদলা নিতে হিটলার হয়ে উঠেছেন তৎপর, গত কয়েক বৎসরে জার্মানীতে আপন কর্তৃত্ব রীতিমত কায়েম করে উপরিউক্ত বদলা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্তৃত্ব স্থাপন করতে হ'য়ে উঠেছেন তিনি উদ্‌গ্রীব। ১৯৩৯ সালের ১লা আগষ্ট রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে এক মাস না পেরোতেই ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর

পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু করে দিয়েছে জার্মানী—ইংল্যাণ্ড এক নম্বরের শত্রু তার। সুভাষচন্দ্র হিসেব কষলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের এই বিপদের সুযোগ নিয়ে অল্পায়াসেই কোণঠাসা করা যায় ওদেরকে। শত্রুর শত্রু, অতএব আমার মিত্র এই ছক মেনে জার্মানী তথা অক্ষশক্তির সহায়তা নিয়ে ইংরেজকে পর্যুদস্ত করা গর্হিত মনে হয় না তাঁর—যদিও দীর্ঘকাল ইউরোপে থাকার সময়ে জার্মানীর আগ্রাসী ও দাম্ভিক চরিত্রের বেশ ভাল রকম পরিচয়ই পেয়েছিলেন উনি, এবং সেকথা সেই সুদূর ১৯৩৬ সালে উল্লেখও করেছিলেন এক চিঠিতে।

অন্তরীণ অবস্থায় আপন গৃহে সুভাষচন্দ্র ভাবতে সুরু করেন—কোনো ভাবে কি যোগ দেওয়া যায় না ইংরাজ বিরোধী শক্তি গোষ্ঠীটির সঙ্গে। এমন সুবর্ণ সুযোগ সামনে, আর এ সময় তিনি নিষ্ক্রিয় থাকবেন তাও কি হয়? তাছাড়া নানান ইতিহাস পড়ে এসময় এক ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে তার মনে—বৈদেশিক সহায়তা ছাড়া স্বাধীন করা যাবে না ভারতবর্ষকে। ইটালির গ্যারিবল্ডী নিয়েছেন অষ্ট্রিয়ার শত্রুদলের সহায়তা —চীনের সান ইয়াৎ সেন নিয়েছেন জাপানের সাহায্য, আয়ার্ল্যাণ্ডের ইমন-ডি-ভ্যালেরা নিয়েছেন আমেরিকার সহযোগিতা—এমন উদাহরণ তো ভুরি ভুরি। যেমন করেই হোক, এ সময় জার্মানী তথা অক্ষশক্তির সহায়তার সুযোগ নিতেই হবে তাঁকে।

ভারতের বুকে থেকে এ সহায়তা তো পাওয়া সম্ভব নয়—তাই চিন্তা করলেন তিনি ভারতের বাইরে যাওয়ার। অতো কড়া প্রহরা, সারা ভারত জুড়ে কঠোর বাধানিষেধের নিশ্ছিদ্র বেড়াজাল সব ছিন্ন করে মুক্ত হতে সমর্থ হলেন সুভাষচন্দ্র। চলে গেলেন বাইরে মাত্র নয়, ভারতেরও বাইরে—তারও বাইরে বৃটিশ প্রভাবাধীন এলাকা পেরিয়ে খোদ বৃটিশের শত্রু শিবিরে।

সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক বিদ্রোহী অপার কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তিত্বে কলঙ্কলেপন করতে অনেক সুভাষ-বিরোধীই তাঁর এই কষ্টকর নিষ্ক্রমণ ও পরবর্তী পরিক্রমণকে হতাশার অনিবার্য পরিণতি বলে নস্যাৎ করতে চান। তাঁর এই Going West নাকি Going Waste; পাশ্চাত্যের পথে যাত্রা নয়, পচন হতে যাত্রা; তাছাড়া বৃটিশরা নাকি তাঁকে আদৌ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এই অর্থহীন অন্তর্দ্ধান! কিন্তু তাঁর তৎকালীন ও পরবর্তী কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে এই নিষ্ক্রমণ যে কত আন্তরিক ছিল, এবং পরবর্তী কার্যকলাপ যে কত সনিষ্ঠ ছিল তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। সুভাষচন্দ্রের এই কষ্টকর ভারতত্যাগের এক নিখুঁত, বিস্তৃত ও বিশ্বাস-যোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় তার এ সময়কার যাত্রাসঙ্গী ভগৎরাম তলোয়ার লিখিত— "আমি নেতাজীর অন্তর্ধানের সঙ্গী ছিলাম" বইটিতে।

কি নিখুঁত পরিকল্পনা। উনি কোলকাতায় থাকতেই যোগাযোগ করা হ'ল সুভাষসমর্থক ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ী প্রবাসী ঘনিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে যাতে সুভাষের যাত্রাপথে সহায়তা পাওয়া যায় তাঁদের। এঁদের মধ্যে ছিলেন মিঞা আকবর শাহ, মোহম্মদ শাহ, আবাদ খাঁ, ভগৎরাম তলোয়ার, সর্দার খাঁ প্রমুখ বিশিষ্টও

প্রভাবশালী ব্যক্তিসমূহ। যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হ'ল কাবুলে লালা উত্তমচাঁদের সঙ্গে—তাঁকে অবশ্য পাওয়া গেল না। প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল পূর্ব এশিয়ায় যাবেন উনি—তা অবশ্য নানা কারণে সম্ভব না হওয়াতে গেলেন উনি রাশিয়া হয়ে বার্লিনে। সে তো বাইরে কোথায় কিভাবে যাবেন তার পরিকল্পনা—কিন্তু আদৌ গৃহ ত্যাগ করলেন তিনি কিভাবে। ঠিক হল—

স্বাস্থ্যোদ্ধার কামনায় সাত্ত্বিক মনোভাবাপন্ন সুভাষচন্দ্র মৌনাবলম্বন করবেন। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ করা হল সবার। এমনকি তাঁর মুখদর্শন করাও হ'ল নিষিদ্ধ। খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেওয়া হতে থাকল পর্দার আড়াল থেকে; —আর এ সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ থাকল কেবলমাত্র তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শিশির বসুর সঙ্গে। এই শিশির বসুর সহায়তায় ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪১ সালের গভীর রাত্রে। ইংরাজী হিসাবে ১৭ই জানুয়ারীর প্রথম মাসে অন্তরীণ অবস্থা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন উনি। প্রায় দশদিন পরে পত্র-পত্রিকা মারফৎ বিশ্ববাসী যখন প্রথম জানল সে খবর—সুভাষচন্দ্র তখন কোথায় ?

ওাদন গভীর রাত্রে সারা কোলকাতার সঙ্গে ঘোর-ঘুমে অচেতন সুভাষচন্দ্রের পাহারায় আছে যে সান্ত্রীরা—তারাও। বাড়ীর দক্ষিণ দিকে রাখা শিশির বসুর গাড়ীতে সন্তর্পণে চড়ে বসলেন মুসলমান মৌলভীর বেশে সুভাষচন্দ্র। অবিশ্বাস্য সতর্কতা আর সাহসিকতার উপর নির্ভর করে নিমেষমাত্রে উধাও হয়ে গেল সেই গাড়ী ঘুমন্ত কোলকাতার নির্জন পথ ধরে। প্রথমে তিনি এলেন ধানবাদের কাছে বাড়ীতে তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর বড়ো ছেলে অশোক বসুর বাড়ীতে। এখানে তাঁর পরিচয় —তিনি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দালাল একজন। অশোক বসুর কাছে এসেছেন তাকে একটা ইনসিওরেন্স করানোর জন্যে ; অশোক বসু অবশ্য জানতেন সবই তবু অন্য সবার চোখ এড়াতে ইংরাজীতে চলল সব রকমের কথাবার্তা। তাছাড়া উনি বাইরের লোক যখন, রাতটাও কাটাতে হ'ল তাঁকে বাড়ীর বাইরের ঘরে।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার শিশির বসুর গাড়ীতে চড়েই রওনা হলেন তিনি গোমো স্টেশনের দিকে। লক্ষ্য দিল্লী-কালকা মেল। শেষ বিদায় জানালেন বাংলাকে—বাড়ীর অতি ঘনিষ্ঠ পরিজনটিকে। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার পরে যখন পৌঁছলেন কালকা মেলে দিল্লী এবং সেখান থেকে ফ্রন্টিয়ার মেলে পেশোয়ারের পথে নৌশেরা স্টেশনে—পূর্ব-পরিকল্পনা মত ড্রাইভার আবাদ খাঁর সঙ্কেতানুসারে চড়ে বসলেন তার গাড়ীতে। লক্ষ্য পেশোয়ার। ২১শে জানুয়ারী ১৯৪১-এ ওখানে সঙ্গী পেলেন ভগৎরাম তলোয়ারকে। ওখানে এক সরাইখানায় এক রাত কাটিয়ে ভোর না হতেই আবার বেরিয়ে পড়লেন তিনি। সারা আফগানিস্থান জুড়েই ইংরেজ গোয়েন্দা—এই দেশটা পেরিয়ে রাশিয়া পেঁছানো পর্যন্ত দারুণ সতর্ক থাকতে হবে তাঁকে। আবার ধরলেন নোতুন ছদ্মবেশ। এবার এক পাঠান সাজলেন তিনি, নাম নিলেন মহম্মদ জীয়াউদ্দীন। আরও একটা ছদ্মসজ্জার রূপ নিতে হল—বোবা-কালার ভান। যেহেতু ওখানকার ভাষা জানতেন না উনি, তাই করতে হল এটি। সঙ্গী এখন ঐ ভগৎরাম তলোয়ার

তৎকালীন ভারতসভার সেক্রেটারী, হিন্দু পাঠান তিনি—সাজলেন মুসলিম পাঠান, আর নাম হ'ল তার রহমৎ খাঁ। বোবা-কালা ভাইকে সুস্থ করতে সাখী সাহেবের পীরের দরগায় দোয়া মাঙতে পথে বেরিয়েছেন তিনি। এর সমস্যা সামলাতে কি মুস্কিলেই যে পড়েছেন।

এ সময় সুভাষচন্দ্রের জন্য এত করলেন এই রহমৎ খাঁ ওরফে ভগৎরাম তলোয়ার; অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস! এই ভগৎরাম ১৯৪২ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সামরিক গুপ্তচরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত অনেক গোপন তথ্য ইংরেজ তথা মিত্র বাহিনীর কাছে পাচার করে চরম সুভাষ-বিরোধিতার আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেবলমাত্র ইংরাজ বা রাশিয়ার সঙ্গেই মাত্র যোগাযোগ ছিল না এই গুপ্তচরটির। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর শরিক জার্মানীর সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে বেশ একটি বহুজাতিক গুপ্তচরের ভূমিকায় ভালই অবতীর্ণ হ'তে পেরেছিলেন তিনি। এই কাজ করার পক্ষে তখন যুক্তি ছিল তাঁর—সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের শত্রু একজন, কাজেই তাঁর শত্রুতা করাতে অপরাধ নেই কিছু। অন্যদের কথা বাদ দিলেও সুভাষচন্দ্রকে যে ভুল বুঝেছিলেন তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ জনেরাও, এ অবস্থার দ্যোতক হিসাবে এ ঘটনাটি স্বচ্ছন্দেই উল্লেখ করা যায়।

সে যাই হোক, কি নিদারুণ কষ্ট স্বীকারই যে করতে হ'ল এ সময়ে উভয়কে। পেশোয়ার থেকে বেরিয়ে মাইল কুড়ি মাত্র টাঙা চড়ে তারপর দীর্ঘ হাঁটাপথ—পাহাড়ী চড়াই উৎরাই। পদদ্বয় মাত্র সম্বল করে পরিক্রমা করতে হ'ল দীর্ঘ প্রায় আশি মাইল পথ। আর পথে তো মাত্র ইংরেজ গোয়েন্দাই নয়, ডাকাত গুণ্ডার দলও অজস্র। নিদারুণ শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে এরপর পেঁছিলেন তাঁরা লালপুরায়। অনেক পথ বাকী এখনো। পূর্ব নির্দেশিকা মত এখানে অতিথি হলেন সর্দার খাঁ নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে। ওখানে যে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করতে দু' একদিন অবসর নেবেন তারই বা অবকাশ কোথায়? কেউ যদি সন্দেহ করে বসে তো ফাঁস হয়ে যাবে গোটা পরিকল্পনাটাই। তাছাড়া নষ্ট করবার মত সময় এটা নয়—থামা চলবে না এক মুহূর্তও—আরাম উপভোগ করবার জন্য একটি দিনের জন্যও ছুটি নেওয়ার এই কি উপযুক্ত সময়!

পথে সুবিধা হতে পারে আশা করে সর্দার খাঁর কাছ থেকে একটা পরিচিতি পত্র নিয়ে আবার নামলেন ওঁরা পথে। এবারকার লক্ষ্যস্থল আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল। লালপুরা থেকে কাবুল পেঁছতে গেলে বেশ কিছুটা হাঁটাপথ পেরিয়ে পার হতে হবে কাবুল নদী। দারুণ খরস্রোতা এই পাহাড়ী কাবুল নদী, তার উপরে কোনো নৌকা ছিল না সেখানে। ভিস্তি বাহিত হয়ে চরম ঝুঁকির মধ্যে অনভ্যস্ত উপায়েই নদী পার হলেন তাঁরা। নদী পেরিয়ে ঠাণ্ডী পর্যন্ত আবারও বেশ কিছুটা হাঁটাপথ। সেটা পেরিয়ে তারপর মিললো বড়ো রাস্তা। এখানে ধরতে হবে বাস বা অন্যকিছু। বাস না পাওয়াতে ওঁরা বাধ্য হলেন ভাড়া করতে লরী একটা।

অপেক্ষা যে করবেন ধৈর্য মানছে না মোটেই। সীমান্ত পার হবার সময় তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করা হল ওদিকে, ওদের কাছে হয়তো বা অস্ত্রশস্ত্র আছে, এই আশংকায়। স্বাভাবিক কারণেই এতে অসুবিধা হল না কিছুই—কিন্তু লরীতে অবিরাম যাত্রা, কি নিদারুণ কষ্টই যে স্বীকার করে চললেন তাঁরা। ঠাণ্ডা বাতাস, তীব্র শীতের কামড়, উপযুক্ত শীত-বস্ত্রের অভাব, ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির ক্ষেত্রে—আর্থিক কারণে এবং প্রাপ্তি সম্ভাবনা কারণেও বটে, চরম অপ্রতুলতা, নিদ্রা তো দূরস্থান। বিনা বিশ্রামেই প্রায় দীর্ঘ দু'দিন অবিরাম যাত্রার পর পেঁছিলেন তাঁরা বাট-থাক-এ। দীর্ঘ যাত্রার পর ক্ষণস্থায়ী বিরতি।

বাট-থাক্-এ পেঁছিতেই আটকানো হ'ল তাঁদেরকে—পাশপোর্ট চাই। এ সময় দারুণ কাজ হল সর্দার খাঁর দেওয়া সেই পরিচিতি পত্র। সাদাসিধে ধর্মভীরু সরল মানুষ এরা। যাচ্ছে তো সাখী সাহেবের পীরের দরগায় বোবা কালা ভাই-এর জন্যে আল্লার দোয়া যাচ্ঞা করতে। ওসব পাশপোর্ট-এর ঝামেলা—এরা কি বোঝে এত সব!

অবশেষে কাবুল পেঁছিলেন তাঁরা,—কোলকাতা থেকে সুভাষচন্দ্রের যাত্রারম্ভের ঠিক দশদিন পরে—২৭শে জানুয়ারী ১৯৪১-এ। এখানে থাকবার কথা লালা উত্তম চাঁদের আশ্রয়ে। কিন্তু আগের থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারার কারণে সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল না তাঁকে। ও'রা উঠতে বাধ্য হলেন এক নোংরা সরাই-খানায়। ও সময়ে ওখানে অনুপস্থিত থাকার কারণে তিন চার দিনের মধ্যেও পাওয়া গেল না উত্তম চাঁদকে। উল্টে জুটল এক উটকো ঝামেলা,—এক পুলিস কর্মচারী সন্দেহ করতে সুরু করেছে তাদেরকে। রহমৎ খাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর অল্প কিছু উৎকোচ উৎরে দিল এ যাত্রা: রহমৎ খাঁ বলেন—যাব সাখী সাহেবের পীরের দরগায় এই বোবা কালা ভাইটির জন্য আল্লার দোয়া চাইতে তো যাব যে—চারদিকে যে বরফ পড়ছে—যাই কি করে? তার উপর ভাইটি আমার বড়ো অসুস্থ; পুলিশকে অবশ্য উৎকোচ দিতে হ'ল একাধিকবার। অবশেষে দেখা মিলল লালা উত্তমচাঁদের।

এরা যখন এদিকে এমনি কষ্টকর যাত্রায় ব্যস্ত, কোলকাতার অবস্থা তখন কি? সুভাষচন্দ্র যথাস্থানেই অন্তরীণ হয়ে আছেন—এ বিশ্বাস অটুট রাখতে অবিকল পালন করা হচ্ছিল পূর্বনির্দ্ধারিত দৈনন্দিন সমস্ত কার্যক্রম। খাদ্য দ্রব্যাদিও পর্দার আড়াল থেকে দেওয়া হচ্ছিল যথানিয়মে। ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪১ প্রথম জানা গেল সুভাষচন্দ্র ঘরে নাই,—আর ২৭শে জানুয়ারী সংবাদপত্র মারফৎ সে সংবাদ প্রচারিত হতে সমগ্র বিশ্ববাসীই হ'ল স্তম্ভিত—বিস্ময়ে হতবাক্। সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবীর কাছেও গোপন রাখা ছিল সুভাষচন্দ্রের এই অন্তর্ধানের খবর। তিনি কেঁদে পড়লেন—কোথায় গেল তাঁর আদরের সুবি। উদ্বিগ্ন বোধ করেন তিনি—তবে কি সন্ন্যাসী হতে গৃহত্যাগী হল সে আবার! কিন্তু তাই বা হবে কেন? সে যে প্রতি-প্রতিবদ্ধ, সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ সে করবে না কখনো।

জনতার ঢল নামে ঘরে। পুলিশের হতভম্বকর প্রশ্ন—সুভাষচন্দ্র কোথায়? ষড়যন্ত্র করে সুভাষচন্দ্রকে সরিয়ে ফেলার অপরাধে তারা অভিযুক্ত করতে চায় বাড়ীর লোকজনদেরকে। কিন্তু এমন অভিযোগ পুলিশ কর্তৃপক্ষ জোরের সঙ্গে আদৌ করবে কি? উল্টে অভিযোগ শোনে মা প্রভাবতী দেবীর কাছ থেকে—তারা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সুভাষচন্দ্রকে; চরম শত্রু সুভাষচন্দ্র ইংরেজদের এখন, সে কারণে হয়তো বা মেরেই ফেলা হয়েছে তাকে। মুক্তি যদি নাও দেওয়া হয়ে থাকে সুভাষচন্দ্রকে, কোথায় রাখা হয়েছে তাকে, সে খোঁজ অন্ততঃ পুলিশ কর্তৃপক্ষ দিক তাদেরকে।

বড়ো বিপন্ন বোধ করেন পুলিশকর্তারা। অন্তরীণ সুভাষচন্দ্রকে আটকে রাখার দায়িত্বে ছিলেন তো তাঁরাই—তাঁর হদিশ তো তাদেরই বরং জানবার কথা—এমতাবস্থায় তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষচন্দ্রের এই অন্তর্দ্ধান একে তো বড়ো লজ্জায় ফেলেছে তাদেরকে—তার উপর এই লুকিয়ে রাখারই মাত্র নয়, মেরে ফেলার অপবাদ! বড়ো অপদস্থ বোধ করেন তাঁরা। মা প্রভাবতী দেবীর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুব একটা তো অযৌক্তিক শোনায় না। সারা ভারতের সর্বত্র, প্রতিটি বিমান ঘাঁটি, শহর বন্দর এমনকি সমুদ্রবক্ষেও চিরুণী তল্লাসী চালিয়েও সুভাষ-চন্দ্রের কোনো হদিশই করতে পারেন না তাঁরা। কোথায় পাবেন তাঁরা তাঁকে? জীবন-মৃত্যু-পায়ের-ভৃত্য সন্ন্যাসী-সৈনিক সুভাষচন্দ্র তখন তাঁদের সীমিত নাগাল পেরিয়ে শত যোজন দূরে।

লালা উত্তমচাঁদ বড়ো শ্রদ্ধা করেন সুভাষচন্দ্রকে—ভারত নওজোয়ান সভার সম্পাদক ছিলেন তিনি এক সময়—সে কারণে ইতিপূর্বে গ্রেপ্তারও বরণ করতে হয়েছিল তাঁকে—তিনি সুভাষচন্দ্রকে আতিথ্য দিয়ে ধন্য হবেন এ তো খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু এমন অবস্থায় বাধা হয়ে দাঁড়াল সুভাষচন্দ্রের ঐ মুসলমান পরিচয়। তিনি নিজে হিন্দু অথচ জীয়াউদ্দীন মুসলমান, এক হিন্দুর বাড়ীতে এক মুসলমান অতিথি হয়ে থাকবেন, সন্দেহ করবে যে লোকে—কি উত্তর হবে তার! অগত্যা এক মুসলমান বন্ধুর বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল সুভাষচন্দ্রের। পরে অবশ্য ঐ বন্ধুটি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত সব শুনে ভীত বোধ করলেন বেশ—পিছিয়েও গেলেন পুরোপুরি, রাজী হলেন না সুভাষচন্দ্রকে বাড়ীতে ঠাঁই দিতে। অগত্যা উত্তমচাঁদের বাড়ীতেই থাকলেন সুভাষচন্দ্র কয়েকটি দিন, পরমাত্মীয়ের মতো পরিবারের সবার সযত্ন আতিথেয়তা নিয়ে। পরবর্তী কালে এই আতিথ্য দানের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল উত্তমচাঁদকে—দীর্ঘ কারাবাস করতে হয়েছিল তাঁকে—সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করে একেবারে সর্বস্বান্তও করে দেওয়া হয়েছিল তাকে, এ কারণে।

সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল—মস্কো যাবেন তিনি, সহায়তা প্রার্থনা করবেন রাশিয়ার। সুভাষচন্দ্রের পূর্ববৎ রাশিয়া প্রীতি অটুট থাকলেও রাশিয়ার কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতি পূর্বপ্রীতি কাজে এলো না আদৌ। এ সময় যথেষ্ট কারণও ছিল তার। সুভাষচন্দ্র

নেতৃত্বগুণে যথেষ্টই সমৃদ্ধ কিন্তু রাশিয়ার সামরিক সহায়তা নিয়ে ভারতবর্ষকে যে স্বাধীন করতে চান তিনি সে সম্বন্ধে তাঁর পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনা কই? তাঁর রাশিয়া প্রীতির কারণে ১৯২৬ সনে তাঁকে রাশিয়াতে কম্যুনিস্ট পার্টির এক সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আরও পাঁচজন ভারতীয় নেতার সঙ্গে, এবং এরপর ১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে তাঁর সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান কালে রজনী পাম দত্তের ভাই ক্লিমেন্স দত্তকে বললেনও তিনি যে ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য রাশিয়ার সামরিক সহায়তা গ্রহণ করবেন তিনি—অথচ তাঁর লণ্ডন থিসিস-এ ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা বললেও ঐ সামরিক সহায়তার কথা উল্লেখ করলেন কই? রাশিয়া যে সামরিক সহায়তা দেবে, ভারতবর্ষ কি তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত?—সুভাষচন্দ্র তো এখন ভারতের বাইরে আর ভারতীয় নেতারা তো বরং সুভাষ-বিরোধী, এবং রাশিয়ার সহায়তা নিতে আগ্রহী নয় একবিন্দুও। এসব ছাড়াও ঠিক এ সময়ে রাশিয়া তো বরং লৌহ যবনিকার আড়ালে থেকে আপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করে গড়ে তুলতেই বেশী আগ্রহী—বিদেশকে সামরিক সহায়তা দিয়ে বিশ্বময় কম্যুনিজম্ ছড়িয়ে দেওয়াতে আগ্রহী নয় তেমন।

এসব হিসেব-নিকেশ ছাড়াও এ সময়কার আন্তর্জাতিক গতি-প্রকৃতিও ছিল না রাশিয়ার পক্ষে সুভাষচন্দ্রকে সহায়তা দানের অনুকূল। ইংরেজরা তো রাশিয়াকে সঙ্গে পেতে নানান ভাবে আবেদন জানাচ্ছিল বিভিন্ন রকমের আশু বিপদের সম্ভাবনার কথা বলে—রাশিয়ারও মনে হয় জার্মানী যে ভাবে আগ্রাসন ও অগ্রসরণ শুরু করেছে তাতে তার নিজের সরাসরি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক। তাই যদি ঘটে তো তাকে দ্বারস্থ হতেই হবে মিত্রশক্তির অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডেরও সহায়তা নিতে। সেক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রকে সহায়তা দেওয়ার অর্থ যেহেতু ইংরেজদের বিরোধিতা করা—এমন পদক্ষেপ ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকরই হবে তার পক্ষে। সুভাষচন্দ্রকে ত্যাগ করতে হল রাশিয়ার সহায়তা পাওয়ার আশা।

অগত্যা ইটালী যেতে মনস্থ করলেন সুভাষচন্দ্র। অনুমতি অবশ্য মিলল না তাড়াতাড়িতে। বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করবার পর ওখানকার রাষ্ট্রদূত সিনর ক্যারণী এবং তাঁর স্ত্রীর সাগ্রহ সহযোগিতায় সমর্থ হলেন তিনি ইটালী যাওয়ার পাশ-পোর্ট যোগাড় করতে। শুধু ইটালীই নয়, জার্মানী যাওয়ারও অনুমতি থাকল তাতে। এবার নোতুন ছদ্মনাম নিলেন তিনি—অরল্যাণ্ডো মাৎসোটা—যেন খাঁটি ইটালিয়ান একজন। এরপর আবারও একবার শেষ চেষ্টা করলেন তিনি—যদি রাশিয়ার সহায়তা পাওয়া যায়—জার্মানী যাওয়ার পথে মস্কোতে থাকলেনও কয়েকদিন, কিন্তু লাভ হ'ল না কিছুই—রাশিয়া তখন মিত্র শক্তির সঙ্গে যোগ দিতে প্রায় তৈরীই—ইংল্যাণ্ড ভীষণভাবে অনুরোধ করে চলেছে তাকে এই যোগদানে সম্মতি দিতে।

কাবুল থেকে ১৮ই মার্চ যাত্রা শুরু করে বার্লিনে পৌঁছলেন সুভাষচন্দ্র ঠিক দশদিন পরে ২৮শে মার্চ ১৯৪১-এ। এখানে পৌঁছানের পর আর তিনি নন জীয়াউদ্দীন—

নন অরল্যাণ্ডো মাৎসোটাও ; এখন থেকে আবার তিনি স্বনামে পরিচিত—সুভাষচন্দ্র বসু-ই। বীরের মর্যাদায় যথোচিতভাবে সমাদৃত হলেন সুভাষচন্দ্র কেবলমাত্র বার্লিনে নয় সমগ্র জার্মানীতেই। জার্মানী তখন একের পর এক—পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম ইত্যাদি পেরিয়ে ফ্রান্সকেও তর্কাতীত-ভাবে পর্যুদস্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইংল্যাণ্ডের উপরে—ওখানকার প্রতিটি ইঁট গুঁড়িয়ে দিয়ে সারা ইংল্যাণ্ডকেই সমুদ্রের অতলে সলিল সমাধি দিবেন—পণ করেছেন হিটলার। ঠিক এমন সময় সুভাষচন্দ্র সাহায্য প্রার্থী হলেন হিটলারের—এমতাবস্থায় সুভাষচন্দ্রের কথায় কান দেওয়ার সময় কোথায় তার।

এমন অপবাদ সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচিত হয় যে—সুভাষচন্দ্র এই যে নাৎসী পক্ষে যোগ দিলেন—এই অপরাধ-ই তো মারাত্মক। যুদ্ধ জয়ের ষোল আনা সম্ভাবনা নিয়ে অগ্রসরমান যে জার্মানী, তার সঙ্গে যোগদানের অর্থই তো ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের হটিয়ে দিয়ে তাদের সেই পরিত্যক্ত আসনে জার্মানীর তাঁবেদার হয়ে সুভাষচন্দ্রের উপবেশন করা। উত্তরে মনে রাখা দরকার—সুভাষচন্দ্র একদিনের জন্যও শ্রদ্ধাপোষণ করেননি জার্মানী সম্পর্কে ; বহুদিন জার্মানী ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে বাস করেছেন উনি—খুব কাছ থেকেই দেখেছেন জার্মানীর রাজ-নৈতিক গতি-প্রকৃতি—জার্মানীর নোতুন জাতীয়তাবাদ শুধু যে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর তাই নয়—তা হ'ল মদমত্তও। এ কথা সুভাষচন্দ্র স্বহস্তে লিখেছেন ১৯৩৬-এ। জার্মানী থেকে ফেরার পর ও-দেশটির মূল্যায়ন করেছেন তিনি—"Another dangerous Imperialist"—আরও এক ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী—এ কথা বলে। এ ছাড়া হিটলারের লেখা বই—মেইন ক্যাম্পফ—এর ভারত বিরোধী এক মন্তব্য সম্পর্কে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করে তা প্রত্যাহার করার জন্যেও দাবীও দরবার করেছেন তিনি। যেখানে বলা হয়েছে—ভারতীয়েরা স্বাধীনতা পাওয়ার পক্ষে অযোগ্য জাত একটা। সামনের দেড়শ বছরেও স্বাধীনতা পেতে পারে না এরা—এমন একটি অবমাননা-কার মন্তব্য।

কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা, তাতে জার্মানীর সহায়তা ছাড়া বৃটিশদেরকে ভারত থেকে হঠানো যাবে কি ভাবে! বর্তমানে তো বটেই, এমনিতেও জার্মানীরা তীব্র বৃটিশ-বিদ্বেষী এবং ভারতের শুভানুধ্যায়ীও বটে ; প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও তো জার্মানী যুদ্ধাস্ত্র পাঠাচ্ছিল ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। অতএব অন্য সমস্ত রকমের বিচার বাদ দিয়ে শত্রুর শত্রু, অতএব আমার মিত্র—এই নীতিমত বেছে নিতে বাধ্য হলেন তিনি জার্মানীকে—জার্মানীর নেতৃত্বে পরিচালিত অক্ষ-শক্তিকে। সমস্ত কিছুর বিচারে রাশিয়ার সহায়তাই তো কার্যকরী হত সব থেকে বেশী—এ দেশটিই ছিল তাঁর প্রথম পছন্দের—কিন্তু তারা তো কর্ণপাতই করল না তার কথায়।

বেশী দিন অবশ্য অপেক্ষা করতে হ'ল না সুভাষচন্দ্রকে। এক বিশেষ অবস্থায় পড়ে বরং হিটলারই এগিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্রের সহায়তা নিতে। রাজনৈতিক

মতাদর্শের কারণে রাশিয়ার অবস্থান অবশ্যই ইংল্যাণ্ডের বিপরীত মেরুতে—তবু রণনৈতিক প্রয়োজনে ইংল্যাণ্ড একান্তভাবে সহায়তা কামনা করে আসছিল রাশিয়ার ; রাশিয়া কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তির শর্ত মেনে নিরপেক্ষই ছিল এতদিন। এখন হিটলার তাঁর এক অবিমৃষ্যকারী আচরণে রাশিয়াকে বাধ্য করল মিত্র শক্তির পক্ষে যোগ দিতে। পশ্চিম রণাঙ্গনে বিজয় সম্পূর্ণ না হতেই অপারেশন বারবারোসা অনুসারে ২২শে জুন ১৯৪১-এ হিটলার আক্রমণ করে বসলেন রাশিয়া। এখন পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়াতে যেহেতু ব্যস্ত থাকতে হবে হিটলারকে পশ্চিম রণাঙ্গনে যদি ব্যবহার করা যায় সুভাষচন্দ্রকে মন্দ কি ? সুভাষচন্দ্র যে কট্টর ইংরেজ বিরোধী এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই হিটলারের।

সুভাষচন্দ্র খুব স্বাভাবিকভাবেই চরম বীতশ্রদ্ধ বোধ করলেন হিটলারের উপরে যদিও হিটলারের এই আহ্বান ও স্বীকৃতি আশান্বিত করে তোলে তাঁকে। বীতশ্রদ্ধ হওয়ার মূল কারণ খুব পরিষ্কারভাবেই—দুটি ; এক—এই যে ইংরাজ চরম শত্রু তার, তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করা হয়েছে কই ? ইংল্যাণ্ডকে একেবারে শেষ করে দিয়ে তবেই তো উচিত ছিল হিটলারের অন্যত্র দৃষ্টি দেওয়ার। আর দুই—জার্মানী কিনা শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করল রাশিয়াকে! তাঁর আদর্শ সমাজতান্ত্রিক এক দেশ।

এতে লাভ তো হবে না কিছুই—মাঝখান থেকে হিটলার এই কাজের ফলে অধিকতর শক্তিশালী করে তুললেন তার প্রতিপক্ষ মিত্র শক্তিকে। পূর্ব রণাঙ্গনে নোতুন করে একটা যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী করে নিজের সংহত শক্তিকে বিভাজিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কারণে যেমন নিজেকে দুর্বল করে তুললেন তিনি—তেমনি এই আক্রমণের ফলে রাশিয়াকে মিত্রশক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য করে অধিকতর সংহত করার সুযোগ করে দিলেন বিরোধীপক্ষকে। এ কি আত্মহননকারী রণনীতি সুদক্ষ সেনাধ্যক্ষ সুকৌশলী হিটলারের। সুভাষচন্দ্র গোপন রাখলেন না নিজের এই বিশ্লেষণের কথা—অকপটে এ নিয়ে আলোচনা করলেন জার্মানীর তৎসময়কার বিদেশ সচিব হের হেরম্যানের সঙ্গে।

হিটলারের সবুজ সঙ্কেত পেয়েই জার্মানীর সহায়তায় ওখানে গঠন করা হ'ল স্বাধীন ভারতীয় জাতীয় সরকার—গড়ে তোলা হ'ল আজাদ হিন্দ্ সংঘ—আফ্রিকার একাংশ জার্মানী কর্তৃক বিজিত হওয়ার ফলে জার্মানীর হস্তগত হয়েছিল যে ভারতীয় সৈন্যদল ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে তাদের মধ্যে ৪০০ জনকে নিয়ে গড়ে তোলা হল ভারতীয় লিজিয়ন। ভারতীয় সেনাদের কাছে তখন থেকে তিনি নেতাজী। আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রও গড়ে তোলা হ'ল একটা—মিঃ নাম্বিয়ারের নেতৃত্বে ও সুযোগ্য পরিচালনার গুণে যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয় কাজ করে চলল ওটি। ইংরাজী, হিন্দী আর বাংলা ছাড়াও অন্যান্য মুখ্য ভারতীয় ভাষায় নিয়মিত প্রচার কার্য চলতে থাকল ওখান থেকে ; নোতুন শব্দবন্ধ রচিত হল একটি—জয়হিন্দ। শুধুমাত্র

ভারতীয়েরা নন—অনেক অভারতীয়ও এগিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করতে।

এই যে স্বাধীন ভারতীয় জাতীয় সরকার গঠিত হ'ল সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে—এর প্রথম অধিবেশন বসল ২রা নভেম্বর ১৯৪১-এ। তেরঙ্গা পতাকা গৃহীত হ'ল একটি—পতাকার মাঝখানে যাদাম কামার অনুকরণে লম্ফনোদ্যত ব্যাঘ্রমূর্তির দৃপ্ত প্রতিকৃতি—ভারতীয় শৌর্যের তথা ভারতীয় জনগণের যুদ্ধেচ্ছার প্রতীক যেন। যোগ্য সহায়তা দিতে এমিলি শেংকল তো এগিয়ে এলেনই, এগিয়ে এলেন সেই সঙ্গে অনেক জার্মান তরুণ-তরুণীও। ১৯৬৩-এর ২৬শে জানুয়ারী বার্লিনে পালিত হল ভারতের স্বাধীনতা দিবস এঁদের সবাইকে নিয়ে।

হিটলারের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটতে খুব একটা দেরী হ'ল না সুভাষচন্দ্রের। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে হিটলার সহায়তা চাইছেন সুভাষচন্দ্রের। প্রয়োজনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে তাঁকে। সুভাষচন্দ্র রাজী হলেন না এই অনভিপ্রেত অনুরোধ রক্ষা করতে: তাঁর স্পষ্ট উত্তর—তাঁর লড়াই তো ইংরাজদের বিরুদ্ধে—ওখানে ইংরেজরা কোথায়? দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ করেন তিনি—সাম্রাজ্যবাদিতার সহায়তা করতে তো আসেননি তিনি এখানে—তাঁর লড়াইতো বরং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধেই। সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সমর্থনে লড়াই নয়—জার্মানীর সমর্থন নিয়ে সাম্রাজ্যবাদিতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছেন তিনি—তিনি এসেছেন ভারত মুক্তির সহায়তা সম্ভাবনার সন্ধানে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করবেন কোন যুক্তিতে।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা খুবই পরিষ্কার—সাম্রাজ্যবাদ সারা বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত করা আর সে জায়গায় সমাজতন্ত্রবাদ ক্রমপ্রসারিত করা। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার অর্থই হ'ল সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি এবং তা কেবল ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য সারা বিশ্বেই। সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রবাদের পথপ্রদর্শক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন সাম্রাজ্যবাদিতার পক্ষ নিয়ে তা কি আদৌ সম্ভব।

দারুণ ক্ষুণ্ণ হলেন হিটলার। কয়েকদিন মাত্র আগেই হিটলার তার সেনাবাহিনীর কাছে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় দিয়েছিলেন এই বলে যে—সুভাষচন্দ্র লড়াই করছেন চল্লিশ কোটি ভারতীয়দের স্বার্থে, যেখানে তাঁরা লড়ছেন মাত্র আট কোটি জার্মানের স্বার্থে। প্রায় সমমর্যাদায় স্বীকৃতি দিয়ে কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই না তিনি করেছিলেন এ সময়ে সুভাষচন্দ্রের—সমাপ্তি ঘটল সে সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বচ্ছন্দ সহজ সম্পর্কের।

সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহী সত্তা পোষ মানল না। জার্মানীর সম্ভাব্য সহায়তার আশ্বাস সত্ত্বেও। হিটলার তো তখন জিতেই চলেছেন একটার পর একটা যুদ্ধ—সুভাষচন্দ্র তার তাঁবেদারী করে ভারতের একচ্ছত্রাধিপতি হয়ে বসবেন—এমন বাসনা পোষণ করতেন যদি তবে তো স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করতে পারতেন এ প্রস্তাব—তা তো তিনি

করলেনই না বরং আপন আচরণের কারণে চক্ষুশূল হয়ে ওঠারও ঝুঁকি নিলেন হিটলারের। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা অর্জন—ভারতের অধীশ্বরের আসনে সমাসীন হওয়া নয়। তাঁর পরবর্তীকালীন আচরণ ও উক্তিও সমর্থন করে তাঁর এই একান্ত ও নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠতার কথা। সুভাষচন্দ্রকে এমনও অপবাদ দেওয়া হয় যে তিনি নাকি বৃটিশকে সরিয়ে জার্মানীর এবং পরে জাপানের অধীনে আনতে উদ্যত হয়েছিলেন ভারতবর্ষকে ; তা যে কত অর্থহীন তা তাঁর এ সময়কার ভূমিকায়ই প্রমাণিত।

ক্রমে বেশ বুঝতে পারেন সুভাষচন্দ্র—জার্মানীতে থেকে কাজের কাজ হবে না কিছুই। এশিয়ার প্রতিবেশী দেশ জাপান ইতিমধ্যে উঠে আসছে পরম শক্তিশালী হিসাবে—তার সহায়তা নিলে কেমন হয়। এশিয়া এশিয়দের জন্যে—এই রণহুঙ্কার তুলে প্রাচ্যভূমিতে সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তিকে প্রতিহত ও বিতাড়িত করতে কৃত-সংকল্প হয়েছে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী সর্বাধুনিক প্রগতিশীল দেশ জাপান, সুভাষচন্দ্র কি কোনও ভাবে যোগাযোগ করতে পারবেন না তার সঙ্গে। উদ্ধত অপরিণামদর্শী হিটলারের তুলনায় জাপানের সহায়তাই অনেক বেশী কাম্য এখন। সুযোগ জুটতে দেরী হ'ল না খুব একটা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্রমশঃ পশ্চিম রণাঙ্গন ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পূর্ব রণাঙ্গনে। জাপ বাহিনী একের পর এক দখল করে নিচ্ছে—ফিলিপাইন, মালয়, হংকং প্রভৃতি পূর্বএশিয় প্রতিবেশী দেশসমূহ। অবশেষে আপন শক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমেরিকার শক্ত নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দিল একেবারে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে। সরাসরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে এতদিন মিত্রশক্তির মুরুব্বি হিসাবে কাজ করছিল আমেরিকা—এখন আর দূরে থাকতে পারল না সে—এই আক্রান্ত হওয়ার ফলে ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১-এ তারাও মিত্র বাহিনীর পক্ষ সমর্থন করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হল এই অক্ষশক্তির অর্থাৎ জার্মানী, ইটালী জাপান, স্পেন প্রমুখ রাষ্ট্রসমূহের বিপক্ষে। রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান যে রাশিয়ার, তারা তো যুদ্ধের প্রয়োজনে আপাত-বন্ধুত্বের বন্ধনে মিত্রশক্তির পক্ষে ইতিপূর্বে যোগদান করে ছিলই।

এ সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জয় পরাজয়ের চিত্র মোটামুটি এই রকম—একদিকে আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট রাশিয়াতে তখন নিশ্চিতরূপে সফল প্রতিরোধে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শীতার্ত, রণক্লান্ত জার্মান বাহিনী বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত ; অন্যদিকে তখন জাপানের অগ্রগতি ঘটে চলেছে অপ্রতিহতভাবে। ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা কর্তৃক অধিকৃত পূর্ব গোলার্ধের দ্বীপসমূহের পতন ঘটছে একের পর এক। ইংরাজদের দুর্ভেদ্য দুর্গ সিঙ্গাপুরের পতন ঘটল ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২-এ ; পতন ঘটল জাভারও। জাপ বাহিনী অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বার্মা সীমান্তে ; চীনও তখন বজ্রাঘাত আক্রমণের আশংকায় থরহরি কম্পমান।

সিঙ্গাপুর দখল করে নিয়ে জাপ সেনাধ্যক্ষ ফুজিয়ারা তার বন্দী করা সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদেরকে তুলে দিলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে—উদ্দেশ্য ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করবেন না তিনি—ভারতকে ইংরাজদের হাত থেকে মুক্ত করার ভার নিক্ না কেন ভারতীয়েরা নিজেরাই। সুভাষচন্দ্র তখন জার্মানীতে থেকে পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাচ্ছেন ভারতীয়দেরকে এ জাতীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করতে;—ইংরাজ সেনাবাহিনীতে চাকুরী করা ভারতীয় সেনানীরা, যারা এখন জাপানের হাতে বন্দী—তাঁরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত তাতে—বক্তব্য তাঁদের—মরতে যখন হবেই, তখন ইংরাজদের ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে গোলাম সুলভ অগৌরবের মৃত্যুর চেয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্ত প্রাণদান—তা তো অনেক বেশী শ্রেয়। তাছাড়া বার্মা সহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তখন যে প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক ভারতীয়ের বাস, তাঁরাও তখন সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবে সম্পূর্ণভাবে সংক্রামিত। বীতশ্রদ্ধ তারা মিত্রবাহিনীর উপরে। রাজ্যপাট ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে যে "পোড়ামাটি নীতি" অবলম্বন করেছে তারা—তার ফলে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা—সব কিছুই চরম বিপর্যস্ত হয়ে বিশ্রীভাবে বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন। সুভাষচন্দ্রের আর ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর উদাত্ত আহ্বানে সোৎসাহে এগিয়ে আসেন তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই সুভাষচন্দ্র তখন অধীর অপেক্ষায় এদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দিন গুনছেন জার্মানীতে। এমন একটা সুযোগ তবে কি গ্রহণ করতে পারবেন না তিনি।

ওদিকে রাসবিহারী বসু সেই যে ১৯১৫ সালে গ্রেপ্তার এড়িয়ে ভারত ত্যাগ করেছিলেন—তখন থেকেই জাপান প্রবাসী তিনি। সুভাষচন্দ্র স্বাভাবিক কারণেই যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন তাঁর সঙ্গে। Forward Block দল তৈরী করে রাসবিহারী বসুর সক্রিয় সমর্থন প্রার্থনা করেছিলেন তিনি—তাঁর কাছ থেকে সাড়াও পেয়েছিলেন আশাব্যঞ্জক। সুভাষচন্দ্রের অভীপ্সা অনুযায়ী তিনি ব্যাঙ্ককে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করলেন একটা—১৫-২৪ জুন ১৯৪২। পৌরোহিত্য করলেন স্বয়ং। সেখানে গড়ে তোলা হ'ল আজাদ হিন্দ সংঘ এবং কিছু পরে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪২ এ আজাদ-হিন্দ ফৌজ। সুভাষচন্দ্র এ সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা হলে কি হয়, তখনো জার্মানীতে আটকে থাকার কারণে উপস্থিত হতে পারলেন না এখানে। এগিয়ে এলেন ওখানকার প্রবাসী প্রায় সমস্ত ভারতবাসীই—তেরঙা পতাকাও উত্তোলিত হ'ল সে সম্মেলনে। নোতুন দিকচিহ্ন একটি রচিত হ'ল সুভাষ অধ্যায়ে। এখানে যে গঠিত হ'ল আজাদ হিন্দ ফৌজ এরও উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—এবং সে সংগ্রাম চালানো হবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই।

ভারতে চলছে তখন এক অদ্ভুত অবস্থা; ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই ভারত সরকার অর্থাৎ বড়লাট লর্ড লিনলিথগো একতরফা সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যথেষ্টই ক্ষুণ্ণ এ কারণে, তবু নেহেরুর যুক্তি—জাপানকে রুখতে হবে, সে কারণে সহায়তা করা দরকার ইংরেজদের। গান্ধীজি মানতে রাজী নন এ যুক্তি—তাঁর বক্তব্য ইংরেজকে তাড়াতে হবে ভারত থেকে। ভারতের স্বাধীনতার কারণে তো বটেই। বাড়তি একটা যুক্তি যোগ করেন তিনি—জাপান আদৌ ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে কেন—ভারতবর্ষ তো জাপানের শত্রু নয়—তাছাড়া জাপান ভারতে সাম্রাজ্যস্থাপন করতে আসবে তাও সম্ভব নয় নিশ্চয়ই। জাপানীরা ভারতে প্রবেশ করতে চাইবে এখানে ইংরেজরা থাকলে তবেই—তাদেরকে এখান থেকেও বিতাড়িত করবার জন্যে। অতএব জাপানের ভারতে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্যই ইংরেজদেরকে তাড়ানো দরকার। আরও বললেন তিনি জাপানীরা অগ্রসর হলে যদি সেসময় ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করতে থাকে তবে তারা সে সময় অবশ্যই অবলম্বন করবে তাদের জন্যে পোড়ামাটি নীতি এবং তার ফলে অশেষ দুঃখকষ্টের সমুখীন হতে হবে ভারতবর্ষীয়দেরকে। সে কারণেও বটে,—এখনি ইংরেজদিকে তাড়ানো দরকার ভারত থেকে। পোড়ামাটি অবলম্বন করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে যে দুরবস্থার কারণ হয়েছে ইংরেজরা তাও নজির হিসাবে উপস্থাপিত করেন তিনি।

বাড়তি দুঃখজনক ঘটনা আরও একটা ঘটল এ সময়ে। মুসলিম লীগ কট্টর সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে গড়ে উঠলেও মুসলিমদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আর সুযোগ-সুবিধা নিয়েই ব্যস্ত ছিল এতদিন—এবার ঘোলা জলে ফায়দা লুঠতে দাবী করে বসল ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশনে আস্ত আলাদা রাষ্ট্রই একটা—পাকিস্তান। ইংরেজরা তো এমনটিই চেয়েছিলেন; সেই সুদূর ১৯০৬তে তাদেরই বদান্যতায় দলটি তৈরী হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের divide and rule-এর এমন সম্যক সহায়তা দেবে এই-ই তো স্বাভাবিক পরিণতি। খুঁচিয়ে ঘা বাড়াতে বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গো এগিয়ে দিলেন আগষ্ট প্রস্তাব। বিভ্রান্তি বেড়েই চলে।

ভারতবর্ষ যাতে আন্তরিক সহযোগিতা করে মিত্র-বাহিনীর স্বপক্ষে তাই ভারতীয়দের প্রতি ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতির পশরা সাজিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ক্রীপস্ মিশন এলো ১৯৪২-এর ২২শে মার্চ। সুভাষচন্দ্র অবশ্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে এ ধাপ্পায় না ভুলতে জার্মানী থেকে সতর্ক বাণী পাঠালেন বারবার; এমন অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি এর আগেও বারবার দিয়েছে ওরা সংকটে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হ'ল এ মিশন। এসময়কার 'গান্ধীজির একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—Then I have to fight Subhas'—তবে তো আমাকে সুভাষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।—ভারতে থাকতে তো সুভাষের সঙ্গে প্রায় যুদ্ধের সম্পর্কই ছিল গান্ধীজির;—তবে এমন সময় একথা কেন? গান্ধীজি যে ক্রমে ক্রমে আস্থা হারাতে সুরু করেছিলেন আপন অনুগামীদের প্রতি এবং এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগছিলেন সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ করার কারণ হওয়ার জন্যে—তা

তাঁর এই সময়কার ও পরবর্তী আরও অনেক উক্তি ও আচরণ থেকে বেশ পরিষ্কার।

অবশেষে ১৯৪২এর ৮ই আগস্ট গৃহীত হ'ল বিখ্যাত—ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব। জার্মানীতে এক অধৈর্য্য জীবনযাপন করতে করতে সুভাষচন্দ্র শুনলেন এ সংবাদ। চরম উৎসাহ বোধ করেন উনি—এমনি একটা তীব্র আন্দোলনই তো এতদিন কামনা করছিলেন তিনি। বাইরে ইংল্যাণ্ড সর্বত্র পর্য্যুদস্ত এখন—ভারতের ভেতরেও চরম আঘাতের সম্মুখীন সে। সুভাষচন্দ্র কি এখন এমনি নিষ্ক্রিয় আটকে থাকবেন জার্মানীতে। দৃঢ় নিশ্চয় তিনি এ সময় থেকে—ইংরেজ তার ভারত সাম্রাজ্য হারাচ্ছেই। জার্মানী যে এ যুদ্ধে জয়ী হবে তাব সম্ভাবনা যদিও প্রায় সম্পূর্ণই তিরোহিত এখন—তবুও ইংরাজ তার ভারত সাম্রাজ্য অন্ততঃ হারাবেই—একথা তিনি ১৯৪২-এর শরৎকালের একটি দিনে জোরের সঙ্গেই বললেন এক জার্মান এড্‌মিরাল ক্যানারিসকে। এক মুহূর্তও দেরী সইছে না সুভাষচন্দ্রের। গান্ধীজি ডাক দিয়েছেন ভারত ছাড়ো। তো সাম্রাজ্যবাদী গর্বোদ্ধত অত্যাচারী ইংরেজরা যে ভারত ত্যাগ করবে—সে ত্যক্ত শূন্যতা পূর্ণ তো করা চাই; তিনি হাঁক দিবেন—দিল্লী চলো। ভারত ছাড়ো আর দিল্লী চলোর যুগল ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হবে ভারতবর্ষে এক জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সরকার!

কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে জার্মানী ত্যাগ করবেন—রওনা হবেন জাপান তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় অঞ্চলের উদ্দেশ্যে, হিটলার কোন উৎসাহ দেখান না তাতে। এও যেন এক ধরনের অবরুদ্ধ হয়েই জীবন যাপন করা তাঁর। ইতিমধ্যে অবশ্য জার্মানীর কাছে ঋণ সংগ্রহ করে আপন সেনাবাহিনীকে বেশ খানিকটা জোরদার করেছেন তিনি, কিন্তু তাতে বর্তমানে লাভ কতটুকু—আসল কাজ তো এখন তার ভারতাভ্যন্তরে প্রবেশ এবং তা একমাত্র সম্ভব জাপানের সঙ্গে যোগ দিতে পারলে তবেই। মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পান তিনি—ভারতের স্বাধীনতা ক্রমে নিকটবর্তী হয়ে আসছে—৪২-এর আগস্ট আন্দোলনকে জাতীয় কর্মসূচীর সাফল্য সম্পর্কে কোনও সন্দেহই নাই অমন আন্দোলনই তো কাম্য তার—জাপান যাত্রা ত্বরান্বিত করে ভারতের স্বাধীনতাকে করে তুলতে হবে নিশ্চিত; যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে।

জাপান ক্রমেই এগিয়ে চলেছে ভারতের দিকে। বার্মা আক্রমণ করে তারা আকিয়াব, আরাকান, মান্দালয় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, তার মানে তো ভারত সীমান্তেই পৌঁছে গিয়েছে তারা। কিন্তু ওরা যে আর এগোতে চাইছে না—চাইছে ভারতীয়রাই সম্পন্ন করুক বাকী কাজটুকু। সুভাষচন্দ্রের মনে হয় এতো খুবই আনন্দের কথা—ভারতীয়েরা নিজেরা অন্যের সহায়তা ছাড়াই সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতের বুক থেকে বিতাড়িত করবে ইংরেজদেরকে—এ তো বড়ো শ্লাঘ্য ব্যাপার একটা। ওখানে যে রাসবিহারী বসু, ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভারতে প্রবেশ করবার—তাদের সহযাত্রী হতে, প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে—কোনোভাবেই কি জাপানে যাওয়া যাবে না এখন।

এদিকে ঘটে গেল এক দুঃখজনক ঘটনা, জাপবাহিনী নিজেরা ভারতে প্রবেশ করবে না অথচ ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনী যে কবে ভারতে প্রবেশ করবে সে ব্যাপারে তারা আগ্রহ দেখাচ্ছে না মোটেই। এক হঠকারী আবরণে ক্যাপ্টেন মোহন সিং চরম পত্র দিয়ে বসলেন জাপান সরকারকে—২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪২ সময় সীমা ধার্য করেছেন তিনি—এর মধ্যে করতেই হবে ভারত অভিযান। তাঁর এই দুর্বিনীত আচরণে জাপান সরকার ক্ষুব্ধ হ'ল খুবই—আর যাই হোক মোহন সিং তো যুদ্ধবন্দী বটে ; আটক করা হ'ল তাঁকে। রাসবিহারী বসু এই আটকের ফলে অসন্তুষ্ট হলেন ঠিকই, তবে তিনিও সমর্থন করলেন না মোহন সিং-এর এই আচরণকে। তিনি ভাবেন—আজাদ হিন্দ বাহিনী কি যথেষ্ট প্রস্তুত এই অভিযান সফল করতে। বাহিনী কি ঠিক মত সংগঠিত ও সুজ্জিত এমন একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিতে। এমনও তো হতে পারে এদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আত্মগোপন করে আছে কিছু বিশ্বাসঘাতক এবং গুপ্তচরের দল। তাছাড়া জাপানকে চটিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ এসবই বা আসবে কোথা থেকে! কেড়ে নেওয়া হ'ল মোহন সিং-এর হাত থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনাপত্য ভার—বিলম্বিত হয়ে গেল আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারতাভিযান—শুধু সৈন্য দিয়ে তো যুদ্ধ হবে না—চাই অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদ এবং সর্বোপরি সুদক্ষ সেনাপতি। রাসবিহারী বসু এমনিতেই কামনা করছিলেন সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি এখানে—এখন আরও একান্তভাবে চাইলেন তাঁর জাপানে আগমন।

সুভাষচন্দ্র জাপানে আসবেন অথবা আসবেন না, এ নিয়ে জাপানীদের আদৌ মাথা-ব্যথা ছিল না প্রথম দিকে, রাসবিহারী বসুই স্বীকৃত নেতা তাদের চোখে, তাছাড়া জাপানীদের বিচারে সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বা পরীক্ষিত সুযোগ্য নেতৃত্বগুণ সমন্বিত এমন কিছু নন তখনো। এ সময় রাসবিহারী বসুর আগ্রহাতিশয্যে জাপান সরকার রাজী হ'ল সুভাষচন্দ্রকে জাপানে আনানোর ব্যবস্থা করতে—রাসবিহারী বসু চান—আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করুন সুভাষচন্দ্র। আর সুভাষচন্দ্র তো এখানে আসার জন্যে রাসবিহারী বসুকে অনুরোধ জানিয়েই রেখেছিলেন। সুভাষচন্দ্র আবেদন জানিয়ে রেখেছেন ওনার কাছে তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। রাসবিহারী বসু উদ্যোগ নিলেন সুভাষচন্দ্রকে জাপানে আনবার জন্য। জাপান সরকারকে অনুরোধ জানালেন তিনি—জার্মানীর বার্লিনস্থিত জাপ অ্যামবাসেডর ওশিমা প্রথমে জার্মান বিদেশ দপ্তরের কর্তা রিবেনট্রপকে এবং পরে সরাসরি হিটলারকে আবেদন জানালেন এ ব্যাপারে। সম্মতি মিলল হিটলারের সুভাষচন্দ্রকে জাপানে যেতে দেওয়ার। শুরু হ'ল আবারও এক দুঃসাহসিকতা পূর্ণ দীর্ঘ যাত্রা। আগের বারের ভারত ত্যাগ ছিল গোপনে স্থলপথে—এবারও গোপনেই, তবে জলপথে।

জার্মানী থেকে জাপান—ঐ যুদ্ধকালীন সময়ে স্থলপথে পাড়ি দেওয়ার কোনও

প্রশ্নই ওঠে না, বিমান পথও অনুরূপ বিপদসঙ্কুল, শেষপর্যন্ত জার্মানীর সাবমেরিনে সওয়ার হয়ে সমুদ্র অতিক্রম করবার ব্যবস্থা করা হ'ল সুভাষচন্দ্রের। এবারকার সঙ্গী হলেন—অবিদ হাসান। পথ কি একটুখানি! শত্রুর বেড়াজাল এড়িয়ে ইংল্যাণ্ডের উত্তরদিকে নর্থ সি পেঁ"ছে আয়ারল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্ত থেকে সোজা দক্ষিণে গিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে তার পরে পাড়ি দিতে হবে পুরো ভারত মহাসাগর এবং কিছুটা প্রশান্ত মহাসাগর তবেই না পেঁ"ছানো যাবে জাপানে। কেবলমাত্র কি দীর্ঘপথের বাধা—পথের অনেক জায়গা জুড়েই তো রয়েছে—বোমা, মাইন, টর্পেডো ইত্যাদির সম্ভাব্য আক্রমণ—এবং এ ছাড়াও কত কিছুর আশংকা; দুর্যোগ, যান্ত্রিক গোলযোগ, সামুদ্রিক জন্তুর উৎপাত—এমনই কত কিছু।

মৃত্যুভয় তুচ্ছ করেও আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে জীবন পণ যাদের, এ সব বাধা বিপদ তো তুচ্ছ অর্থহীন তাঁদের কাছে—তাই এসব কিছু উপেক্ষা করে সুভাষচন্দ্রের শুরু হল—দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা। প্রায় সাড়ে চার মাসে সম্পূর্ণ হল এ যাত্রা। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩-এ জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা ও বিমান যাত্রা করে পৌছলেন তিনি টোকিওতে, উহ্য থাকল এই ক'মাস ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রশ্ন আর বিশ্রামের প্রয়োজন। মাঝে সমুদ্রবক্ষে মাদাগাস্কারে সাবমেরিন বদল করতে হল একবার—২৮শে এপ্রিল। রবারের ডিঙ্গিতে করে মাঝ সমুদ্রে বাহন পরিবর্তন, সেও কি ভয়ঙ্কর কম। শেষ পর্যায়ে সামান্য একটুখানি যাত্রাপথ মাত্র ছিল কিছুটা স্বস্তির —সুমাত্রার সাবং-এ পৌছে ছিলেন তিনি সাবমেরিনের সাহায্যে—ঐ সাবং থেকে টোকিও পর্যন্ত গেলেন বিমান পথে। শুধু সামরিক ইতিহাসেই নয়, অন্য যে কোনো বিচারেই এমন দীর্ঘ সাবমেরিন যাত্রা রীতিমত বিরল ঘটনা একটি। দুর্গমগিরি কান্তার মরু লঙ্ঘন করেছিলেন তিনি তাঁর প্রথমবারের মহানিষ্ক্রমণে—ভারত থেকে জার্মানী;—এবার পার হলেন দুস্তর পারাবার—এই দ্বিতীয় বারের মহাযাত্রায় জার্মানী থেকে জাপান।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল তাঁর ১৮ই জুন, ১৯৪৩-এ। তিনি সাদরে বরণ করলেন সুভাষচন্দ্রকে। টোকিও থেকে প্রথম বেতার ভাষণ দিলেন তিনি ২১শে জুন ১৯৪৩-এ। ব্যাঙ্ককে ১৫—২৪ জুন ১৯৪২-এর ঐতিহাসিক সম্মেলন তো আগাম আমন্ত্রণ জানিয়েই রেখেছে তাঁকে, বাইরে থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে রাসবিহারী বসু তো অনেকদিন থেকেই তৈরী তাঁর হাতে সমগ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীর তথা আজাদ হিন্দ সরকারের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার তুলে দিতে। ওখানে পেঁ"ছে পরম স্বস্তি বোধ করলেন সুভাষচন্দ্র! দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকার পর ঈপ্সিত কর্মভার পেতে চলেছেন তিনি—পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ায় যে প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক ভারতীয়ের বাস—তাঁদের পরম কাম্য নেতা তিনি এই মুহূর্তে। আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনার আশ্বাসে উৎফুল্ল হন তাঁরা।

এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ প্রবাসী ভারতীয় ও স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের চরম দুরবস্থা

তখন। জাপান আক্রমণে পরাজিত হয়ে পলায়নপর ইংরেজরা ও মিত্রবাহিনীর অন্যান্যেরা ওই সব অঞ্চলে ধ্বংস করে দিয়েছে রাস্তাঘাট সেতু যানবাহন ঘর বাড়ী নষ্ট করেছে, খাদ্য দ্রব্যাদিও অর্থাৎ অবলম্বন করেছে পোড়ামাটি নীতি, যাতে জাপানীরা ও অঞ্চলে এলে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ফলে অসুবিধা হচ্ছে ঐ সব অধিবাসীদেরও। অক্ষমনীয় এই অপরাধের হোতা তাদের পূর্বপ্রভুদের পরম শত্রু হিসাবে আবির্ভূত সুভাষচন্দ্র তাদের সামনে—তাদের আশা, সুভাষচন্দ্র তাদেরকেই মাত্র উদ্ধার করবেন তাই নয়—সগৌরবে ভারতে প্রবেশ করে সমর্থ হবেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে।

একটা সুন্দর অনুকূল আদর্শ অবস্থা হাতে পেলেন সুভাষচন্দ্র। ইংরাজ পলাতক এখান থেকে—ভারত পর্যন্ত এদের পিছু ধাওয়া করতে পারলে ভারত থেকেও এদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এখানকার সবাই বরণ করে নিয়েছে তাঁকে নেতা হিসাবে, অকুণ্ঠ সহযোগিতা তিনি পাচ্ছেন সবার কাছ থেকে—সুশিক্ষিত বেশ বিরাট এক সৈন্যবাহিনী অপেক্ষমান তার জন্য—ওদিকে ভারতে এখন দুর্বার ভারত ছাড়ো আন্দোলন—শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা—ইংরেজদের ভারত ছাড়া হতে দেরী নাই আর। সব মিলিয়ে এমন অনুরূপ অবস্থা কখনো আসেনি আগে। ভারত ছাড়ো-র সঙ্গে দিল্লী চলো যুক্ত হলে—ইংরেজরা আদৌ টিকে থাকতে পারবে ভারতে, সাধ্য কি তাদের।

জার্মানীতে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং স্বাধীন সংকারও একটি। তার আমলে জাপানেও গড়ে তোলা হয়েছিল এক স্বাধীন সরকার এবং একটি সেনাবাহিনীও। সিঙ্গাপুরে ইংরাজদের পতন হলে জাপান সেনানায়ক ফুজিয়ারা যে প্রায় চল্লিশ হাজার বন্দী ভারতীয় সৈন্যদেরকে তুলে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে—এসব উল্লিখিত হয়েছে। এখন ঐ যে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদল নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪২-এর ১লা সেপ্টেম্বর তা সম্পূর্ণতঃই আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হল সুভাষচন্দ্রের হাতে। বন্দী সৈন্যদের থেকে নানা কারণে কিছু বাদ পড়ে আবার তার সঙ্গে কিছু যুক্ত হয়ে এখনও ঐ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার।

সেই যে স্কটিশচার্চ কলেজে ছাত্রাবস্থায় প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন তিনি সমরশিক্ষার, যার নকল প্রয়োগও করেছিলেন তিনি ১৯২৮-এ কোলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে, এখন তারই সফল প্রয়োগ করার সুযোগ পেলেন তিনি এই সুগঠিত বাহিনীর শীর্ষনেতা রূপে। অবশ্য ইতিমধ্যে জার্মানীতে থাকাকালীন অনেক প্রাগ্রসর পাঠ নিয়েছেন তিনি সমরবিদ্যার। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিতাড়িত হওয়ার বৎসর খানেক পরে যোগ দিতে চেয়েছিলেন তিনি ৪৯ নং বেঙ্গল ব্যাটেলিয়নে, এক সাধারণ সৈনিক হতে—নির্বাচিত হননি ; কেম্ব্রিজে ছাত্র থাকাকালীন Officers' Training Course-এ যোগ দিতে চেয়েছিলেন তিনি

সেনানায়ক হতে—অনুমতি পাননি, আর বর্তমানে সামান্ত সেনানী না, সম্মানীয় সেনানায়কও নয়—একেবারে অসামান্ত সর্বাধিনায়ক সেনাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হলেন তিনি—এক সুশিক্ষিত স্বদেশপ্রেমী সৈন্তবাহিনীর।

টোকিও পে'ৗছেই আদৌ কাল বিলম্ব না করে সুভাষচন্দ্র হাজির হলেন সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ এর ২রা জুলাই। ওখানে ওই দিন থেকেই পালিত হতে শুরু হ'ল সুভাষ সপ্তাহ। সামরিক, বেসামরিক, সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্যাপৃত থাকলেন সুভাষচন্দ্র। এরই মধ্যে ৪ঠা জুলাই রাসবিহারী বসু ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতির পদ ছেড়ে বৃত করলেন সুভাষচন্দ্রকে সেই পদে। ওই দিনই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের আর পরদিনই অর্থাৎ ৫ই জুলাই ১৯৪৩-এ সুভাষচন্দ্র পরিদর্শন করলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। আকাশ-বাতাস মুখরিত হ'ল 'নেতাজী জিন্দাবাদ' জয়ধ্বনিতে, আর নেতাজী ওদেরকে নোতুন মন্ত্র দিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে—দিল্লী চলো। ২৫শে আগস্ট ১৯৪৩ অর্থাৎ বাহিনীর প্রতিষ্ঠার প্রায় পুরো একবৎসর পরে গ্রহণ করলেন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কের ভার আর তার প্রায় দু'মাস পরে ২১শে অক্টোবর ১৯৪৩-এ ঘোষিত হ'ল আনুষ্ঠানিকভাবেই আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রতিষ্ঠা। জাপান জার্মানী ইত্যাদি মূলতঃ অক্ষশক্তির শরিক মোট নয়টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিল এ সরকারকে।

আজাদ হিন্দ-সরকারের কাজ শুরু করতে বেছে নেওয়া হল ক্যাথে-ভবন—আর এরই অদূরে পাদাং-এ প্রতিষ্ঠা করা হ'ল আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রথম সদর দপ্তর। আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস অর্থাৎ ঐ ২১শে অক্টোবরই স্থিরীকৃত হ'ল সিঙ্গাপুর থেকে দিল্লী যাওয়ার পথ—'দিল্লী চলো'-র পথ সংকেত—মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, আর বর্মার উপর দিয়ে বিস্তৃত সেই পথ দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ্ সরকার কর্তৃক মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পালা—এটা করা হ'ল ঠিক দুদিন পরে—২৩শে অক্টোবর ১৯৪৩-এ। ক্ষুধা তৃষ্ণা, রক্তপাত এমনকি মৃত্যুভয় পর্যান্ত উপেক্ষা করে নিঃশর্ত অনুসরণে কৃতসংকল্প এখন সবাই সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে। একমাত্র লক্ষ্য তাদের—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। সুভাষচন্দ্র আকুল প্রার্থনা রেখেছেন তাদের সামনে—তোমরা আমাকে রক্ত দাও; আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেব।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হ'ল অন্তান্ত প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনার কথা। আবারও সচকিত বিস্ময়ে অভিভূত হ'ল সারা বিশ্ব; এ কি সব অবিশ্বাস্য কাণ্ড সুভাষচন্দ্রের! ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ছিল সেই একই উষ্মা আর আশংকা—সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার অজুহাতে আসলে বিকিয়ে দিতে চাইছেন জাপ সরকারের কাছে। এসময় অবশ্য তাঁদের এ জাতীয় অপবাদ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তরই বা কি—এতদিনকার নিষ্ক্রিয়তা এমন করে নাড়া খেলে এজাতীয় অপবাদ ছড়ানোর আড়ালে মুখরক্ষা করাই তো স্বাভাবিক। ভারত ছাড়ো আন্দোলন

ঈশ্বর অথবা অরাজকতার হাতে সমর্পণ করে দিয়ে সেই যে অন্তরীণ হতে গিয়েছিলেন গান্ধীজি—তা ঈশ্বর তো সে আন্দোলন ভার তুলে নিয়ে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার কোনো চারা রাখেননি—অরাজকতাই গ্রাস করেছে তাকে। এমতাবস্থায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা। এর থেকে অধিকতর অনভিপ্রেত ব্যাপার হয় নাকি কিছু! ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে সুভাষচন্দ্রকে আদৌ ভাগ বসাতে দেওয়াই যেখানে পরম কুণ্ঠার ব্যাপার একটা, সেখানে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার—অসম্ভব একেবারে। নেতারা সুভাষচন্দ্রকে ভুল বুঝলেন যতো না, জনগণকে ভুল বোঝালেন তার থেকে ঢের বেশী।

জার্মানী যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী একথা জেনেও সুভাষচন্দ্র সহায়তা প্রার্থনা করে-ছিলেন তার, ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে। জাপানেরও দ্বারস্থ হতে হয়েছে তাঁকে একই কারণে এক বিশেষ ঐতিহাসিক পটপ্রেক্ষায়। জাপান এশীয় দেশ, প্রতিবেশী ভারতবর্ষের—যে কোনও পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে সমানে পাল্লা দেওয়ার মতো শক্তিধর সে, তাছাড়া এশিয়া এশিয়দের জন্যে—এ রব তুলে সমস্ত শ্বেতাঙ্গদেরকে সে তাড়াতে বদ্ধপরিকর সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড থেকে। সুভাষচন্দ্রেরও তো প্রায় একই বক্তব্য—জাপানকে এ কাজ সহায়তা দান অথবা তার সহায়তা গ্রহণ—তার কিনা এই ব্যাখ্যা। বিমর্ষ বোধ করেন সুভাষচন্দ্র, সহায়তা গ্রহণ মানে অধীনতা স্বীকার, এ বড়ো সস্তা সরলীকরণ, ভ্রান্ত সমীকরণ। ভারতীয় অধিবাসীবৃন্দের তথা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এই মিথ্যা আশংকা নিরসন করতে সচেষ্ট হলেন সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন উপায়ে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী প্রায় ত্রিশ লক্ষাধিক ভারতীয়দের নয়নমণি এখন সুভাষচন্দ্র। তাঁর অত্যুগ্র উন্মাদনা, অতুলন জাতীয়তাবোধ, অবিসম্বাদী নেতৃত্ব গুণ সম্মোহনী সমৃদ্ধ ভাষণ এবং নিঃসংশয় দার্ঢ্যে সমগ্র ভারতীয়েরাই অত্যুৎসাহে উদ্বেল। জনবল, ধনবল, মনোবল সব কিছুই আহৃত হতে থাকে অজস্রধারায়। শুধু ভারতবর্ষেরই নয়; সমগ্র দূর প্রাচ্যেরও স্বপ্নময় স্বর্ণসম্ভাবনার ভাষাচিত্র রচিত ও প্রচারিত করে অশেষ জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ আসনে উপনীত এখন তিনি। ভারত ভূখণ্ডে কিন্তু পাল্লা দিয়ে নিন্দিত করা হচ্ছে তাঁকে—ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন তাকে আবার পরপদানত করতে উদ্যত হয়েছেন সুভাষচন্দ্র—এই অজুহাতে। ভারতবাসীদের মনে প্রয়োজনীয় রেখাপাত করতে ব্যর্থ হ'ন সুভাষচন্দ্র, বেতার মারফৎ সমস্ত আবেদনই তার অর্থহীন বোধ হয় ভারতবাসীদের কাছে। উল্টে এমন অপবাদ এ সময় দেওয়া হতে থাকল সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে তিনি নাকি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অত্যাচার করছেন তাদের উপরে—অর্থ সংগ্রহও করছেন অন্যায়ভাবে জোরজুলুম করে। ইংরেজরা এমন অপবাদ দেবেন আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়—দুর্ভাগ্য, ওরা একথা যত না বললেন তার থেকে অনেক বেশী সোচ্চারে বললেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ!

ওদিকে দূরপ্রাচ্যে পূর্ণোদ্যমে সার্থক পরিণতি প্রাপ্ত হচ্ছে সুভাষবাহিনীর আসন্ন

সক্রিয় যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুতি পর্ব। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে আবারও মতদ্বৈধতা। বর্তমান জাপ সেনাধ্যক্ষ তেরাউচি চাইছেন, আসল যুদ্ধ করুক জাপানী সেনাবাহিনী; ভারতীয় সৈন্যরা থাকুক পিছনে সহায়ক সৈন্য হিসাবে। সুভাষচন্দ্র চাইছেন—তা কেন! ভারতীয় সৈন্যেরা নিজেরাই করবে এ লড়াই—জাপ প্রস্তাব তো রীতিমত অবমাননা-কর তাদের পক্ষে, তেরাউচির যুক্তি, জাপসৈন্য কষ্টসহিষ্ণু, দেশপ্রেমী, জয়ের উৎসাহে তরতাজা—আর সে তুলনায় ভারতীয়েরা অলস, আরামপ্রিয়, ভাড়াটে মনোভাবাক্রান্ত পরাজয়ের গ্লানিতে হতোদ্যম, হয়তো বা ওদের মধ্যে আছে কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরও। সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ করেন ভারতীয় সৈন্য সম্পর্কে এ জাতীয় আত্মমর্য্যাদা হানিকর উক্তির। অবশেষে তাঁরা অবশ্য যৌথভাবেই অংশ-গ্রহণ করলেন যুদ্ধে—আর অল্পকাল মধ্যেই জাপানীরা যথোপযুক্ত পরিচয় পেলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর।

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা হ'ল আজাদ হিন্দ বাহিনীকে। একে পাঁচটি শাখায় ভাগ করে প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে রাখা হল এক-একজন দক্ষ সেনা-ধ্যক্ষকে—যুদ্ধ পরিকল্পনা, সৈন্য প্রশিক্ষণ ও সামরিক গোয়েন্দা। এর দায়িত্বে থাকল 'জি' শাখা-অধিকর্তা মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ খান, সৈন্য পরিচালনা ও তৎ-সংক্রান্ত নির্দেশনামা। এর জন্য তৈরী হল 'এ' শাখা, দায়িত্বে কর্ণেল এম. এন. ভগৎ, বাহিনীর আবাসন বব্যস্থা, গোলাবারুদ, পোষাক, রসদ ইত্যাদি—এর জন্য গড়া হল 'কিউ' শাখা—দায়িত্বে কর্ণেল কে. পি. থিমায়া, মেডিক্যাল শাখার দায়িত্বে থাকলেন মেজর জেনারেল এ. ডি. লোগানাথন; আর শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হল লেফ্‌টনান্ট কর্ণেল জাহাঙ্গীরকে।

সেনাবাহিনী ভাগ করা হ'ল তিনটি ডিভিশনে—এক নম্বর ডিভিশনের কম্যাণ্ডার হলেন মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানী। এই ডিভিশনের অধীনে গড়া হল তিনটি রেজিমেণ্ট—গান্ধী রেজিমেণ্ট, আজাদ রেজিমেণ্ট আর নেহেরু রেজিমেণ্ট, আর এই রেজিমেণ্টসমূহের কম্যাণ্ডারেরা হলেন যথাক্রমে আই কিয়ানী, গুলজারা সিং এবং আজিজ আহমেদ খান। আর একটা বাহিনী তৈরী করা হল সম্পূর্ণ মহিলাদেরকে নিয়ে—রাণী অফ ঝাঁসি বাহিনী, এর কম্যাণ্ডার হলেন লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ও লক্ষী স্বামীনাথন।

নেতাজী ইংরেজ-বিদ্বেষী, বিরোধী ও বিদ্রোহীও; কিন্তু ভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি তিনি বিদ্রোহী হলেও বিদ্বেষী বা বিরোধী যে নন তার তিনি প্রমাণ রাখলেন এই অভাবনীয় নামকরণের মাধ্যমে। একবিন্দুও কার্পণ্য নেই তাঁর মনে তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করাতে। গান্ধীজি প্রথম নম্বরের প্রতিপক্ষ তাঁর, প্রত্যক্ষতঃ তাঁর ভারতত্যাগের কারণ তিনিই—তা হোক, তবুও তো গান্ধীজি-গান্ধীজিই—তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ভাবা যেতে পারে না আদৌ;—আবুল কালাম আজাদ, তাঁর সভাপতিত্বে বহিষ্কৃত হয়েছেন

তিনি কংগ্রেস থেকে, তা হোক কিন্তু কি উদার মুসলিম তিনি—মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন, মুসলিম লীগের উগ্রতার মুখে দাঁড়িয়েও কি অসীম উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় রেখে চলেছেন তিনি ; আর নেহেরু - এই অগ্রজ রাজনীতিকটি আধুনিক ভাবধারায়, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি আন্তর্জাতিক, কি সাংস্কৃতিক সমস্ত ব্যাপারে কতই না সমমতাবলম্বী তাঁর। মাঝপথে তিনি না হয় ত্যাগই করেছেন, কিন্তু বর্তমান ভারতীয় নেতৃত্বের বিচারে কোন্ না গান্ধীজির ঠিক পরেই তাঁর স্থান নারীশক্তি ও নারীমুক্তির অন্যতম প্রবক্তা সুভাষচন্দ্র ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকেও স্মরণ করতে ভুল করলেন না এ সুযোগে।

ঠিক হ'ল তিনটি বাহিনী থেকে বাছাই করে সেরা সৈন্যদেরকে নিয়ে প্রাথমিক ভাবে পাঠানো হবে যুদ্ধযাত্রায়,—করাও হল তাই। সুভাষ অনুরাগীরা সুভাষচন্দ্রের পৌনঃপুনিক আপত্তি অগ্রাহ্য করেই তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবশতঃ এ বাহিনীর নাম দিল সুভাষ ব্রিগেড। যুদ্ধকার্য্যে নিয়োজিত হয়েই দুর্জয় সাহসিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে সুরু করল এ বাহিনী। বৃটিশ সেনাবাহিনীর মুখোমুখি প্রথম হলেন তাঁরা আরাকান ফ্রণ্টে,—৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪-এ। ১৮ই মার্চ বর্মাসীমান্ত অতিক্রম করে প্রথম ভারতের মূল ভূখণ্ডের মাটিতে পদার্পণ ঘটল তাঁদের এম. জেড. কিয়ানীর নেতৃত্বে আর ২১শে মার্চ ঘোষিত হল জাতীয় দিবস কারণ ওই দিনে অধিকৃত হ'ল ভারতের ছোট্ট একটি ভূখণ্ড—বিজয়ের স্মারক হিসাবে গৃহীত হল ওই দিনটি। সিঙ্গাপুর থেকে সরিয়ে রেঙ্গুনে সামরিক দপ্তর ও আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান দপ্তর স্থাপন করে চলতে থাকে এসব যুদ্ধযাত্রা। এক ঝটিকা আক্রমণে একদিনে পতন ঘটল ভারত সীমান্তে মওডকে অবস্থিত বৃটিশ সামারিক ঘাঁটির। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তীর্ণ করা হ'ল সেখানে সগৌরবে এবং ১৯৪৪ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সগর্বে বাত্যান্দোলিত হতে থাকল সে পতাকা। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিজয়রথ বজ্র-নির্ঘোষে এগিয়ে চলে সর্বত্র, একে একে বিজিত হতে থাকে বিপক্ষ বাহিনী মনিপুরে—কোহিমায় মাইরাং-এ ; আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্য এ. সি. চ্যাটার্জীকে নিযুক্ত করা হল অধিকৃত অঞ্চলের গভর্ণর। সর্বত্র সগর্বে উত্তোলিত হতে থাকে ভারতের জাতীয় পাতাকা—লক্ষ্য ইম্ফল দখল করে আপাততঃ বিষেণপুর পর্য্যন্ত এগোনো। ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায় দেড়শত মাইল এগিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক বাহিনী, সাময়িকভাবে হলেও স্বাধীনতার স্বাদ পেল এ অঞ্চলগুলি। এর আগেই অধিকৃত হয়েছিলেন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৩-এ,—সুভাষচন্দ্র নোতুন নামকরণ করলেন তার—স্বদেশ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিজয়যাত্রা ভারতে ভীষণভাবে নিন্দিত হচ্ছে তখন। ভারতের মূল ভূখণ্ডে ভারত ছাড়ো ওরফে আগস্ট আন্দোলনের তখন কাণ্ডারীহীন হয়ে নাভিশ্বাস অবস্থা, আর সে পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের এ অভিযান অভিনন্দিত

হবে—তা কখনোই সম্ভব নয়। ও তো সুভাষচন্দ্র আসছেন না—আসছে তোজোর কুত্তা, কুইসলিং একটা ; ওকে প্রতিহত করাই বরং বেশি দরকার। সুভাষচন্দ্র মরীয়া হয়ে আবেদন করে চলেন ভারতবাসীর এই ভুল ভাঙাতে, বিশেষ করে গান্ধীজির উদ্দেশ্যে। এ সময় এও বললেন তিনি—ইংরাজরা বিতাড়িত হওয়ার পর ভারতীয় জনগণই ঠিক করবে কি ধরনের সরকার তাঁরা চান, আর তার নেতাই বা হবেন কে, —সমস্ত আবেদনই ব্যর্থ হয় সুভাষচন্দ্রের।

এদিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বচ্যুত হয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল হলে কি হয়, যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রতিশ্রুত সাহায্য কিন্তু ইংরেজ সরকার ভারতের কাছে পেয়ে যাচ্ছিল যথারীতি। এই স্ববিরোধী অচিন্ত্যনীয় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সরকারও তার কূটকৌশল বলে যথেষ্ট পরিমাণে সক্ষম হয়েছে ভারতবাসীদের মনে এক মিথ্যা ভয় সংক্রামিত করে দিতে—জাপানকে রুখতে হবে। এ কারণেও বটে সুভাষচন্দ্রের আবেদন ব্যর্থ হল ভারতীয়দের মনোভাব বদলাতে, তাদের মিথ্যা সংশয় ও আশংকা দূর করতে। সুভাষচন্দ্র এ সময় আবেদন জানাচ্ছিলেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে সম্ভাব্য ভারত ভাগ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেও। ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে শোনা গেল এমনি এক বেতার ভাষণ—আবেদন জানাচ্ছেন তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে : যেন মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপস রফা করে ভারতের অখণ্ডতা রক্ষিত হয়।

আর বেশী দূর এগোতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র। একটার পর একটা নানান রকমের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে—প্রাকৃতিক, আর্থিক, সমরনৈতিক, সাংগঠনিক সব কিছুই ক্রমাগত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে তাঁর। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা হিসাবে এল ভরা বর্ষা। নদীনালা উঠলো ভরে—এই অবস্থায় বনজঙ্গল এড়িয়ে খরস্রোতা নদনদী পেরিয়ে স্বচ্ছন্দ অগ্রগমন সম্ভব হচ্ছিল না আর। এর উপর আবার দেখা দিল যানবাহন সমস্যা। মিত্রশক্তি অবলম্বিত পোড়ামাটি নীতি সত্ত্বেও যাও-বা যানবাহন পাওয়া যাচ্ছিল, এখন তাও অপ্রতুল হয়ে উঠল জাপানের নিজস্ব প্রয়োজনে ওসব ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার কারণে। আমেরিকা যুদ্ধ করে চলেছে খোদ জাপানে এবং তৎসংলগ্ন দ্বীপসমূহে—তাই এখানকার সব যানবাহন সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল ওখানে।

সঙ্গে যুক্ত হ'ল খাদ্য সমস্যা—কারণ একই, সেই পোড়ামাটি নীতি। শুধু সামরিক বাহিনীই নয়, বেসামরিক জনগণও শিকার হতে সুরু হ'ল অশেষ দুর্ভোগের। সুভাষচন্দ্রকে যে সহায়তা দান করবেন এই সব অসামরিক ব্যক্তিবর্গ—তাদের সে সামর্থ্য ক্রমে কমে আসতে থাকে। যুদ্ধাস্ত্রের অনটনও দেখা দিল একই কারণে। এমনিতে ট্যাঙ্ক, মর্টার জাতীয় ভারী অস্ত্র সুভাষচন্দ্রকে দেওয়া হয়নি—যে হালকা অস্ত্রশস্ত্রও বা দেওয়া হয়েছিল—এখন টান পড়তে থাকে তাতেও। সব মিলিয়ে বড়ো বেহাল অবস্থা এখন সুভাষচন্দ্রের।

ক্রমে মনোবল ভাঙতে থাকে সুভাষবাহিনীর এবং জনসাধারণেরও। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, খাদ্যাভাব, আর্থিক অনটন—এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল ওখানকার মিশনারীদের সক্রিয় বিরোধিতা ও অপপ্রচার। ওঁরা সুচতুর সতর্কতায় সমর্থ হলেন অনেকের মনেই বিশ্বাসঘাতকতার বীজ অনুপ্রবেশ করাতে। নিজেরা ধর্মীয় ছদ্মবেশের আড়ালে বিশ্বাসঘাতকতা তো করছিলই। এমন সময় আবার আর্থিক অনিয়মের ঘটনা ঘটবারও উপক্রম দেখা দিল। বেসামরিক জনগণের মনোবল তো ভাঙছিলই, এখন ভাঙতে শুরু করল সামরিক বাহিনীর মনোবলও। আর এ সময় কি গভীর নিষ্ঠায়ই যে সুভাষচন্দ্র সচেষ্ট হলেন ধরে রাখতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের মনোবল। অমানুষিক পরিশ্রম ওনাকে করতে হল এ সময়ে; সাধ্যমত সমস্ত রণাঙ্গনেই সশরীরে উপস্থিত থাকবার চেষ্টা করলেন, স্বহস্তে আহত আর মুমূর্ষুদের সেবা আর চিকিৎসার ভার তুলে নিলেন—আপনার অন্ন অন্যের সঙ্গে সমভাগে গ্রহণ করছেন—সর্বাধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও স্বহস্তে পরিচালন ভার তুলে নিচ্ছেন কোনো কোনো রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধেরও,—আর এরই ফাঁকে উদাত্ত ভাষণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা তো করছেনই। কিন্তু অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে গেল যে—আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্যে হয়তো বা কোনো পঞ্চম বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে -এমন আশংকারও শিকার হতে হ'ল সুভাষচন্দ্রকে।

এই প্রসঙ্গে এ সময়কার একটা ব্যাপার ভাবলে খুবই অবাক হতে হয় যে, ইতিমধ্যে বাংলার বুকে ঘটে গেল যে মনুষ্য সৃষ্ট মন্বন্তর, দারুণ দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-এ, সে খবর শোনামাত্রই লক্ষাধিক টন চাল পাঠানোর ব্যবস্থা তিনি করলেন ভারতবর্ষে—তৎকালীন ভারত সরকার অবশ্য অমানবিকতার পরিচয় দিয়েই প্রত্যাখ্যান করল সে খাদ্যসহায়তা। সুভাষ-বিরোধিতার আবিল অন্ধত্ব তখন এমনি করেই আচ্ছন্ন করেছিল ভারতবর্ষের সবাইকে।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে বিরত থাকলেন না সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজিকে জাতির জনক সম্বোধন করে আবেদন রাখলেন তিনি বেতার মারফৎ সম্ভবমত সহায়তা করতে এগিয়ে আসতে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব গুণ, কর্মদক্ষতা ইত্যাদির কারণে গান্ধীজি বর্তমানে খুবই গুণমুগ্ধ তাঁর, কিন্তু এ ব্যাপারে অসহায় বোধ করেন তিনি। ২০শে নভেম্বর ১৯৪৪ চিঠি লিখলেন সুভাষচন্দ্র রাশিয়াকে ওই একই কারণে সহায়তা প্রার্থনা করে, কিন্তু রাশিয়াই বা সাহায্য করবে তাকে কোন্ যুক্তিতে? হতে পারে সুভাষচন্দ্রকে সহায়তা করার অর্থ জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করে আমেরিকার বিরাগভাজন হওয়া নয়, কিন্তু এর অর্থ সরাসরি ইংরাজ বিরোধিতা তো বটেই। রাজনৈতিক মতবাদের বিচারে তাদের অবস্থান যাই হোক না কেন, বর্তমান যুদ্ধকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সম্পর্কের বিচারে ঠিক এই মুহূর্তে এমন সহায়তার সম্ভাবনা কোথায়! আবেদন রাখলেন তিনি আমেরিকার কাছেও—আমেরিকা তো নিখাদ গণতন্ত্রের পূজারী—আর ভারতবর্ষ তথা তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী তো লড়াই করছে

ভারতে গণতন্ত্রেরই স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, আমেরিকা কি সাহায্য করবে না এই সংকট সময়ে ? কিন্তু বাস্তব বিচারে এ আশা ছিল আরও অমূলক—সুভাষচন্দ্র তো লড়াই করছে জাপানের প্রত্যক্ষ সহায়তা নিয়ে আর আমেরিকা তো বর্তমানে জাপানের সঙ্গেই সরাসরি লড়াইয়ে লিপ্ত, কাজেই এ সময়ে আমেরিকার পক্ষে সুভাষচন্দ্রকে সহায়তাদানের অর্থ তো আত্মবিরোধিতা—তা সম্ভব হবে কি ভাবে? এ ছাড়াও এখন ইংল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ অভিভাবকত্বের দায়িত্বে আসীন আমেরিকা। সুভাষচন্দ্রের সহায়তা করে ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতা করা, সে তো অসম্ভব আরও বেশী। এ সব কথা বাদ দিলেও নয়। সাম্রাজ্যবাদের স্বাদগন্ধের হদিস এ সময়ে পেয়ে বসে আছে আমেরিকা—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে সামিল হওয়া এখন আর সাজে না তার। স্বাভাবিকভাবেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এসব আলোচনার সময়ে জাপ কর্তৃপক্ষ উৎসাহ দেখায় না আদৌ।

অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করার ফলে আপন পরাজয় সম্ভাবনাই কেবলমাত্র ত্বরান্বিত করেনি। হতাশ করেছিল সুভাষচন্দ্রকে—জাপানও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আপাত নিরপেক্ষ আমেরিকাকে খুঁচিয়ে তুলে বিশ্বময় সংকটাপন্ন করে তুলেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা আর গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত রাখার প্রশ্ন।

শূন্যোত্থিত আতসের দশদিকই শূন্যতায় ভরা এখন—শূন্যে দেদীপ্যমান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তিনি এখন, একা নিঃসঙ্গ।

সুভাষচন্দ্র আবারও একবার শেষ চেষ্টা করলেন ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। অবশেষে হতোদ্যম নিরুপায় সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে পাঠাতে সমর্থ হলেন তাঁর কিছু বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দকে,—আশা, যদি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে সুফল কিছু পাওয়া যায়। এই প্রতিনিধিবৃন্দ সমর্থও হলেন কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে—কিন্তু লাভ হ'ল না কিছুই। সুভাষ সমর্থকেরা নিরুপায় বোধ করেন নিজেদেরকে—আর সুভাষ-বিরোধী যাঁরা তাদের সেই একই মনোভাব—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, এর থেকে অধিকতর অনভিপ্রেত আর কিছু হয় নাকি ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এ সময় আমূল বদল গেল মিত্রশক্তির অনুকূলে। রাশিয়া আক্রমণের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সেই যে জার্মানীর দুর্দিনের সূচনা তার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিস্বরূপ—১৯৪৫-এর ১৬ই জানুয়ারী বার্লিনের এক বাঙ্কার-এ ৫০ ফুট মাটির নীচে আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন হিটলার; আর প্রায় সাড়ে তিন মাস সেখানে থাকবার পর অবশেষে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করলেন ৩০শে এপ্রিল শেষরাত্রে ৩টা ৩০ মিনিট-এ অর্থাৎ ১লা মে ১৯৪৫-এ। কিছুদিন আগে থেকেই লক্ষ্য করছিলেন তিনি তাঁর এতদিনকার বিশ্বস্ত সঙ্গী গোয়েরিং আর হিমলার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে

উদ্‌গ্রীব, একান্ত বিশ্বস্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একমাত্র গোয়েবেলস আছেন তাঁর সঙ্গে। ওদিকে রণে ভঙ্গ দিয়ে সুইজারল্যাণ্ড পালানোর পথে ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৫-এ মিত্রবাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন ইটালির মুসোলিনি, চরম অবজ্ঞায় তাঁর মৃতদেহ রেখে দেওয়া হ'ল এক পতিতালয়ের সামনে। ১৯৪৫-এর ৭ই মে রাত দেড়টার সময় হিটলারের স্বনিযুক্ত উত্তরাধিকারী দোয়েনিৎজ নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ করলেন জেনারেল আইসেন হাওয়ারের কাছে তার দাবী মত।

জাপান এর পরেও চালিয়ে যাচ্ছিল তার লড়াই—কিন্তু ৬ই আগস্ট ১৯৪৫-এ হিরোসিমায় আর ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা যথাক্রমে লিটিল বয় আর ফ্যাটম্যান ফেলে প্রায় লক্ষাধিক নিরীহ নরনারীকে হত্যা করল যখন আমেরিকা, আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল জাপানও। ১০ই আগস্ট ১৯৪৫-এ, আর সে আত্মসমর্পণ চূড়ান্ত হল ১৫ই আগস্ট ১৯৪৫-এ। ইতিমধ্যে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে রেখেছিল ১৩ই এপ্রিল ১৯৪১-এ, মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তা ভঙ্গ করে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো—৮ই আগস্ট ১৯৪৫-এ।

একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে নিরুপায় হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁকেও অবশ্য তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর পরাজয়ের কাহিনী শুনতে হচ্ছিল কিছুদিন আগে থেকেই। ২রা মার্চ ১৯৪৫-এ পোঁপায় পাঁচজন অফিসার পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের অধীনস্থ সমূহ আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীকে, ২রা এপ্রিল ১৯৪৫ পিছু হঠেছেন সায়গল, আর ১১ই এপ্রিল বন্দী হয়েছেন ধীলন আর শাহনওয়াজ খান। নানান কারণে আজাদ হিন্দ বাহিনী যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল সে কাহিনী আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি—বর্তমানে জাপান আত্মসমর্পণ করাতে সুভাষচন্দ্রের নতুন উদ্যমে পুনরায় এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে গেল।

১২ই আগস্ট ১৯৪৫-এ সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র বসলেন আপন বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে নিয়ে। তখনো বিশ্বাস তাঁর এর পরেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব; যুক্তি রাখলেন তিনি—রাশিয়ার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ জাপ-বিরোধিতা হলেও তা কোনো অর্থেই আজাদ হিন্দ সরকারের বিরোধিতা নয়;—তাছাড়া যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কে যে দিকে মোড় নিতে চলেছে—তাতে এমনও সম্ভব হতে পারে যে রাশিয়া হয়ত সরাসরিই সাহায্য করে বসবে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। তাছাড়া পরাজয় মাত্রেই যে হতোদ্যম হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে হবে তারও কোনো মানে নেই। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই তো ইংল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হচ্ছিল দারুণভাবে—কই, সে দেশ তো হাল ছাড়েনি, আর তা ছাড়েনি বলেই তো আজ তারা জয়ী। হাল ছাড়বেন না সুভাষচন্দ্রও। এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর, সুসময় আসবেই।

আত্মসমর্পণ করবে না তার আজাদ হিন্দ বাহিনী। অন্যান্যেরা উৎসাহে ভরপুর কিন্তু আশাবাদী হতে পারেন না এতখানি—যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য কই, কই গোলাবারুদ, রসদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি।

বাস্তবতার যুক্তিতে এ সময় সুভাষবাহিনীর সেনানীরা এমন কথা বললেও এর ঠিক আগে সুভাষচন্দ্র যখন সেনাধ্যক্ষেরা বিশেষতঃ তাঁর ক্যাবিনেটের সদস্যেরা কে কোন ফ্রণ্টে যুদ্ধে যাবেন অথবা আদৌ যাবেন কিনা—এ প্রশ্ন রাখছেন তখন একমাত্র জে. কে. ভোঁসলে ছাড়া বাকী সবাই তাঁদের নেতা সুভাষচন্দ্রের উপরে সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নির্দ্বিধায় প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত জানিয়ে দিলেন—এমনই ছিল তাঁদের শ্রদ্ধা ও আস্থা সুভাষচন্দ্রের প্রতি।

অবেশেষে অনেক আলোচনার পর প্রস্তাব রাখলেন সুভাষচন্দ্রই—আত্মসমর্পণ করবেন উনি—শেষ হয়ে গেল আজাদ হিন্দ ফৌজের এক গৌরবময় অধ্যায়। ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ খান, ক্যাপ্টেন বাগড়ি, মেজর ধীলন, জেনারেল কিয়ানী জেনারেল ভোঁসলে, জেনারেল সায়গল, চ্যাটার্জী, কর্ণেল হবিবুর রহমান, দেবনাথ দাস, প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রমুখ সেনানী ও সুভাষ সমর্থকদের মরণপণ সংগ্রামের গৌরবময় সাফল্যের সোনালী দিনের স্মৃতি, বৃটিশ বাহিনী তথা মিত্রশক্তিকে তর্কাতীতভাবে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে যাওয়ার গৌরব, আর বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের অকাতর সহায়তা দিয়ে সেই অগ্রগমনের উন্মাদনাপূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হওয়ার সুন্দর মুহূর্তগুলি।

আত্মসমর্পণ অর্থে সুভাষচন্দ্র সরাসরি সশরীরে ধরাই দিতে চান মিত্রবাহিনীর হাতে; পালাতে বা লুকোতে চান না নিজেকে—এতে পুরোপুরি লাভ ছাড়া ক্ষতির কিছুই দেখতে পান না তিনি। ইংরাজ সরকার যদি মৃত্যুদণ্ড দেয় তাঁকে, সে অন্যায় হত্যা তো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করতে পারবে নোতুন করে ভারতে বিদ্রোহের বারুদে অগ্নিসংযোগ করতে, আর যদি জীবিত ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে, তবে তিনি আবার নোতুন করে পূর্ণোদ্যমে শুরু করতে পারবেন স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাঁর মনে হয় ভারতের জনগণ যথেষ্ট পরিমাণেই বিপ্লবের জন্য তৈরী এখন; যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মাত্র তা ব্যর্থ হচ্ছে বারবার। মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন উনি ভারতের স্বাধীনতা আর বড়ো জোর বছর দুই দূরে। সায় দিতে পারেন না অন্যেরা—তাঁরা দৃঢ় নিশ্চয় সুভাষচন্দ্রের এ ধরনের আত্মসমর্পণের অর্থ অবশ্যই প্রাণদণ্ড—আর মৃত্যু তা যতো বড়ো উদ্দেশ্যই সাধন করুক না কেন—তা তো মৃত্যুই। তাঁদের প্রিয় নেতার মৃত্যুর মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা ক্রীত হবে, ভাবতে পারেন না তাঁরা—সুভাষচন্দ্রের এই স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ সমর্থন করতে পারেন না একজনও।

পরিবর্তে সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবন নিরাপদ করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল সুভাষচন্দ্রের এক মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটানোর। ১৯৪২ সালেও সুভাষচন্দ্রের গতিবিধি গোপন করতে গৃহীত হয়ে ছিল ঠিক এমনই এক উপায়। বর্তমান জাপ সেনাধ্যক্ষ

তেরাউচির নির্দেশক্রমে তাঁর অধীনস্থ সেনাপতি কর্ণেল টাডা আর ছিকারীকিকানের প্রধান জেনারেল ইসোদা উদ্ভাবন করলেন এই অভিনব পরিকল্পনা। এর ফলে সুভাষচন্দ্র যেমন নিরাপদ হবেন, তেমনি জাপ সরকারও বাঁচবে মিত্রশক্তির দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার হাত থেকে—সুভাষচন্দ্রকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তারা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না তাদেরকে। সুভাষচন্দ্র অবশ্য প্রথম প্রথম কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না এমন একটা প্রস্তাবে সায় দিয়ে আপন অনুচরবর্গকে পরিত্যাগ করে একাকী নিরাপদ হতে—অবশেষে অবশ্য রাজীই হলেন উনি।

রটনা করা হল পূর্ব পরিকল্পনা মতই। ২৩শে আগস্ট ১৯৪৫-এ জাপ নিউজ এজেন্সী প্রচার করল—১৮ই আগস্ট কর্ণেল হবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে ফরমোজার বর্তমান তাইওয়ানের—তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে টোকিও যাত্রার সময়ে এক বিমান দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র মারা গিয়েছেন তাইপের নানমন সাউথগেট সামরিক হাসপাতালে। তাইপের বিমান বন্দরে তেল নিতে নেমেছিল সে বিমান। তারপরই উড়ান শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে বিমানটির একটি পাখা খারাপ হয়ে যাওয়ায় বিমানটি ভেঙে পড়ে। বিমানটি অবশ্য আসছিল সায়গন থেকে—ওখানে আগের দিন অর্থাৎ ১৭ই আগস্ট ১৯৪৫-এ বিকাল ৫টা ৫ মিনিটে ছেড়েছিল সে বিমান, আর তাইপের বিমান বন্দরের অদূরে ভেঙে পড়েছিল ১৮ই আগস্ট বিকাল ২টার সময়; আর সুভাষচন্দ্র মারা গিয়েছেন ঐ দিনই রাত ৮টা ৩০ মিনিট-এ—মতান্তরে ৯ ঘণ্টা পরে ১১টার সময়। আরও প্রচারিত হ'ল—কর্ণেল হবিবুর রহমানও ছিলেন ঐ বিমানে, তবে তিনি জীবিত আছেন এখনো। তাঁর একটি হাত সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মাত্র। পরের খবর কর্ণেল হবিবুর রহমানই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন সুভাষচন্দ্রের এবং তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে চলে গিয়েছেন টোকিওর উদ্দেশ্যে—ওখানকার রেনকোজী মন্দিরে রক্ষিত আছে সেই চিতাভস্ম।

কংগ্রেসের সেনাপত্য ভার হাতে নিয়ে ভারতের বুকে প্রকৃত বিপ্লব শুরু করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। বিপ্লব সংগঠন করা অধরা-ই থেকে গেল তাঁর—বিদ্রোহী হতে বাধ্য করা হ'ল তাঁকে। ভারতবর্ষ থেকে শেষবারের মত প্রবাস যাত্রা করে অন্তর্হিত হওয়ার দিন পর্যন্ত আইনের চোখে আক্ষরিক অর্থে বিদ্রোহী-ই হয়ে থাকলেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আবারও একবার ভারতাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চেয়ে বেহাল আগস্ট আন্দোলনের হাল ফেরানোর ক্ষীণ আশা নিয়ে হয়তো বা হতেও পারতেন সার্থক বিপ্লবী একজন—সে আশাও পূর্ণ হ'ল না তাঁর। বিদ্রোহী হয়ে জন্ম সুভাষচন্দ্রের; বিদ্রোহী হওয়াই বিধিলিপি যাঁর—বিপ্লব সংগঠিত করতে চেয়ে বিপ্লবী হওয়ার সাধনায় ব্যর্থ হবেন বারবার তিনি—এই-ই তো স্বাভাবিক। বিমান দুর্ঘটনায় যদি তিরোধান ঘটেই থাকে সুভাষচন্দ্রের তবে তাতো তাঁর আজন্ম বিদ্রোহপনার সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণই। এতে তাঁর চরিত্রের আতস-বাজীর যে দ্যোতনা পাওয়া যায়—হোক্ না তা আইক্যারাসের মতো মৃত্যু আলিঙ্গন-

কারী—তাতো ছিল সূর্য্যস্পর্দ্ধী। উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়া অকিঞ্চিৎকর স্ফুলিঙ্গের ক্ষণকালীন আনন্দের অভিব্যক্তিতে সীমায়িত নয় তা—বিশ্ব সমলয়ে চিরস্থায়ীভাবে সংস্থাপিত হওয়ার জন্য উৎক্ষেপিত সে জ্যোতিষ্ক—সেখানে তাঁর অশরীরী উপস্থিতি চির অম্লান; অগ্নিনিঃস্মরণ করেছে তা যথাসময়ে, আলো বিতরণ করে চলেছে আজও।

সুভাষচন্দ্রের দৈহিক উপস্থিতি বা কোনো কিছুতে সক্রিয় অংশগ্রহণের কাহিনী আর শোনা যায়নি এর পরে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে সত্যিই তিনি মারা গিয়েছিলেন এই বিমান দুর্ঘটনায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে ভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাঁর প্রসঙ্গ, তাতে নিশ্চিত হতে পারল না বিশ্ববাসী তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে। একদল ব্যক্তি তো এখনো মনে করেন এই শতবর্ষে আজও জীবিত তিনি।

এমনি করে সম্পূর্ণ হয়ে গেল এক মহাজীবনের অসমাপ্ত অধ্যায়, শেষ অঙ্কে যার অজস্র দৃশ্য। কোলকাতা, কাবুল, মস্কো, বার্লিন, টোকিও, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন এবং আরো হাজারো খ্যাত ও অখ্যাত গুরুত্বপূর্ণ পথ বাহিত হয়ে ক্রমে ধোঁয়াশায় ধূসর হয়ে গেল তাঁর অগস্ত্যযাত্রা। বিরাট প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে যবনিকা নেমে এল তাইপেতে আর তার পরিণতির নিঃসংশয় সমাপ্তিকরণের দায় বহন করা চলেছে আজও।

নেতাজী—মৃত ?

সুভাষচন্দ্র সত্যিই কি নিহত হয়েছিলেন তাইপে-র বিমান দুর্ঘটনায় ? এমন এক দুর্ঘটনার কাহিনী এর আগেও একবার রটানো হয়েছিল—১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্রের গতিবিধি গোপন রেখে মিত্র-বাহিনীকে বিভ্রান্ত করতে—তখনও বলা হয়েছিল সুভাষচন্দ্র মারা গিয়েছেন এক বিমান দুর্ঘটনায় ; মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছিল সে রটনা। তাই বলে যে এবারকার রটনাও মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে, এমন কোনো যুক্তি নেই, কিন্তু এবার যেহেতু পরিকল্পিতভাবে রটানো হয়েছে এ কাহিনী, সে কারণে মিথ্যা হওয়াই তো স্বাভাবিক। তার চেয়ে বড়ো কথা—ঘটনার এত পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য প্রমাণ রাখা হতে থাকল যে—রটনাটি যে কাকতালীয়বৎ ঘটনাই হয়ে যেতে পারে—তা বিশ্বাস করতে পারল না অনেকেই। উদ্দিষ্ট বিমান দুর্ঘটনাটি আদৌ ঘটেছিল কিনা, তাই নিয়ে যেখানে দেখা দিয়েছে সন্দেহ, সেক্ষেত্রে সেই বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু বিশ্বাসযোগ্য হবে কিভাবে !

এই ঘটনা অবিশ্বাসকারীদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে প্রথমেই নাম করতে হয় তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেলের। ২৩শে আগস্ট জাপ রেডিও প্রচার করল এ মৃত্যুসংবাদ, আর ভারতীয় সংবাদ পত্রে তা প্রচারিত হ'ল ২৪শে আগস্ট অর্থাৎ পরদিনই, অথচ ওই দিনই অর্থাৎ ২৪শে আগস্ট ১৯৪৫এ লর্ড ওয়াভেল তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর এই অবিশ্বাসের কথা। এবং পরে ঐ বৎসরই ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রকাশ্যেই এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলেন উনি। শুধুমাত্র উনিই নন, ঐ সময়কার ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি অকিনলেক্ তাঁর নিজের ডায়েরীতে লিখলেন—এবারও ধরা গেল না সুভাষচন্দ্রকে—আবারও চোখে ধূলো দিয়ে চলে গেলেন তিনি !

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরপরই গঠিত হয়েছিল তিন তিনটি কমিশন—এ ব্যাপারে সত্যাসত্য নিরূপণ করবার জন্য—একটা গঠন করলেন লর্ড ওয়াভেল স্বয়ং—আর একটা করলেন আমেরিকার স্বনামখ্যাত সেনাধ্যক্ষ ম্যাকআর্থার—আর তৃতীয়টি করলেন তৎকালীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় রণাঙ্গনের সেনাধ্যক্ষ লর্ড মাউন্টব্যাটেন। নেতাজী নিশ্চিতরূপে মৃত—এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল না এই তিনটি কমিশনের কোনো একটির থেকেও। বিতর্ক চলছে আজও।

ও সময়কার সমস্ত রকমের সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত নথিই জাপ সরকার নষ্ট করে ফেলেছিল—কিন্তু মিত্র বাহিনীকে বিভ্রান্ত করতেই হয়তো বা অক্ষত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল—জাপ-সরকারের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংযোগ রক্ষা করত যে জাপানী সংস্থা, সেই হিকারী—কিকানের একটি দলিল। আলোচ্য দলিলে যা পাওয়া গেল—তাতে করেও সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কিত রহস্য সমাধান হবে কি বরং বেড়ে গেল।

স্বয়ং গান্ধীজিই কি বিশ্বাস করেছিলেন তৎকালে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দমদমে এক ভাষণে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ তো দূরস্থান—তিনি যে জীবিত, এ কথাই ঘোষণা করলেন উনি। পরে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে গৌহাটিতে এক প্রার্থনা সভায় এবং পরমাসেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এও আবার বললেন—সুভাষচন্দ্র জীবিত এখনো—উনি ছদ্মবেশে আছেন এবং যথাসময়েই ফিরে আসবেন ভারতবর্ষের বুকে। এরপর অবশ্য আর অমন কথা বলেননি উনি বরং এপ্রিল ১৯৪৬-এ হরিজন সংখ্যায় লিখলেন সুভাষচন্দ্র জীবিত নেই—এমন কথা। কোনও সাক্ষ্য প্রমাণের উল্লেখ ছিল না এ লেখায়—এ কারণে হঠাৎ এ জাতীয় একটি লেখা প্রকাশের পেছনে অন্য কারও হাত বা স্বার্থ আছে এমন অনুমান করেন অনেকে।

জওহরলাল নেহেরুর সে সময়কার ধারণাও কিন্তু খুব স্পষ্ট নয় এ ব্যাপারে। ২৭-এ আগস্ট ১৯৪৫এ বলছেন তিনি—সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু আমাকে দুঃখ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্বস্তি দিয়েছে তার চেয়েও বেশী—অথচ ঐ বৎসরই ২৫শে ডিসেম্বর চিঠি লিখলেন তিনি ইংল্যাণ্ডে মিঃ এটলি-কে—রাশিয়া যে আশ্রয় দিয়েছে সুভাষচন্দ্রকে, এটা কিন্তু ঠিক কাজ হয়নি ওদের। এ ছাড়াও ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন জওহরলালকে অনুরোধ জানাচ্ছেন ভারতের শাসনভার নিয়ে নেওয়ার জন্যে তখন তিনি তাঁকে এই বলে রাজী করাতে সচেষ্ট হচ্ছেন যে, সুভাষচন্দ্র এসে পড়তে পারেন ভারতবর্ষে—তাই তাঁর এই প্রত্যাগমনের আগেই ভারতের শাসনভার নিয়ে নেওয়াই শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ভারতবর্ষকে দান করার সময় সীমা ছিল জুন ১৯৪৮-এ। এ ছাড়াও ১৯৬২ সালের ১৩ই মে সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শ্রী সুরেশ চন্দ্র বসুকে যে চিঠি লিখলেন জওহরলাল, তখনই বা নিশ্চিতভাবে তিনি জানাতে পারলেন কই, যে সুভাষচন্দ্র মৃত। তখন তো তাঁরই নিয়োজিত শাহনওয়াজ কমিটি জানিয়েই দিয়েছে তাদের বক্তব্য—যে সুভাষচন্দ্র মৃত।

সুভাষচন্দ্র মারা গিয়েছেন বলা হচ্ছে ১৮ই আগস্ট ১৯৪৫ সালে, অথচ তাঁর বেতার ভাষণ নাকি শোনা গিয়েছে ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৫-এ একবার এবং আবারও ১৯৪৬-এর জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসেও। কোলকাতা রাজভবনের সে সময়কার রেডিও মনিটার মি· কর-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর সে বক্তব্য রেকর্ডও করা হয়েছিল সে সময়ে এবং তাঁর সে ভাষণ ছিল ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে। বলেছিলেন তিনি—ভারতের স্বাধীনতা খুবই নিকটবর্তী—বড়ো জোর বছর দুই দূরে, আমি জানি আপনারা আমার প্রতীক্ষায় আছেন—যথাসময়েই ইতি কর্তব্য করব আমি।

হায়! তাঁর অনুমান মতো যথাসময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতির কারণে ভারতীয়দের যে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা—তা আর পূরণ হ'ল কই!

ভারতীয় জনমানস থেকে সুভাষস্মৃতি নিঃশেষে অপসৃত করতে একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস সক্রিয় ছিল বরাবরই—এখন এই মৃত্যু সংবাদ স্বস্তি এনে দিল তাঁদের মধ্যে।

স্বয়ং জওহরলাল তো স্বকণ্ঠে স্বীকারই করলেন সে কথা। নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ বাহিনী ভারতের বুকে এগিয়ে আসছে যখন, তখন জওহরলাল তলোয়ার হাতে সর্বাগ্রে থেকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন তাঁকে। এখন সুভাষচন্দ্রের এই মৃত্যু তো অপ্রতিহত করে তুলেছে তাঁর অগ্রগমন,—কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে অবশ্যই মৃত, অভ্রান্ত প্রমাণ কই তার।

জনগণ যে অবিশ্বাসীর সুরে কথাবার্তা বলছে, মুখ বন্ধ করা চাই তাদের—অতএব সুভাষচন্দ্র যে অবশ্য মৃত, তা প্রমান করতে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হ'ল ১৯৫৬ সালে শাহনওয়াজ খানের নেতৃত্বে। এই শাহনওয়াজ-খাঁ ৫ই আগস্ট ১৯৫৫ সালে এক সভায় এক বে-সরকারী কমিটি গঠন করবার কথা ঘোষণা করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কিত সত্যতা তদন্ত করতে; এবং তাতে সদস্য হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন উনি সুভাষাগ্রজ শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু ও বিশিষ্ট আইনজীবী ডঃ রাধাবিনোদ পালকে। জহরলাল নেহেরু যখন শাহনওয়াজের নেতৃত্বে সরকারীভাবেই এ কমিটি গঠন করলেন ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে, তখন কিন্তু সুরেশ বসুর শত অনুরোধ সত্বেও ডঃ রাধাবিনোদ পালের ঠাঁই হ'ল না সে কমিটিতে—সে জায়গায় এলেন শ্রী এস. এন. মৈত্র। জওহরলালের বক্তব্য—ডঃ পাল নাকি নিরপেক্ষ হতে পারবেন না, তার কারণ ও সময় তিনি বলছেন—যে ওই বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারটা ঠিক নয়। এ জাতীয় মনোভাব দৃঢ়তার সঙ্গে পোষণ করার কারণে কিনা কে জানে ডঃ পালকে শেষ জীবনে সরকারী উদ্যোগেই হেনস্থা করা হয়েছিল অবিশ্বাস্যভাবে।

সে যাই হোক, এই কমিটি রিপোর্ট দাখিল করলেন যথাসময়ে, পরিষ্কার সিদ্ধান্ত সে কমিটির সুভাষচন্দ্র মৃত ঐ বিমান দুর্ঘটনায়। কমিটির অন্যতম সদস্য সুভাষচন্দ্রের দাদা শ্রী সুরেশ চন্দ্র বসু অবশ্য আলাদা রিপোর্ট দিলেন The Dissentient Report এই নামে একখানি পুস্তিকার মাধ্যমে। তাঁর বক্তব্য এই মূল রিপোর্টের বিরোধী। শাহনওয়াজ খান সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন মোট ৬৭ জনের যাদের প্রায় প্রত্যেকেরই আগের থেকেই ধারণা—বরং বলা চলে বিশ্বাস-সুভাষচন্দ্র ওই বিমান দুর্ঘটনায় মৃত। সাক্ষ্য নেওয়া হ'ল এক নার্সের যিনি দাবী করলেন—তিনি অগ্নিদগ্ধ সুভাষচন্দ্রের শুশ্রূষা করেছেন। আর সাক্ষ্য নেওয়া হ'ল জেনারেল আকাই নামক এক ব্যক্তির যিনি দাবী করলেন—তিনি নাকি ছিলেন ঐ বিমানে সুভাষচন্দ্রের সহযাত্রী। এই কমিটির সদস্যেরা অবশ্য যেতে পারলেন না আসল ঘটনাস্থলে—রাজনৈতিক বাধা থাকার কারণে।

The Dissentient Report-এ সুরেশচন্দ্র বসু বললেন—এই কমিটি যথেষ্ট দায়িত্ব-শীলতার সঙ্গে পালন করেননি তার কর্তব্য। তাইহোকু—অর্থাৎ আসল ঘটনাস্থলে যাওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থাদি অনেকখানি এগিয়েও শেষ মুহূর্তে ঐ অকুস্থলে যাওয়ার যথেষ্ট আগ্রহ দেখায়নি এই কমিটি—সাক্ষ্যও ঠিকমত গ্রহণ করা হয়নি সংশ্লিষ্ট

সকলের—এবং সর্বোপরি প্রাসঙ্গিক কিছু দলিলপত্র ও ফটো চিত্রাদি যাচাই করা হয়নি ঠিকমত—এমনকি এদের মধ্যে কয়েকটি দেখানোই হয়নি তাঁকে।

অতএব পুরানো বিতর্কের নিরসন তো হ'লই না, বরং সন্দেহ ঘনীভূত হয় ;—সুভাষচন্দ্র আদৌ মৃত কিনা। কর্নেল হবিবুর রহমান পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে গিয়েছেন এ সময়ে। তথাকথিত দুর্ঘটনায় পতিত শেষ বিমান যাত্রায় সুভাষচন্দ্রের সহযাত্রী তিনি—তিনি ইতিমধ্যে বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন উল্টো কথাবার্তা। ১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে লাহোরের এক পত্রিকায় প্রকাশিত লেখায় বললেন তিনি, বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তিনি ইতিপূর্বে যা বলেছেন, তা ঠিক নয়। 'পুরানো বক্তব্য প্রত্যাহার করে বললেন তিনি, সুভাষচন্দ্র যে মারা গিয়েছেন—এ কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছিল তাঁকে। বিমান দুর্ঘটনা একটা হয়েছিল ঠিকই তবে সুভাষচন্দ্র ছিলেন না তাতে। সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি—সহযাত্রী ছিলেন মৃত্যু সময়ে পর্যন্ত তাঁর,—শুধু তাই নয় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে তার চিতাভস্ম বয়ে নিয়ে গিয়েছেন জাপানে। তিনি যদি এমন কথা বলেন—সন্দেহ তো বাড়বেই। সুভাষচন্দ্রকে মিথ্যা মৃত ঘোষণা করবার মধ্যে সরকারের কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে এমন সন্দেহ বাসা বাঁধে অনেকের মনে।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রিত্ব সময়ে আবার কমিশন গঠিত হ'ল একটা—১৯৭০ সালে পাঞ্জাব হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জি. ডি. খোসলার নেতৃত্বে—এবার সদস্য অবশ্য উনি একাই। ওনার অবশ্য তাইহোকুর ঘটনাস্থলে যেতে কোনও অসুবিধা হয়নি—উনি সাক্ষ্য নিলেন ২২৪ জনের এবং দীর্ঘ চার বৎসর সময় নিয়ে ১২৫ পাতার বিশদ রিপোর্ট দাখিল করলেন ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এনার প্রতিবেদনে দেখা গেল যত না তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তার তুলনায় বেশী অপ্রাসঙ্গিকভাবে সুভাষচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য। স্বাভাবিকভাবেই উনিও অবশ্য রায় দিলেন সুভাষচন্দ্র মৃত। এ নিয়ে আবারও সুরু হ'ল তুমুল বিতর্ক। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে গেল এর পরেও।

১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে জনতা দলের প্রধান মন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই ঘোষণা করলেন—সুভাষচন্দ্রের তিরোধান সম্পর্কে আগের সিদ্ধান্তসমূহ যে চূড়ান্ত—তা বিশ্বাস করা সরকারের পক্ষে কষ্টকর। এরপর আরও এক জনতা দলের প্রধান মন্ত্রী শ্রী ভি. পি. সিংহ তো এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে আবারও একটা কমিশন গঠন করা হবে—এমন কথা বললেন। তেমন কোনও কমিশন অবশ্য বসানো হয় নি তাঁর অল্পকাল মধ্যে প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে বিদায় নেওয়ার ফলে। এরপর প্রধানমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রশেখরও তাঁর বিদেশ মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্র কুমার গুজরালের সহায়তায় সুরু করবার উদ্যোগ নিলেন এ সম্পর্কে খোঁজ খবর করবার কিন্তু তাঁর ও ঐ স্বল্প সময় মধ্যে কার্যকাল শেষ হওয়ার কারণে কার্যকরী করা হ'ল না কিছুই।

অনেকের অনুমান—ও সময়ে নাকি সুভাষচন্দ্র জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা

হয়নি আদৌ। এ অনুমান অবশ্য অসংগত নয় একেবারে, কারণ জাপান তো ইতিপূর্বে আত্মসমর্পণ করেছে, আর শেষ পর্যন্ত যখন ঠিকই হয়েছে সুভাষচন্দ্র আত্মসমর্পণ করবেন না, আত্মগোপন করবেন, তখন জাপানে যাওয়া তো অর্থহীন, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। এদের বক্তব্য তিনি নাকি পাড়ি দিয়েছিলেন রাশিয়ার উদ্দেশ্যে। এ ধারণার মূল প্রবক্তা—সুভাষচন্দ্রের দুই একনিষ্ঠ অনুগামী—শ্রী সমর গুহ ও শ্রী সত্যনারায়ণ সিংহ। তাঁরা তাদের বিভিন্ন লেখায় নানান যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রকাশ করতে সচেষ্ট যে সুভাষচন্দ্র ও-সময় গিয়েছিলেন রাশিয়াতেই। একেবারে প্রথমের দিকে রাশিয়াতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন যখন, তখন তিনি বলেছিলেন যে তার কাছে এমন খবর আছে যা চমকে দেবে সবাইকে—তখন খবরটা যে কি তা তো জানার চেষ্টাই করা হ'ল না উল্টে তড়িঘড়ি তাঁকে সরিয়েই নেওয়া হ'ল সেখান থেকে। ডঃ রাধাকৃষ্ণনও প্রথমের দিকে ছিলেন রাশিয়াতে ভারতের রাষ্ট্রদূত—হয়তো তিনিও জানতে পারতেন কোনো খবর, কিন্তু সে ভাবে কখনো তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হয় নি কিছু।

সুভাষচন্দ্র যে ও সময়ে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে পারেন—এ অনুমান অসঙ্গত নয় একেবারে। রাশিয়া তখনো মিত্রশক্তির শরিক হলেও—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সে দেশ—তার মিত্রশক্তির শরিক হওয়া সাময়িক সমরনৈতিক সিদ্ধান্ত মাত্র—তা ছাড়া সুভাষচন্দ্র কোন না অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করেন রাশিয়া সম্বন্ধে। রাশিয়া কি প্রতিদান দেবে না তার এই রাশিয়া প্রীতির। তা ছাড়া জাপান আর রাশিয়া দুই বিপরীত মেরুর শরিক হলেও তাদের পারস্পরিক শত্রুতার সম্পর্ক তো প্রায় নকলই। ১৩ই এপ্রিল ১৯৪১-এ অনাক্রমন চুক্তি সাক্ষরিত করে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কেই তো এরা বাস করছিল এত দিন—আর এই ৮ই আগষ্ট ১৯৪৫-এ রাশিয়া যে দিন যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপানের বিরুদ্ধে—তখন তো জাপান আণবিক বোমা বিধ্বস্ত হয়ে আত্মসমর্পণের দোড়গড়ায় নতজানু। কাজেই এ যুদ্ধ তো যুদ্ধ নয়—এ তো আসলে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা! তা ছাড়া যদি ধরেও নেওয়া যায় রাশিয়া জাপানের শত্রুই—তা হ'লেও সে আজাদ হিন্দ সরকারের শত্রু হবে কোন্ যুক্তিতে। সত্যি! আসন্ন সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েও কি সনিষ্ঠ আন্তরিকতাই না সুভাষচন্দ্র আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন তাঁর স্বপ্নের আজাদ হিন্দ সরকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অবিনশ্বরতার আশা!

এর পরেও খবর রাশিয়াতে যাওয়ার পর ওনাকে নাকি নির্বাসিত করা হয়েছিল সুদূর সাইবেরিয়ায়—আর তারও পরের খবর—আমেরিকার লাইফ পত্রিকার সংবাদ অনুসারে—ইয়াকুট্‌স্কের বন্দী শিবিরে স্টালিনের নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাঁকে।

এ ছাড়াও এমন খবর রটেছিল ও সময়ে যে—সুভাষচন্দ্র নাকি রাশিয়া নয়—চলে

গিয়েছেন চীনে—এবং তারও অনেক পরে চীন যখন ছক্ কষছে ভারত আক্রমণের, তখন সুভাষচন্দ্র নাকি গোপনে ভারত সরকারের কাছে আগাম সাবধানবাণী সহ খবর সরবরাহ করছিলেন সে সবের। একটা প্রতিনিধি দলের ছবিও ছাপানো হ'ল সে সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—তাঁর মধ্যে একজন ছিলেন অবিকল সুভাষচন্দ্রের মতো দেখতে—বলা হ'ল তিনি নাকি সুভাষচন্দ্রই। বিভ্রান্তি বেড়েই চলে ক্রমশঃ।

১৯৪৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল এ পি. আই. খবর দিল—সুভাষচন্দ্র মাঞ্চুরিয়াতে আছেন এবং সেখানে তিনি ভালই আছেন। মাঞ্চুরিয়ার দাইরেনে সুভাষচন্দ্রের ওই সময়ে চলে যাওয়া নিয়ে যে রটনা রটেছিল তাও অমূলক নয় একেবারে। যুদ্ধ শেষের মুখে মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হতে চলেছিল রাশিয়া কর্তৃক-অতএব ওখানে যেতে পারলে রাশিয়া যাওয়ার সুবিধা হবে—এমন ভেবে সুভাষচন্দ্র যেতেও পারেন ওখানে। পত্রকারদের বিবৃতি মারফৎ পরে জানা গেল এক সময় যে—ঐ পত্রকারেরা নাকি স্বচক্ষে সুভাষচন্দ্রকে সশরীরে দেখেছেন সায়গনে। CSDIC— খোদ বৃটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা বিবৃতি দিল প্রায় সম-সময়ে—সুভাষচন্দ্র মারা যাননি—উনি চলে গিয়েছিলেন মাঞ্চুরিয়ায়—ঠিক যেমনটি খবর দিয়েছিল এ. পি. আই.। সুভাষচন্দ্র যে গিয়েছিলেন বা আদৌ ছিলেন ওই সব বিভিন্ন জায়গায়—সে সব খবর তো তাঁরা দিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে হ'ল তাঁর—তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য খবর কিন্তু পাওয়া গেল না আজ পর্যন্ত।

আসলে বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে অসংগতিই ছিল—এ সব কাহিনী রটনার মূল কারণ। যে উচ্চতা থেকে বিমান ভূপতিত হয়েছিল—বলা হচ্ছে—বিমান বিশেষজ্ঞরা বলেন—তেমন দুর্ঘটনায় পড়ে জীবিত থাকতে পারেন না কেউই। সেক্ষেত্রে কর্নেল হবিবুর রহমান বা অন্যেরা জীবিত থাকলেন কি ভাবে! বলা হয়েছিল কর্নেল হবিবুর রহমান সুভাষচন্দ্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁর চিতাভস্ম বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন জাপানে—তো এর আগে কর্নেল হবিবুর রহমান যে সুভাষচন্দ্রের মৃত মুখ দেখে তাঁকে সনাক্তকরণ করেনান—তা নয় মানা গেল—কিন্তু ক্যাপ্টেন সেহগল যে হবিবুর রহমানের হাতের ক্ষতের দাগ আর পোড়া খাকির পোষাক দেখে বললেন উনি শিকার হতেই পারেন না অমন একটি বিমান দুর্ঘটনার, অথবা অমন বিমান দুর্ঘটনা ঘটেই নি আদৌ—তার উত্তর হবে কি ?

সুভাষচন্দ্রের ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিষ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেও সন্দেহ প্রকাশ করা হ'ল এ সময়ে। যে হাতঘড়িটি দেখানো হ'ল সুভাষচন্দ্রের বলে—সুভাষচন্দ্র কখনো ব্যবহার করেননি তেমন হাতঘড়ি। যে ঘড়িটি দেখানো হ'ল সেটি চৌকো, অথচ সুভাষচন্দ্র বরাবর ব্যবহার করতেন গোল মডেলের ঘড়ি। তাছাড়া—ঘড়ি তো দেখানো হ'ল—কোথায় গেল তাঁর চশমা—ও সময়ে তো দৃষ্টিশক্তি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে সুভাষচন্দ্র চশমা ছাড়া চলতে পারতেন না এক পাও। এ সময় তিনি সঙ্গে রাখতেন একটি জপমালা—সেই জপমালাটিরই বা হদিস কি ? এসব ছাড়াও যুদ্ধের

জন্তে যে সাহায্য প্রার্থনা করে প্রায় দশ বাক্স বোম্বাই সোনা এ সময় ছিল সুভাষচন্দ্রের কাছে, তারইবা হদিস কই ? যে ডেথ্ সার্টিফিকেটটি দাখিল করা হ'ল তা ছিল ইচিরো হকুদা নামধারী এক জাপানীর—সুভাষচন্দ্র যে এমন একটা জাপানী ছদ্মনাম কখনো আদৌ ব্যবহার করতেন—তার প্রমাণ নাই কোথায়ও। রহস্য ঘনীভূত হয় এ সব প্রশ্নে।

তাইপের তৎকালীন মেয়র সাক্ষ্য দিলেন—ঐ আগস্ট মাসে ওখানে কোনো বিমান দুর্ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ নাই কোনোখানে, আর তার ফলে কারও মৃত্যু তাও নথিবদ্ধ নাই কোথায়ও। সুভাষচন্দ্রের অগ্নিদগ্ধ শরীর কখন ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে,—কতজন রোগী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন ঐ হাসপাতালে সে সময়ে—ঠিক কোন্ সময়ে মারা গিয়েছেন তিনি—এ সব প্রশ্নের উত্তরে এত বিপরীত কথাবার্তা বলা হতে থাকল যে সন্দেহ নিরসন হবে কোথায়—বেড়েই চলতে থাকে তা।

সুভাষচন্দ্রের শরীর গঠন বা মুখাবয়বের সঙ্গে সামান্যতম মিল থাকলেই জনসাধারণ যে ওই ব্যক্তিকে সুভাষচন্দ্র ধরে নিয়ে কি অযৌক্তিক উন্মাদনা প্রকাশ করতেন—তার শেষ নিদর্শন ঘটে গেল শৌলমারীর সাধুজী শ্রী সারদানন্দজীকে কেন্দ্র করে। কি বিপুল জনসমাগমই যে ঘটল সেখানে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। সুভাষচন্দ্রের অন্যতম সহযোগী মেজর সত্য গুপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—উনিই সুভাষচন্দ্র। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং জওহরলাল সরকারীভাবেই সুভাষচন্দ্রের সমসাময়িক যুগান্তর দলের এক বিপ্লবী শ্রী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে সেখানে পাঠিয়ে—এই সাধু যে সুভাষচন্দ্র নন এমন সাক্ষ্য দিয়ে বাধ্য হলেন এই উন্মাদনার প্রশমন ঘটাতে। সনাক্ত করা গেল না সুভাষচন্দ্রকে শুধু ওখানে কেন—অন্য কোথায়ও না, তবুও অনেকের বিশ্বাস শতায়ু হয়েই সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন এখনো। কোনও মানুষের পক্ষে শতায়ু হওয়া অসম্ভব নয় এমন কিছু।

বলা হচ্ছে—জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রাখা আছে—সুভাষচন্দ্রের চিতাভস্ম। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু কাহিনী এমনই বিতর্কিত যে—সে কারণে তাঁর মৃত্যুদিনও অবশ্যই বিতর্কিত এবং তার এই তথাকথিত চিতাভস্মও বিতর্কিতই। আর এ কারণেই তাঁর মৃত্যুদিন ১৮ই আগস্টে অথবা তার জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী, অথবা অন্য কোনও উপলক্ষ্যেই না বেসরকারী, না সরকারী কোনো ভাবেই আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা জানানো হয়নি সেখানে। এ ঘটনা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। কবে মারা গেলেন তিনি, কখন মারা গেলেন, কোথায় মারা গেলেন, কোথায় কখন দাহ করা হ'ল তাঁর মৃতদেহ—এ সব তর্কাতীতভাবে প্রমাণিতই হ'ল না যখন, তখন ঐ মৃত্যুর ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়ে, ঐ চিতাভস্ম সুভাষচন্দ্রের ধরে নিয়ে, তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ—তা সম্ভব কিভাবে ?

সন্দেহ ঘনীভূত করতে আরও সহায়তা করে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'Director of Military Agency-র এক বক্তব্য। কর্নেল হবিবুর রহমানের

বিবৃতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে এ সংস্থাটি বলল—সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে জাপানে এবং তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সম্পাদিত হয়েছে জাপানেই—তাইহোকুতে নয়। এ ঘটনা আদৌ অস্বাভাবিক নয় যে জওহরলাল নেহেরু প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন এবং তারপরে তাঁর তনয়া ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর প্রধান মন্ত্রীত্ব সময়ে জাপান সফরে গিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও ঐ চিতাভস্মের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করে কোনো রকমে কিছু ধূপকাঠি জ্বেলে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওখানকার পরিদর্শন বইতে বুদ্ধের কাছে বিশ্বশান্তি প্রার্থনা করে তাঁদের দায় সারবেন। ওই চিতাভস্ম যে সুভাষচন্দ্রের নয় এ সম্বন্ধে এঁদের বিশ্বাস কি,—এ ঘটনা কি তা প্রমাণ করতে যথেষ্টই সাহায্য করে না।

আন্তর্জাতিক কিছু আচার আচরণও ঘনীভূত করতে সহায়তা করে এই সুভাষ-তিরোধান রহস্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর যে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হ'ল, সেখানে ২৫শে অক্টোবর ১৯৪৫-এ রচিত হ'ল যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা—ভারতীয়দের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নাম দেখা গেল সেখানে। সুভাষচন্দ্র ঐ বৎসর ১৮ই আগস্ট অর্থাৎ দু' মাসেরও বেশী আগে মারাই গেলেন যদি তাহলে ওনার নাম ওখানে, রাখার অর্থ কি! আরও মজার ব্যাপার ঘটল একটা। বছর কুড়ি পরে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্র ভারতে ফিরে আসছেন এমন একটা জনরব শোনা গেল যখন, C I A উদ্যোগ নিল ১৯৬৭-তে যাতে যুদ্ধাপরাধ তামাদি হয়ে যাওয়ার যে সময়-সীমা ছিল বিভিন্ন দেশে, তা সীমাহীন করে দেওয়া যায়। ১৯৬৫ থেকে রাষ্ট্রসংঘ এ ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে ১৯৭১ সালে সমর্থ হয় এ প্রস্তাবে ভারত সরকারের সমর্থন আদায় করতে। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে ভারত সরকার স্বীকৃত হ'ল সুভাষচন্দ্রকে যখন যেখানে পাওয়া যাক্ না কেন, তাঁকে তুলে দেওয়া হবে রাষ্ট্রসংঘের হাতে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। ১৯৫৬-তে শাহনওয়াজ কমিটি আর ১৯৭০-এ খোসলা কমিশন প্রমাণই করল যদি সুভাষচন্দ্র মৃত—তা হ'লে এই স্বীকৃতিরই বা অর্থ কি?

এই যুদ্ধাপরাধ বিচার প্রসঙ্গেই উঠে আসে আরও একটি কথা—যুদ্ধোত্তর সময়ে জাপ-যুদ্ধ বন্দী প্রধান মন্ত্রী তোজো আর সেনা-প্রধান ফুজিয়ারার বিচার চলছে যখন জাপানে, তখন সেখানকার আমেরিকান বিচারপতি, ডঃ রাধাবিনোদ পালকে বলেছিলেন আমেরিকান গোয়েন্দা বাহিনীর এক রিপোর্টের কথা—যাতে বলা হয়েছিল সুভাষচন্দ্র জীবিত তখনো এবং তিনি পালিয়ে পালিয়েই বেড়াচ্ছেন। ডঃ পাল ভারতে ফিরে এসে এ কথা বলে যে ভারত সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং পরে হেনস্থাও হয়েছিলেন—এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর সে রিপোর্ট অবশ্য প্রকাশিত হয়নি আজও।

যাই হোক্ ভারত সরকার এর পর এ পর্যন্ত দুটি বড়ো রকমের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সুভাষ-তিরোভাব বিতর্কে অতি সুচতুরতার সঙ্গে জল ঢেলে দিতে—প্রথমতঃ,

১৯৯২ সালে প্রস্তাব নেওয়া হ'ল সুভাষচন্দ্রকে মরণোত্তর ভারতরত্ন উপাধি দেওয়ার। আর দ্বিতীয়তঃ, নেতাজী জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর চিতাভস্ম ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনার। প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রস্তাবটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটা মামলা রুজু করা হয় কোলকাতা হাইকোর্টে—, কোলকাতা হাইকোর্টে প্রয়োজনীয় নথিপত্র তলব করলেও তা ওখানে জমা দেওয়া হয়নি এখনো। মামলাটি এখন স্থানান্তরিত হয়েছে সুপ্রীমকোর্টে।

দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে—নেতাজী জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য প্রধান মন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের সভাপতিত্বে যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল সেখানে ১৯৯৫ সালে ঐ চিতাভস্ম ভারতে আনবার প্রস্তাব রাখা হয়। তৎকালীন বিদেশ মন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় জোর সওয়ালও করেন এর পক্ষে—কিন্তু প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে শ্রীরাও এব্যাপারে অধিকতর তীব্র বিতর্ক এড়াতে বন্ধ করে দেন এ সম্পর্কে আদৌ কোনো আলোচনাই। ঐ ভস্মের DNA পরীক্ষা করে ঐ ভস্ম যে সুভাষচন্দ্রেরই তা প্রমাণ করার প্রস্তাবও রাখা হয়, কিন্তু সেখানে প্রশ্ন—D N A-র সামান্যতম অবশেষও কি ভস্মের মধ্যে আদৌ থাকা সম্ভব? আগুন কি তবে D N A ধ্বংস করতে পারে না। এরপর প্রস্তাব আসে ওখানে রক্ষিত সোনার দাঁতের DNA পরীক্ষা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন সুভাষচন্দ্রের সোনা বাঁধানো দাঁত ওখানে আদৌ গেল কিভাবে! কর্নেল হবিবুর রহমান সুভাষচন্দ্রের হাতঘড়ি ইত্যাদি জমা দিলেন অথচ দাঁত রাখতে গেলেন ওখানে এর কারণ কি এবং এর পরেও প্রশ্ন উঠবে ঐ দাঁত যদি সুভাষচন্দ্রের হয়ও তবু ঐ দাঁত আর ঐ ভস্ম যে একই ব্যক্তির তারই বা প্রমাণ কি? সুভাষচন্দ্রকে মরণোত্তর ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাবের মতো তাঁর চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবও আপাততঃ পরিত্যক্তই।

কোথায় গেলেন তবে সুভাষচন্দ্র! এমনকি হতে পারে না—মস্তিষ্কে অথবা অন্য কোথায়ও বা অন্য কোনো ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের শিকার হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছেন তিনি, অথবা শ্রী অরবিন্দের আদর্শে রণক্লান্ত হয়ে ভারতবাসীর জন্য আধ্যাত্মিক উন্নয়ন কামনায় প্রার্থনা জানাতে সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলেন তিনি কোনো নির্জন নিরাপদ স্থানে, এবং এর পরে তিনি তিরোহিত হলেন সেখানে সবার অলক্ষ্যে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মোসলে যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—দি লাস্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ-এ বলেছেন—১৯৯৯-এর আগে পাওয়া যাবে না সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দলিল দস্তাবেজ কাগজপত্র সব কিছু, তবে কি আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে সে পর্যন্ত। সার্বভৌম ভারত সরকার কি তার নিজস্ব আইন কানুনে সংশোধন সাধন করে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত নথিপত্র প্রকাশ করে উদ্‌ঘাটন করতে পারে না এ রহস্যের—তার আগেই?

একটা চেষ্টা অবশ্য শুরু হয়েছে তার আগেই সব কিছু জানবার; সে প্রয়াসও অবশ্য স্তিমিত বর্তমানে। মার্চ ১৯৯৫-তে এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে

তিনজন—শ্রীমতী পূরবী রায়, শ্রীহরি মাধবন, ও শ্রীশোভনলাল দত্তগুপ্ত-এর এক গবেষক দল পাঠানো হয়েছিল রাশিয়াতে—তাঁদের আশা ওখান থেকেই উদ্‌ঘাটন হতে পারবে সুভাষচন্দ্রের তিরোধান রহস্য। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ১৯৪৬ সালের পরেও সুভাষচন্দ্র ছিলেন ওখানে। রাশিয়া সরকারের অসহযোগিতার কারণে এ যাত্রায় তাঁরা করতে পারেননি কিছুই। এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ডঃ চন্দন রায় চৌধুরীর মতে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি রয়েছে—কে· জি· বি-র কাছে এবং প্রেসিডেন্টের মহাফেজখানায়—ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। Lying with the K. G. B. & the President's Archives which are not accessible"— ; রাশিয়ান সরকারের বিনানুমতিতে ব্যবহার করা যাবে না সেগুলি। ভারত সরকার রাশিয়া সরকারকে অনুরোধ জানালে হয়তো বা হদিশ মিলতে পারে সে সবের—কিন্তু ভারত সরকার সে অনুরোধ তো জানায়ইনি—উল্টে বিদেশ মন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে ঐ গবেষকদল ভারতে ফিরতে না ফিরতেই পাঠিয়ে দিলেন মস্কোতে আর তার অব্যবহিত পরেই রাশিয়ান সরকার আগ বাড়িয়ে ঘোষণা করল—তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার পরে সুভাষচন্দ্রের রাশিয়াতে অবস্থানের প্রমাণ নাই কিছুই। গবেষক দলের বিশ্বাস এবং বক্তব্য—ভারত সরকার রাশিয়া সরকারকে অনুরোধ করলে তবেই ব্যবহার করা যেতে পারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি। তাঁদের ভারতে প্রত্যাগমন করতে না করতেই তড়িঘড়ি আমাদের বিদেশ মন্ত্রীর মস্কো গমন-এর পরই আগ বাড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে রাশিয়া কর্তৃক সুভাষচন্দ্র যে বিমান দুর্ঘটনার পর রাশিয়া যাননি এমন ঘোষণা, অথচ আসল যে ব্যাপার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখানো সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না করা—এ সব কি খুব রহস্যময় ঠেকে না ?

ভারতীয়দের বহুদিনের পুরানো সোচ্চার দাবী যে মস্কোতে পাঠানো হোক একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তকারী দল সুভাষ-অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করতে—তা হয়তো ঠেকিয়ে রাখা যাবে না বেশীদিন—বিশেষতঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা হয়ত সুদূর পরাহতও নয়—আর তা যদি না হয়েই থাকে তবে আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে ঐ মোসলে কথিত এই শতাব্দীর শেষ পাদ পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে পরিষ্কার কোনো চিত্র পাওয়ার তীব্র তৃষ্ণা অপনোদিত করতে।

সুভাষচন্দ্র ঐ বিশেষ বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন কি না, অথবা পরে তিনি কোথায় কিভাবে মারা গিয়েছেন,—এ প্রশ্নের সমাধান অবশ্যকাম্য ; কিন্তু আজও তিনি জীবিত কিনা—এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই হারিয়ে ফেলেছে তার গুরুত্ব। কোনো মানুষ শতাধিক বৎসর বাঁচতে পারেন এবং সে যুক্তিতে তিনি আজও জীবিত-এমন হতেই পারে—এবং তা ভারতবাসীর পক্ষে পরম আনন্দের খবর হবে অবশ্যই ; কিন্তু তিনি যদি জীবিত থাকেনও, বার্দ্ধক্যের কারণে জীবন্মৃত থাকার সম্ভাবনাই তাঁর।

সান্ত্বনা আমাদের সুভাষচন্দ্রের মতো মহামানবদের মৃত্যু কি কখনো হয় ? যৌবরাজ্যের অবিসম্বাদী অধীশ্বর হিসাবে যে শৌর্য্যদীপ্ত অনময়নীয় দার্ঢ্যের প্রতীক-

রূপে—স্বাধীনতাকামী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানবমাত্রের প্রেরণারূপে, যুগবাঞ্ছিত ভারতীয় বীরত্ব ও সাহসিকতার স্বতঃপ্রকাশ নির্যাসরূপে এবং স্বাদেশিকতা ও সৌম্য আধ্যাত্মিকতার ন্যাসরক্ষক হিসাবে প্রতিভাত তিনি বিশ্ববাসীর সামনে—সেই প্রতীতিই অব্যাহত থাকুক, আমাদের হৃদয়কন্দরে চিরকাল—সেই তো বেশ !

সুভাষচন্দ্র যদি ফিরেই আসেন এখন আমাদের মধ্যে—কি অবস্থায় দেখব আমরা তাঁকে। সমুন্নত প্রশস্তবক্ষ দৃপ্ত দৃঢ় পদচারণায় বীর্য্যবত্তার প্রদীপ্ত ঔজ্জ্বল্য আর কি প্রত্যক্ষ করতে পারব আমরা ? কম্বুকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে সমগ্র জাতি তথা বিশ্ববাসীর প্রতি উদ্দীপ্ত উদাত্ত আকুল আহ্বানের উদ্দীপনা কর্ণগোচরে হবে কি আমাদের ? ত্যাগ আর তেজের, সারল্য আর শৌর্য্যের, মাধুর্য্য আর মহত্ত্বের সুষম রসায়নে সৃষ্ট স্বপ্নসম্ভব অস্তিত্ব তাঁর প্রত্যক্ষ করা কি সম্ভব হবে আর ! মহাকালের অবিনশ্বর প্রস্তর-প্রাকার গাত্রে উৎকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর যে বদ্ধমুষ্টি উন্নতশির যৌবনদীপ্ত অনপনেয় আলেখ্য তাই অমলিন থাকুক আবহমানকাল—বার্দ্ধক্যজনিত জরাগ্রস্ত তোমার শারীর উপস্থিতি আমরা আর কামনা করছি না সুভাষচন্দ্র।

নেতাজী—বিস্মৃত ?

নেতাজী ভারত ত্যাগ করলেন— ভারতের ভিতরে থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালানোতে কোনো সহায়তা না পেয়ে ভারতের বাইরে থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেই যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে। ইংরেজ বিরোধী শিবিরে এ কারণে যোগ দিয়েও তিনি কিন্তু সমর্থ হলেন না ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সমর্থন পেতে। কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন এ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে আপস করতে করতেই এগিয়ে যাচ্ছিল—এখন তা বাধ্য হ'ল আপসহীন হতে। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল—ইংরেজ ভারত ছাড়ো, ইংরেজকে ভারত ছাড়া করতেই এবং করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, Do or Die—হয় করব নয় মরব। সুভাষচন্দ্রের বরাবরের অভীপ্সিত পথ তো এটিই ; এখন সুভাষচন্দ্রের অবর্তমানে কংগ্রেস এ পথ বেছে নিয়ে কংগ্রেস ক্ষেত্র থেকে সুভাষকে বাদ দিয়ে সেক্ষেত্রে সুভাষবাদের আবাদ করে স্বাভাবিকভাবেই সুভাষচন্দ্রের গুরুত্ব নস্যাৎ করতে উদ্‌গ্রীব হ'ল। সুভাষচন্দ্র ভারত স্বাধীন করতে ভারতে আসছেন না—আসছেন জার্মানীকে অথবা জাপানকে উপঢৌকন হিসাবে ভারতকে সমর্পণ করতে—এমন রটনার অন্যতম কারণ এটিই ! ইংরেজরা অন্ততঃ তাদের কূটকৌশলী প্রচারের ফলে এমন একটা পরিবেশ বেশ ভালই তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিল। তাছাড়া এ সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আচরণও ছিল অদ্ভুত। একদিকে ইংরেজকে ভারত ছাড়া করতে মরীয়া—আবার যুদ্ধের প্রয়োজনে সাহায্যও চলছে ইংরেজকে। সুভাষচন্দ্রকে জনমানস থেকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা তখন থেকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির ভূমিকা অবশ্য কিছুটা স্বতন্ত্র ; তাঁর এ যাবৎ কাল অনুসৃত আপসকামিতা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলেছেন তিনি। যুদ্ধে বৃটিশকে কোনো রকম সহযোগিতা নয়—এ মতবাদে দৃঢ় হয়েছেন যথেষ্টভাবে। তাঁর সম্পর্কে ইংরেজদের যে অপবাদ, যে ভারতে বৃটিশ স্বার্থ-রক্ষার সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল তিনিই—The best policeman, the Britishers had in India—এলেন উইলকিন্‌সন্, তাও পুরোপুরি অপনোদিত তাঁর আচরণের ফলে। আর অমন যে সন্ত্রাসবাদ—সহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রামের চরম বিরোধী তিনি এখন সুভাষচন্দ্রের এই চরম ভূমিকায় বরং আপন পন্থার সমর্থন-ই যেন দেখতে পান উনি। তাঁর পরিকল্পিত স্বাধীনতা আন্দোলনে যদিও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কখনোই বিবেচিত হয়নি—তবু সুভাষচন্দ্রকে এ সময়েই তিনি Prince among Patriots—সেরা দেশপ্রেমিক বলে প্রসংশিত করলেন।

ভারতবাসীর অন্তরের অন্তঃপুরে নির্বাসিত সুভাষচন্দ্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুরু আবারও এরপর থেকে, আর সে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত জানিয়ে কিছুটা যেন প্রায়শ্চিত্ত করবার প্রয়াস পেলেন গান্ধীজি তাঁকে নির্বাসিত হতে বাধ্য করার দায় থেকে।

অক্ষশক্তির তর্কাতীতভাবে পরাজিত হওয়ার ফলে সুভাষচন্দ্রেরও ভারতা-

ভিযানের প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। কর্তৃত্বলোভীর এক দলের এবার প্রচেষ্টা হ'ল সুভাষচন্দ্রের সামান্যতম স্মৃতিও মুছে ফেলবার। পরম বেদনার কথা হ'ল যে ভগৎরাম তলোয়ার ওরফে রহমৎ খাঁ একসময় অশেষ কষ্ট স্বীকার করে—সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ সময়ের সঙ্গী হয়েছিলেন, তিনি ১৯৪২ সাল থেকেই প্রত্যক্ষতঃ সুভাষ বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন যুদ্ধকালীন বহুজাতিক গুপ্তচরের বৃত্তি গ্রহণ করে। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত অনেক গোপন খবরই পাচার করে দিলেন তিনি মিত্রশক্তির হাতে, আর এ সময় এ কাজে যুক্তি ছিল তাঁর—সুভাষচন্দ্র শত্রুতা করছে ভারতের, অতএব তাঁর শত্রুতা করাই তো বরং উচিত কাজ এখন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে থেকেও কিছু দুর্বল চিত্ত সেনানীও অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, যেমন—রিয়াজ, মদন, এম. এন. দে প্রমুখ।

সুভাষচন্দ্রের কথা পরে, আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর সেনানী যাঁরা প্রাণপাত করতে দ্বিধা করেননি ভারতের স্বাধীনতার জন্য রণক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করতে, কোন্ কৃতজ্ঞতাই বা দেখানো হ'ল তাঁদের প্রতি। শাহনওয়াজ খান, সায়গল আর ধীলনের বিচার চলছে যখন লালকেল্লায় বন্দী যুদ্ধাপরাধী হিসাবে, মূলতঃ জনমতের চাপে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রাণপাত করলেন তাঁদের মুক্তির জন্যে, জোর সওয়ালও করলেন তাদেরকে পরম দেশপ্রেমিক হিসাবে আখ্যাত করে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে মুক্তও হলেন তাঁরা—কিন্তু পরবর্তী চিত্র কি? ভারতের স্বাধীন সরকার ফতোয়া দিলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কাউকে যেন চাকরী না দেওয়া হয় কোথায়ও, বিশেষতঃ সেনাবাহিনীতে। এ সুপরামর্শ নাকি দিয়ে গিয়েছেন ইংরাজ সরকার; এর ফলে নাকি ভেঙে পড়বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা। স্বাধীন ভারতের অহিংস নেতারা হয়তো তাঁদের সেনাবাহিনীও অহিংস হবেন, এমনই চাইছিলেন!

পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য বেছে বেছে বেশ কয়েকজনকে একেবারে রাষ্ট্রদূতই নিযুক্ত করে দেওয়া হলে চীন, থাইল্যাণ্ড, মেক্সিকো, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, রোম ইত্যাদি জায়গাতে। আর শাহনওয়াজ খানকে তো আমন্ত্রণ জানানো হল একেবারে সংসদীয় রাজনীতিতে। ১৯৫২ সাল থেকে মীরাট লোকসভা আসনটি উপঢৌকন দেওয়া হ'ল তাঁকে, আর শেষ পর্যন্ত তাঁকে করা হয়েছিল—কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রীও। সুভাষচন্দ্র মৃত একথা প্রমাণ করতে তাঁকে যে এক কমিশনের নেতা করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল—এ কথা আগেই উল্লিখিত।

কি করা হ'ল সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল ঘোষণা করলেন—সুভাষচন্দ্রের কোনো খবরই যেন ঘোষণা না করা হয় বেতার মারফৎ। শুধু কি তাই—১৯৪৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী এক আদেশ জারী করা হল—সুভাষচন্দ্রের কোনো ফটো যেন রাখা না হয় কোনো সরকারী ভবনে বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রকাশ্য স্থানে! সুভাষস্মৃতি মাত্রও ভারত থেকে মুছে ফেলবার কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! গান্ধীজি তাঁকে বলেছেন Prince among Patriots—দেশ-

প্রেমিকদের মধ্যে যুবরাজ ; সরোজিনী নাইডু বলেছেন—The flaming sword—প্রজ্বলন্ত তরবারি—তা হোক্, জওহরলাল যে বলেছিলেন সুভাষচন্দ্রের ভারত প্রবেশ রোধ করতে স্বহস্তে তলোয়ার ধারণ করবেন তিনি, অথবা মিঃ এট্‌লির কাছে যে অনুযোগ জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রকে ঠাঁই দিয়ে অন্যায় করেছে রাশিয়া—এ পদক্ষেপ তার সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণই বটে।

এতো গেল ব্যক্তি সুভাষকে বিস্মৃত হওয়ার প্রচেষ্টার কথা—সুভাষচন্দ্র যা চেয়েছিলেন তাও কি বিস্মৃত আজ? সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম, বীরত্বের কাহিনী, প্রশাসন দক্ষতা এ সব অবশ্যই বিস্মৃত হওয়ার নয়—কিন্তু দেশোন্নয়নের স্বার্থে প্রচারিত নীতিসমূহ—তা কি বিস্মৃত হয়েছি আমরা? সমাজতান্ত্রিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, আন্তর্জাতিকতা, ভারতের অখণ্ডতা—এ সব নিয়ে যে বক্তব্য তাঁর অফুরান! এক স্বাধীন, সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ—সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত সমৃদ্ধ অখণ্ড এক ভারতবর্ষ রচিত হবে—এই ছিল আজন্ম স্বপ্ন সুভাষচন্দ্রের। তাঁর সেই স্বপ্নের ভারত রচনার কথাও কি বিস্মৃত আমরা! স্বাধীন ভারত,—সবার জন্য স্বাধীনতা—মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ভাগ্যবানদের জন্য নয়—দরিদ্রতম সাধারণ মানুষজনও পূর্ণ মাত্রায় স্বাদ পাবে সেই স্বাধীনতার—এমনই এক ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন তিনি—সেই ভারতবর্ষ বহিঃপ্রভাব মুক্ত তো হবেই—সেই সঙ্গে হবে তার প্রতিটি মানুষও মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বয়ম্ভর, আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর, আত্মবিকাশে অবাধ, সহানুভূতি আর সমবেদনায়, সমদর্শিতা আর সহযোগিতায় সনিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ,—অর্থনৈতিক ও আত্মিক শক্তির শক্ত বনিয়াদের উপর সুনিশ্চিত ও স্বস্তিযুক্ত। সাম্রাজ্যবাদিতা দূর করতে হবে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ থেকেই নয়—সারা বিশ্ব থেকেই নির্মূল করতে হবে তাকে। ভারতের স্বাধীনতা কেবলমাত্র ভারতেরই মঙ্গল সাধন করবে না—সমগ্র বিশ্বেরই মঙ্গলের কারণ হবে তা। বিবেকানন্দ যেমন করে চেয়েছিলেন ভারতের আধ্যাত্মিকতায় সারা বিশ্বকে সঞ্জীবিত করতে, সুভাষচন্দ্র সেই ভাবেই চাইলেন ভারতকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের মঙ্গল। আত্মিক শুদ্ধিকরণের কারণে বৈদান্তিক তত্ত্বসঞ্জাত আধ্যাত্মিকতা, আর অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনে আধুনিক তত্ত্ব সমর্থিত যন্ত্র সভ্যতা ; অতীত দিনের প্রাচ্যসম্ভূত হৃদয় গৌরব, আর বর্তমান দিনের পাশ্চাত্ত্য প্রযুক্তি-নির্ভর বিষয় বৈভব ; বিগত দিনের আর্য্য সৌম্যভাব, আর বর্তমান দিনের শৌর্য্য সাম্যবাদ, প্রাচীন দিনের অন্তর্মুখী মোক্ষও মুক্তির পিপাসা ও আয়াস, আর অর্বাচীন মনের আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রত্যাশা ও প্রয়াস—এ সবের সমবায়-সমন্বয়েই তো গড়ে উঠবে অনাগত ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বিশ্ব—আর তার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হবে তো স্বাধীন, সমৃদ্ধ, অখণ্ড ভারতকেই। বিশেষতঃ সমাজতন্ত্রবাদে যে কি গভীর বিশ্বাস ছিল সুভাষচন্দ্রের। বিবেকানন্দের ফলিত বৈদান্তিক ভাবনার মানব সাম্যের আদর্শকে সুষমরূপে বাস্তবায়িত করতেই যেন অর্থনৈতিক এই তত্ত্বটির উপস্থাপনা—মার্কসবাদ,

সুভাষচন্দ্রের বিচারে বিবেকানন্দকে রূপায়িত করার অন্যতম এক হাতিয়ার বিশেষ। আজীবন তাই তিনি থাকলেন এই মতবাদের প্রতি পরম আস্থাশীল এবং সে কারণে রাশিয়ার গুণমুগ্ধও—যেহেতু এই দেশে রূপায়িত করা হয়েছে মার্কসবাদকে। আত্মিক উদ্বায়ণে বিবেকানন্দের মত আর আর্থিক উন্নয়নে মার্ক্স প্রদর্শিত পথ ; যে কোনও দেশ ও জাতি গঠন করতে প্রাথমিকভাবে একান্তই অপরিহার্য্য—এই ছিল তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস।

বিবেকানন্দ রচনাবলী পাঠ করা হয়ে গিয়েছিল তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত না হতে হতেই—মার্কসবাদ আর লেনিনবাদের পাঠ এর পর নিলেন যখন, হয়ে গেল তাঁর স্বপ্ন দেখার সুরু—এক আদর্শ বিশ্ব গঠন করবার। এর সঙ্গে চাইলেন তিনি—ভারতের যে অনন্য সম্পদ—চিরন্তন আধ্যাত্মিকতা—তাই হবে ভারতের সমাজতন্ত্রের ভিত্তিভূমি ; স্বতন্ত্র জাতীয় চরিত্র রক্ষা করে চলবে সে এবং সেখানে মার্ক্সীয় মতবাদ মেনে অর্থনৈতিক সাম্য সুনিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তোলা হবে বিবেকানন্দ আর ঋষি অরবিন্দের আদর্শে অধ্যাত্মবাদী স্বাদেশিকতা। অতীতের ভারত তো মৃত নয়, সমগ্র বিশ্বকেই অনেক কিছু দেওয়ার আছে তার—সে কারণেই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর—ভারতের মুক্তি মানেই বিশ্বমানবাত্মার মুক্তিও। বিপ্লবের সুফল ধরে রাখতে যে একদল একনিষ্ঠ সংকল্প—দৃঢ় মানব-মানবী চাই—বিবেকানন্দের প্রত্যাশা মতো তৈরী করতে চেয়েছিলেন তিনি তেমনই একদল মানুষ সমগ্র ভারতবর্ষে যাঁরা হবেন—অতীতের মূর্তরূপ, বর্তমানের প্রকৃষ্ট প্রকাশ এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টা।

আদর্শ ভারতবর্ষ রচনার স্বপ্ন দেখা সুরু সুভাষচন্দ্রের ইংল্যাণ্ডে ছাত্রাবস্থাতেই। ওখান থেকে ফিরে মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খুব সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে যে বক্তব্য রাখলেন তিনি—যা পরে তরুণের আহ্বান নামে প্রকাশিত হ'ল, তাতে সেই স্বপ্নেরই ভাষাচিত্র। ১৯২৯-এ প্রকাশিত তরুণের স্বপ্ন পুস্তিকাতে সে স্বপ্নের বিস্তৃতি,—আর হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে ও পরবর্তী কার্য্যকলাপে সে স্বপ্নের বাস্তবায়নের রূপরেখা, রাজনৈতিক দল হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রামগড় সম্মেলনে ১৯শে মার্চ ১৯৪০-এ যে ভাষণ রাখলেন তিনি সেখানেও সেই একই স্বপ্নের বিবৃতি।

কংগ্রেস সভাপতিপদে বৃত হয়ে, বসলেন তিনি শিক্ষামন্ত্রী আর শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে, বৈঠক করলেন বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও। মত বিনিময় করলেন তাঁদের সঙ্গে—গঠন করলেন পরিকল্পনা কমিশন—গড়তে চাইলেন এক শক্তিশালী কেন্দ্রযুক্ত গণতান্ত্রিক সরকার যার দায়িত্বে থাকবে সর্বভারতীয় শক্তিশালী একটি দল আর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকবে দক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক এক সেনাবাহিনী। খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-র সুব্যবস্থা করতে হবে সবার জন্যে আর সবার জন্যে নিশ্চিত করা চাই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারও, বেকারী থাকা চলবে না দেশে—আর দারিদ্র্য

দূরীকরণের প্রয়োজনে রাষ্ট্র মালিকানায় ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে শিল্পায়ন ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক সমবায় নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জোর দিতে হবে—বিদ্যুৎ, ধাতু রাসায়নিক এবং পরিবহন ইত্যাদি শিল্পে এবং সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে আধুনিক কারিগরী দক্ষতা। এর জন্ত তৈরী করা চাই একটি National Research Council—জাতীয় গবেষনা পর্ষদ—আর সর্বোপরি জাতীয় পরিকল্পনার ব্যবস্থা—তাতো থাকবেই।

জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে তিনি বললেন মুদ্রাযন্ত্র, রেডিও, সিনেমা, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও যথেষ্ট দায়িত্বশীল হতে, আর চাইলেন ভারতের ভাষাও হোক একটা—হিন্দুস্থানী,—এবং লেখা হোক্ তা রোমান হরফে। জনস্বাস্থ্য ও জন-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও দৃষ্টি এড়ায়নি তাঁর। এ কারণে যেমন চাইলেন আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা তেমনি চাইলেন আয়ুর্বেদ এবং ইউনানি প্রভৃতি চিকিৎসা ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চাইলেন সবদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের ও সমতার ভিত্তিতে বাণিজ্যের সম্পর্ক—আর যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো বিরোধে জড়িয়ে পড়ে কোনও একটি মাত্র দেশকে বেছে নিতেই হয়, তো সে দেশ হবে রাশিয়া—তাকে পাশে নিয়ে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অন্ত রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৪ সালে টোকিও থেকে প্রচারিত তাঁর বিখ্যাত বেতার ভাষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—তিনি বললেন—কোনো মতবাদের গোঁড়ামিই ভিত্তি হতে পারে না কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার—সে কারণেই নিন্দনীয় নয় কোনো মত-বাদই পুরোপুরি। প্রয়োজনে কম্যুনিজম এমনকি ফ্যাসিজম্ থেকেও তাদের মধ্যে যদি ভাল কিছু থাকে তা নেওয়া চলতে পারে।

ভারতসচিব এ্যামেরি একসময় বলেছিলেন—সুভাষচন্দ্র নাকি তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিয়োগ করে গেলেন কেবলমাত্র ধ্বংসাত্মক কাজে! সুভাষচন্দ্রের জীবনী কি তাই প্রমাণ করে! সময় ও সুযোগ পেলে সুভাষচন্দ্র যে হতে পারতেন এক অনন্যসম্ভব গঠন শিল্পী—এক অভূতপূর্ব স্বচ্ছ-চিন্তাবিদ—সুভাষচন্দ্রের কার্য্যাবলী কি তাই প্রমাণ করে না? ভাঙতে তিনি যা চেয়েছিলেন তা ছিল ভঙ্গুর,—ভাঙতোই, ভাঙছিলই; নোতুন কিছু, বৃহত্তর কিছু, মহত্তর কিছু গড়ার প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্র যে ভাঙনকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। যেখানে কিছু না ভাঙলে কিছু গড়া যায় না সেখানে ভাঙাই হ'ল গড়ার একমাত্র সর্ত। তেমন ভাঙার কাজেই সুভাষচন্দ্র ব্যাপৃত রেখেছিলেন নিজেকে; গড়ার সুযোগ,—নিজের মনের মত করে এলো না তাঁর জীবনে।

সুযোগ পেলে নিখাদ সমাজতন্ত্রই তিনি প্রতিষ্ঠা করতেন ভারতের বুকে—আর এ প্রয়াসে প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করতেও যে কুণ্ঠা বোধ করতেন না তিনি তা তার একটি উক্তি থেকে খুবই পরিষ্কার। প্রাসঙ্গিক এক প্রশ্নের উত্তরে জয়প্রকাশ নারায়ণকে ২১শে আগষ্ট ১৯৩৮ সালে বলেছিলেন উনি—It has to be a forced

march—প্রয়োজন হলে প্রয়োগ করতে হবে ক্ষমতা এই অগ্রগমনের স্বার্থে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মানতেন তিনি—এই বলপ্রয়োগকে হতে হবে অবশ্যই নিতান্ত সাময়িক—তা না হলে সেটা হবে একনায়কত্বের নামান্তর।

স্বাভাবিকভাবেই আলোচিত হওয়ার দাবী রাখে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সে সময়কার সমাজতন্ত্রী তথা বামপন্থীদের সম্পর্ক। হেগেল, মার্ক্স লেনিন, রাশিয়া—এ সব সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত থাকার কারণে এদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তিনি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে এদের দলভুক্ত হতে পারলেন না কখনো নানা ঐতিহাসিক কারণে। বিশের দশকে ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠা হলে এখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বর্ণসম্ভাবনা সমাগত এমন আশায় বড়ো উৎসাহিত বোধ করেন উনি। বামপন্থীরাও সুভাষচন্দ্রকে আপনাদেরই একজন ভাবতে কুণ্ঠা বোধ করলেন না। কিন্তু যে শ্রদ্ধা বোধ করলেন সুভাষচন্দ্র রাশিয়ার প্রতি, তার নীতির প্রতি, তার একাংশ ও প্রদর্শন করতে পারলেন না তিনি ভারতস্থ রাশিয়াপন্থী ব্যক্তিবর্গের প্রতি। বামপন্থী হয়েও কম্যুনিষ্ট আর সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বিরোধ অব্যাহত; হাজারো চেষ্টা করলেন সুভাষচন্দ্র তাদের মধ্যে মতৈক্য ঘটাতে—কিন্তু ব্যর্থ হলেন তিনি। আজও সারা বিশ্বেই চলছে সেই বামপন্থীদের মধ্যে মতানৈক্যের ধারা। দুনিয়ার কৃষক আর মজদুরকে এক হতে ডাক দিয়ে ফললাভ হয়নি বিশেষ, তাঁরা যত না এক হয়েছেন ভাঙতে ভাঙতে একাধিক হয়েছেন তার থেকে বেশী—এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে এই বহুবিভাজন হওয়াকেই তো—বিখ্যাত ঐতিহাসিক টমাস মান বললেন—The scourge of the century, এ শতাব্দীর এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। সুভাষচন্দ্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে সমাজতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করেন যতখানি, রাজনৈতিক মতাদর্শের বিচারে তাকে শ্রদ্ধা করতে পারেন না ততটা, এসব ছাড়াও মূলতঃ জাতীয়তার প্রশ্নে। আর বামপন্থীদের যে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব তাও মনঃপুত নয় সুভাষচন্দ্রের—তিনি চান শ্রেণীসংগ্রাম নয় শ্রেণীসমন্বয়! অবশ্য বামপন্থার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর আরও একটা কারণে। বামপন্থা অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদিতার পরিপন্থী; বামপন্থা দৃঢ়ীকৃত হলে সাম্রাজ্যবাদ দূরীভূত হবেই।

১৯২৬ সালে রাশিয়ার কমিনটার্নের সভায় যোগ দিতে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হলেন সুভাষচন্দ্র বি. টি. রনদিভে, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ অন্যান্যদের সঙ্গে খোদ রাশিয়া কর্তৃক; ১৯৩৩ সালে ক্লিমেন্স দত্তকে সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময়ে জানাচ্ছেন তিনি ভারতকে স্বাধীন করার প্রয়োজনে রাশিয়ার সামরিক সহায়তা নেওয়ার কথা, বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি'র সদস্য মিঃ বাটলিওয়ালার লেখায় দেখা যাচ্ছে—ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি'র সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি ১৯৩৯-এর অক্টোবরে অনুরূপভাবে রাশিয়ার সহায়তা নেওয়ার কথা ভারতের স্বাধীনতার কারণে—এবং শেষ পর্যন্তও এভাবেই রাশিয়ার···উপর নির্ভরশীলতার চেষ্টা বারবার করে গিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় বামপন্থীরাও ক-া সহায়তা করলেন না তাঁকে। ত্রিপুরীতে তো তিনি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন এঁদের সমর্থনের ফলেই। পি. সি. যোশী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তাঁর হরিপুরা ভাষণের ; অনেক প্রবন্ধাদিও লিখলেন তিনি কম্যুনিস্ট মুখপত্র ন্যাশনাল ফ্রন্ট পত্রিকায়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক কারণে হতে হ'ল তাঁকে রাশিয়া বিরোধীই। বামপন্থী সমর্থনে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও আবার তাদেরই সমর্থনহীনতার ফলে তিনি যে ব্যর্থ হলেন পন্থ প্রস্তাবের আক্রমণের মুখে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে, এ যেন তাঁর ঐ বামপন্থীদের সঙ্গে ভালোয় মন্দেয় মেশানো সম্পর্কেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। রাশিয়াকে শ্রদ্ধা করতেন তিনি ঠিকই কিন্তু সে শ্রদ্ধা কখনও এমন পর্যায়ে যায়নি যা বর্তমানে যেমন বলা হয়ে থাকে—রাশিয়াতে বরফ পড়লে ওভারকোট চড়াতে হবে, বা চীনে বৃষ্টি হলে ছাতা মাথায় দিতে হবে তাঁকে কোলকাতার রাজপথে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অসহযোগিতার ত্রুটি অবশ্য সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর সুভাষচন্দ্রের সামগ্রিক মূল্যায়ন করে কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের ভুল স্বীকার করল ১৯৬২-তে সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ মারফৎ।

কম্যুনিস্টদের পক্ষে সুভাষচন্দ্রকে এক সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতা ছাড়া অন্য-ভাবে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল কি ? তাঁরা সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁর সঙ্গে কিন্তু সুভাষচন্দ্র সেভাবে এগিয়ে এসেছেন কই। পার্টি সদস্য তিনি নাই হলেন কিন্তু মুখে বার বার রাশিয়ার সামরিক সহায়তা নেওয়ার কথা বললেও তার সক্রিয় উদ্যোগ নিচ্ছেন কই, লেখাজোখার মধ্যেও তার প্রকাশ কই—আর শেষ যখন এ সহায়তা চাইলেন তিনি, তখন তো তিনি প্রকাশ্যেই রাশিয়ার বিরোধী শিবিরে। রাশিয়ার বিরোধী ফ্রন্টে যুদ্ধ করব অথচ রাশিয়ার সহায়তাও চাইব, একে চরম সুবিধাবাদ ছাড়া অন্য কি-ই বা ভাবা যায়, তা সুভাষচন্দ্রের তরফে তাঁর এ আচরণের যে ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে একশ্রেণীর মানুষ যেমন হালকাভাবে বিচার করতে উৎসুক, তেমনি দেখা হয়ে থাকে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকাকেও। এ প্রসঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা কি তাও আলো-চিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। বামপন্থী এবং সন্ত্রাসপন্থী নেতৃবৃন্দের একাংশ প্রথম আদৌ কংগ্রেসে এলেন এবং নিজেদের উগ্রপন্থা থেকে সাময়িকভাবে বিরত হলেন দেশবন্ধুর আহ্বানে। দেশবন্ধু ব্যারিষ্টার হিসাবে এঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন তখন, গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তুলতে এদেরও সক্রিয় সমর্থন আদায় করতে দ্বারস্থ হলেন দেশবন্ধুর। দেশবন্ধু যে অসহযোগের সাফল্য নিয়ে খুব উৎসাহিত ছিলেন এমন নয় তবু সমর্থ হলেন তিনি অসহযোগে অবিশ্বাসী এই নেতৃবৃন্দকে অসহযোগের সামিল করতে। সুভাষচন্দ্রের সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি প্রীতি এই দেশবন্ধুর কাছ থেকেই। সুভাষচন্দ্র তো প্রথম গ্রেপ্তারই হলেন সন্ত্রাসবাদীদের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন এই অভিযোগে। বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তিনি, এমন অভিযোগও আনা হ'ল তাঁর বিরুদ্ধে। সে যাই হোক, সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন এদের নিষ্কলুষ দেশপ্রেমকে সংহত করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা হোক্। এ ছাড়া গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে রাজবন্দীদের মুক্তি হওয়া সত্ত্বেও ভগৎ সিং প্রমুখদের ফাঁসি হয়ে যাওয়ার ফলে সুভাষচন্দ্রের যে উষ্মা, তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। সুভাষচন্দ্রের এ সব ভূমিকা কি কখনো বিস্মৃত হওয়া যায়। কাউকে বাদ দিয়ে নয়, প্রত্যেকের কাছ থেকে সাধ্যমত নেয় নিয়ে তবেই সম্পন্ন হবে স্বাধীনতা যুদ্ধ।

ভারতীয়েরা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এবং ইংরেজ সরকারের অপপ্রচারের ফলে ভুল বুঝেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীবৃন্দ যে অসীম শ্রদ্ধার আসনে আসীন রেখেছিলেন তাঁকে তা অবিশ্বাস্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়বাসী তাঁকে পেয়েছিলেন তাঁদের ত্রাতা হিসাবে তাই অকাতরে সমর্থন ও জানিয়েছিলেন তাঁকে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অবশ্য সুভাষ-চন্দ্রের চরিত্রে কালিমা লেপন করতে কোনো প্রমাণ ছাড়াই এমন অপবাদও দিয়েছিলেন যে তিনি নাকি জোর করে অর্থ সম্পদ আদায় করেছিলেন ওই সময় ও অঞ্চলে মিথ্যাই আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম করে।

তাঁর অধীনস্থ সেনানীবৃন্দ তো দেবতারও অধিক শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তাঁর সম্পর্কে। সুভাষচন্দ্র নিজে যুদ্ধ করেননি রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও, এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুভাষচন্দ্রের জার্মানী থেকে চলে আসার পরেও জার্মানীতে অবস্থিত সুভাষ সমর্থক সৈনিকেরা—এবার আর অনুরুদ্ধ হয়ে নয়—আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ করলেন না রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং তার ফলে মৃত্যুদণ্ডে প্রাণ দিলেন কুয়েসিনবার্গে।

এরও পরের কথা—যুদ্ধজয়ের সব আশাই যখন শেষ এবং তৎসত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র যখন হতোদ্যম না হয়ে তাঁর ১১ জনের ক্যাবিনেট সদস্যের সামনে প্রশ্ন রাখছেন কে কোন্ ফ্রন্টে যাবেন, অথবা আদৌ যাবেন কিনা—তখন একমাত্র একজন—জে. কে. ভোঁসলে ছাড়া বাকী সবাই সুভাষচন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর ভার। কোনো বিদ্রোহ না, কোনো বিরক্তি না,—এমন আনুগত্য লাভ এই পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, কোথায়ও কোনো নেতা—তা সে সমরনেতাই হোন আর রাষ্ট্রনেতাই হোন, পেয়েছেন কি ?

ভারতবর্ষের বুকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—ধারণার সাগ্রহ আমদানী সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্রের হাত ধরে। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হয়েই পরিকল্পনা কমিশন গঠন করলেন একটা—সভাপতি নিযুক্ত করলেন জওহরলালকে আর সম্পাদক হলেন এক সমাজতন্ত্রী তরুণ—শ্রী কে. টি. শাহ। জওহরলাল ততদিনে সুভাষচন্দ্রের কাছে পূর্বেকার মত আর ঘনিষ্ঠ নন ততো, তবু সুভাষচন্দ্র জওহরলালের বামপন্থী মনোভাবের কারণে

বেছে নিলেন তাঁকেই এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে। বেশ বুঝেছিলেন তিনি ১৯২৯ সালে মহামন্দার শিকার হয়ে চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্ট যে নিউ ডিলের আশ্রয় নিয়েছিলেন এ-জাতীয় হাতুড়ে নিদানে স্থায়ী সমাধান হতে পারে না কিছুই। রাশিয়ার আদলে পরিকল্পিত অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাই একমাত্র নির্দেশপত্র হতে পারে এ জাতীয় গভীর সঙ্কট সমাধানের। জহরলাল অবশ্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োজনে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছাড়াও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হ'ল কম নয়। কিন্তু কতটা সুফল পাওয়া গেল তার ফলে? জওহরলালের প্রধানমন্ত্রিত্ব কাল তো বলতে গেলে প্রচলিত গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রেখে কতখানি সমাজতন্ত্র খাপ খাওয়ানো যায়, তার অঙ্ক কষতে কষতেই শেষ হয়ে গেল। ইন্দিরাজী নিজেকে নিখাদ সমাজতন্ত্রী প্রতিপন্ন করতে ভারতীয় সংবিধান-ই সংশোধন করে সেখানে ব্যবহার করলেন সমাজতন্ত্রী কথাটা—কিন্তু আসল কাজ করলেন কতটা? তাঁর নেওয়া সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপসমূহ যতখানি না আন্তরিক, তার তুলনায় অনেক বেশী আত্মরক্ষামূলক। আর আশির দশকের সুরুর থেকেই তো বলতে গেলে চলছে উল্টোরথের পশ্চাৎ যাত্রা। তাঁর পরবর্তী সময়ে রাজীবজী আর রাওজীর সময়ে তো সেই পশ্চাৎ অপসরণ প্রকাশ্যে নীতিগতভাবে স্বীকৃত-ই; মাঝের অল্প সময়কালীন প্রধানমন্ত্রীদের সময়গুলি সম্পর্কে বলার বিশেষ কিছু নাই। তাবৎ বামপন্থী দলসমূহও যে ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুব সনিষ্ঠ এমন মনে করার কারণ নাই। অবশ্য সুভাষচন্দ্র যে ভাবে বুঝেছিলেন সমাজতন্ত্রকে—সে ধরনের সমাজতন্ত্র আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা—দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বর্তমান বিশ্বে সেই মৌলিক প্রশ্নেই।

রাশিয়া ছাড়াও আমেরিকার প্রতিও কিছুটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সুভাষচন্দ্র, কারণ তার প্রশ্নহীন গণতন্ত্রপ্রিয়তা। তাছাড়া তাঁর সমসময়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশ ছিল না ওটি। একথা ঠিকই যে মনরো ডকট্রিন মান্য করে পূর্ব-পশ্চিম দুই দিকে দুই মহাসমুদ্র ঘেরা দেশটি পৃথিবীর মূল ভূখণ্ড থেকে বহুদূরে থেকে আপনার উন্নতিতেই নিয়োজিত ছিল পার্ল হারবারে জাপান কর্তৃক সরাসরি আক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। এর আগের থেকেই অবশ্য প্রচ্ছন্ন অভিভাবকত্বের দায় তুলে নিয়ে মাতব্বরি করতে সুরু করে দিয়েছিল মিত্রবাহিনীর পক্ষে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। আমেরিকার তৎকালীন চরিত্র বিচারে সুভাষচন্দ্র হয়তো ভুল করেননি, তেমন—কিন্তু বর্তমানে আমেরিকার চরিত্রের অবশিষ্ট আছে আর কতটুকু! স্বদেশে যতটাই গণতন্ত্রের পূজারী সে দেশটি—বিদেশে বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের ক্ষেত্রে ততটাই অগণতান্ত্রিক তার আচরণ। আর সাম্রাজ্যবাদিতার প্রশ্নে আমেরিকার তো বর্তমানে নায়কের ভূমিকা। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের রূপ গিয়েছে বদলে—আর সেই নয়া-সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে আমেরিকাই।

সহজ ব্যাখ্যাতেই বোঝানো যায় যে পুঁজিবাদ থেকেই জন্ম নেয় সাম্রাজ্যবাদ। অতীতে পুঁজিবাদের উচ্চ চাপ প্রশমনের প্রয়োজনে পুঁজির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতিরাও পাড়ি জমিয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশসমূহে, এখন সেসব দেশ থেকে তাড়া খেয়ে সরে আসতে বাধ্য হয়ে পুঁজিপতিরা কেবলমাত্র পুঁজি পাঠিয়ে নিজেদের অশরীরী অস্তিত্ব ওসব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা তার প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত। ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা আর সব জায়গা থেকে উৎখাত হলেও উৎখাত হ'ল না আমেরিকা থেকে, ওটাই হয়ে গেল ওদের নিজের দেশ। ওখানে ঘাঁটি গেড়ে আবার অন্য কোথায়ও ঘাঁটি গাড়া অর্থহীন, এ কারণেও বটে আবার নোতুন কোথাও গেলে সেখান থেকে বর্তমানের ধারা ধরে উৎখাত হওয়ার ভয়েও বটে, আর সাম্রাজ্যবিস্তার না, নোতুন কায়দায় অর্থনৈতিক, সাম্রাজ্য বিস্তারে লিপ্ত হওয়ার নেতৃত্ব নিয়েছে সে দেশটি। পুঁজির চরিত্র গিয়েছে আমূল বদলে— বনিক পুঁজি, শিল্প পুঁজি ইত্যাদির পথ পার হয়ে তা আজ রূপান্তরিত হয়েছে ঋণ পুঁজিতে। লক্ষ্য এখন মূলতঃ ঐ গরীব উন্নতিকামী দেশগুলোই। আগেকার মতো কাঁচামালের সস্তা যোগানদার আর উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্যের অবাধ বাজার হিসাবে ব্যবহার যদি নাও করা যায় ওদেরকে, অন্ততঃ উন্নত প্রযুক্তির মোড়কে ঋণ পুঁজির বাজার হতে তো বাধা নাই তাদের। আই. এম. এফ. আই. ডি. বি. আই., গ্যাট জাতীয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহ একান্ত বশম্বদ এজেন্ট হিসাবে ওদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে বেশ ভালই। আর পণ্য বিক্রয়? নাই বা হ'ল অন্যান্য পণ্য বিক্রয়—যুদ্ধাস্ত্র তো একটা পণ্যই ;— লাগিয়ে দেওয়া হোক যে কোনও অজুহাতে উন্নয়নকামী দেশগুলোর মধ্যে যেমন তেমন একটা যুদ্ধ—যুদ্ধাস্ত্রের বাজার যেমন অব্যাহত থাকবে, তেমনি ওদের উন্নয়ন বিলম্বিত হয়ে সহজ মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে থাকবে ওগুলি আরও অধিকতর দিন। নিজেদেরকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে না, অথচ যুদ্ধকালীন ফায়দা লোটা যাবে পুরোপুরি। আর ঠিক এ কারণেই চাইছে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করুক ও দেশগুলি সর্বাত্মক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) সাক্ষর করে ; অথচ নিজেরা নিজেদের সঞ্চিত পরমাণু-সম্ভার নিয়ে যে কি করবেন, পরিষ্কার হচ্ছেন না সে ব্যাপারে। অবশ্য আমেরিকা যে নয়া সাম্রাজ্যবাদের স্বাদ পেয়ে এমন আচরণ করবে—এ জাতীয় অনুমানের সুযোগ দিল না সুভাষচন্দ্রের।

আমেরিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুভাষচন্দ্র কি করতেন এমন অবস্থায়—তা অনুমানের বিষয়—তবে তাঁর রাশিয়া প্রীতি থেকেও বটে এবং তিনি যে সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে ছদ্ম যোদ্ধা ছিলেন না, তা থেকেও বটে, এ অনুমান অসংগত নয় যে এই নকল অভিভাবকরূপী নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও সমতীব্রতা সহকারে লড়াই চালাতেন তিনি।

ভারতের জাতিবৈর, অখণ্ডতা ও সাম্প্রদায়িকতা এসব প্রশ্নেও সুভাষচন্দ্র সজাগ

ছিলেন সারাক্ষণ। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তাঁর এই মানসিক গঠনের প্রায়োগিক দক্ষতা। সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন ভাষণে, পুস্তিকায়, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে নানা ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই মনোভাব, আর বারবার সতর্ক করতে সচেষ্ট হয়েছেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে। সাম্প্রদায়িকতা উসকে ইংরেজদের ভারত ভাগের হীন প্রচেষ্টার ব্যাপারে তাঁর আশংকার কথা জানিয়েছেন তিনি বারবার, এমন কি যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার সময়েও। সুভাষচন্দ্রের এ আবেদন ফলপ্রসূ হয়নি,—যুদ্ধোত্তর সময়ের মধ্যে জার্মানী, আয়ার্ল্যাণ্ড, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহ বিভাজিত হয়ে যে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল—তার তিক্ত অভিজ্ঞতাও ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে ভারত ভাগের মত এক সর্বনাশা পদক্ষেপ থেকে বিরত করতে পারল না :—গান্ধীজি এই বিভাজনের তীব্র বিরোধিতা করেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সত্বর স্বাধীনতা পেতে অধৈর্য্য হয়ে ওঠার কারণে। সুভাষচন্দ্রও হয়তো পারতেন না এ ভারত ভাগ রোধ করতে, কিন্তু গান্ধীজির প্রতিবাদ যে জোরদার হত, তা বলা যায়। এ ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের সমাধানের পথ হয়তো অতি সরলীকরণের পর্যায়ে পড়ে তবু তিনি যে কার্যকরী সহায়ক হতে পারতেন না এমনও বলা যায় না।

ধর্মের স্বাধীনতা, সংস্কৃতিক বিভিন্নতা ও ভাষার ঐক্যে সুগ্রন্থিত হয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সূচনা করবে স্বাধীন ভারত; তার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম লগ্নেই। ভারত রাষ্ট্র হ'ল ত্রিখণ্ডিত এবং জন্মলগ্ন থেকেই আত্মকলহে লিপ্ত; সর্বভারতীয় দলগুলিও বর্তমানে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে লাঙ্গুল-নির্ভর হয়ে পড়ে আঞ্চলিকতাদোষে দুষ্ট এমনকি সাম্প্রদায়িক দলসমূহেরও। ভাষা এক হবে কি ভাষার ভিত্তিতেই হয়ে বসে আছে রাজ্য বিভাজন: ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভাজন, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য বিভাজন-পর্ব সম্পূর্ণ: এখন চলছে জাতপাতের ভিত্তিতে সমাজ বিভাজনের আগুন নিয়ে সর্বনাশা খেলা। ইংরেজরা নীতি নিয়েছিলেন—সুশাসনের প্রয়োজনে বিভাজন—প্রশাসনের প্রয়োজনে বৈর-সিঞ্চন; ভারতীয়েরা নীতি নিয়েছেন বঙ্কিত আসন আহরণের জন্য বিদ্বেষরোপণ আর রাজনীতিক্ষেত্রে দুর্বৃত্তায়ন। দুর্বৃত্তের অগত্যা অন্তিম বৃত্তি অথবা গতি যে রাজনীতি—এমন চিত্র ভারতের মত এত স্পষ্ট বোধ হয় আর কোনো দেশে নয়। রাজনীতির স্বার্থে সদ্‌বৃত্তির মানুষেরাও এই দুর্বৃত্তদেরকে প্রশ্রয় দিতে দিতে কলুষিত করে তুলেছেন সমগ্র রাজনৈতিক পরিবেশটিকেই।

স্বয়ং গান্ধীজি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের পর তাঁর দল আর রাজনৈতিক কার্যকলাপে ব্যাপৃত না থেকে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করুক, আর চেয়েছিলেন মন্ত্রীরা ক্ষমতার কুর্সীতে tightly না বসে বসবেন lightly—এখন ঘটছে তার সম্পূর্ণ উল্টো—আলতো গদীনাসীন হওয়া নয়, ক্লেদাক্ত গদীদখল, সমাজসেবা গৌণ, রাজনীতিই সব—রাজনীতিতে ফায়দা লোটার প্রয়োজনে সমাজসেবার কায়দা

দেখানো! চাই সুভাষচন্দ্রের আদর্শে নৈতিকতার শিক্ষা—নৈতিকতায় পুষ্ট মানুষ দুষ্ট রাজনীতিক হতে পারেন না কখনো। সে অবস্থায় লাঙুলের অঙ্গুলি হেলনে আর আন্দোলিত হবে না মূল দেহকাণ্ড। মানুষ হিসাবে কত বড়ো মাপের, কত বড়ো অথচ কোমল মনের অধিকারীই না ছিলেন আপনি সুভাষচন্দ্র! বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন আপনার যে সেবাপরায়ণতা তা আপনি অব্যাহত রাখলেন আজীবন। কোলকাতাতেও গড়লেন দক্ষিণ কলিকাতা সেবা সমিতি আর দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম, বন্যাত্রাণে অমানবিক পরিশ্রম করলেন উত্তরবঙ্গে, সুদূর মান্দালয় জেলে থেকেও আটবারের জেলখাটা মানুষের জীবিকা নিয়ে আপনার মাথাব্যথা, দেশবন্ধুর অবর্তমানে পাছে অসুবিধা হয় তার! দেশবন্ধুর প্রয়াণের ফলে তাঁর সাহায্যপুষ্ট ছাত্র ছাত্রীরা হয়তো হবে আর্থিক অনটনের সম্মুখীন, তাই তাদেরকেও দেখতে বললেন আপনি আপনার মেজদাকে, বন্ধুবান্ধবকে ;—রণাঙ্গনে সৈন্যদের সেবা করছেন স্বহস্তে—সেখানে ক্ষুধার অন্ন সবার সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন সমভাবে—কি অকৃত্রিম মানবদরদী আপনি!

কত মহান প্রাণের তিল তিল অবদানের তিলকচন্দনে চর্চিত আপনার ললাট-লিপি! ক্ষুদিরাম ছিলেন প্রেরণা, বিবেকানন্দ শেখালেন সাধনা, শ্রী অরবিন্দ-বিশুদ্ধ জাতীয়তা, তিলক বিশ্বস্ত গভীরতা, দেশবন্ধু রাজনৈতিক আশ্রয়, শরৎচন্দ্র স্বতঃসস্নেহ প্রশ্রয়, হেগেল-মার্ক্স-বিশ্বচেতনা, ক্যাভুর-ভ্যালেরা যুদ্ধ প্রেরণা আর সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ আশীষ সিঞ্চন, গান্ধীজি স্নেহবর্ষণ, জওহরলাল সহমত পোষণ! আর জনগণ অকুণ্ঠ সমর্থন। তোমাকে কি বিস্মৃত হওয়া যায়! বর্তমান ভারতের দুর্দশার সময়ে তোমার উপস্থিতি যে কী দারুণভাবে কামনা করছি আমরা—Whither India ! Netaji, would its thou be living at this hour ! ভারত কোন পথে, আজ যদি আপনি জীবিত থাকতেন নেতাজী।

নেতাজী বিরোধিতায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একসময় এমনই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যে—তাঁর নির্দেশিত সমস্ত কিছু যেন সম্পূর্ণ ওলট পালট না করতে পারলে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না তাঁরা,—তাতে ভারতবর্ষের মঙ্গল বা অমঙ্গল যাই-ই ঘটুক না কেন। স্বস্তি এই—ইতিহাস বড়ো নিষ্ঠুর, মহাকাল, যে পবিত্র সম্মার্জনীর সহায়তায় নিরপেক্ষ ঝাড়াই মোছাই করে পরিষ্করণের কাজ নিরন্তর করে চলেছে, তার বিচারে সুভাষচন্দ্রের স্থান স্থায়ী হতে বাধ্য। সুভাষ শতবার্ষিকীতে বর্তমানে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে উদগ্রীব—কিন্তু তার আগে এ পর্যন্ত সরকারী অথবা অন্য কোনো ভাবে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ব্যতিরেকেই সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করা হয়েছে যে ভাবে প্রতিবৎসর—সে তুলনায় অন্যান্য প্রয়াত নেতৃবৃন্দ যে ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসছেন, এটাই বর্তমানে হয়তো মূল শোনাচ্ছে—তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সুভাষ-প্রীতি বর্তমানে সারা ভারতেই ক্রমবর্দ্ধমান। সুভাষ স্মরণ এভাবে

চলতে থাকলে আমাদের মননও অনুপ্রাণিত হতে বাধ্য এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই সংস্থান হবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সবার জন্য তাঁর পথ ধরে—অর্জিত হবে স্বাতন্ত্র্য, সাম্য, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখ দেশের জন্য তাঁর মত মেনে—যেমনটি চেয়েছিলেন তিনি।

অসূয়ার অতলান্ত মন্থিত হয়ে বাদানুবাদের উর্মিমালার অন্তস্থল থেকে সমুত্থিত হচ্ছে যে অধৃষ্য ও অজ্ঞেয় অমৃতভাণ্ড, বর্তমানের হাজারো অনৃতত্ব আর অনিত্যতার মধ্যে তার অভ্যন্তরে পরিদৃশ্যমান সুভাষস্মৃতির উজ্জ্বল উপস্থিতি। বিস্ময়বিশ্রুত তিনি, বিশ্বে বিস্মৃত হবেন তিনি কিভাবে ?

নেতাজী—অনুসৃত?

সুভাষচন্দ্র বিদ্রোহী—বিদ্রোহী নেতাজী। তাঁর সেই বিদ্রোহ স্বগৃহ ছাড়িয়ে, স্বদেশ পেরিয়ে বিদেশেও ব্যাপৃত হওয়ার পরে ব্যক্তি সুভাষ অবসৃত যখন, তখন সে বিদ্রোহের অগ্নিকণা বন্যার ব্যাপকতায় সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল সব মনে, সব কোণে, সবখানে। সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ আর তাঁর অক্ষশক্তির পক্ষগ্রহণের পর যে ভাবে গৃহীত হ'ল অপরিকল্পিত আর অসংগঠিত ভাবে ১৯৪২ সালের আগস্টে বিখ্যাত ভারত-ছাড়ো আন্দোলন তাতে এই বিপ্লবকে ঐ সংক্রমণের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কি ভাবেই বা ব্যাখ্যা করা যায়! এ প্রতিক্রিয়া ছাড়াও সমাপিকা ক্রিয়া হিসাবে সংঘটিত হ'ল যে বিখ্যাত নৌবিদ্রোহ এবং সমসময়ে বিমান বাহিনী, সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতেও বিদ্রোহ; এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক ও ছাত্র-যুব বিদ্রোহ, সেগুলিকে বলা যেতে পারে প্রত্যক্ষতঃ সুভাষচন্দ্রের অনুসৃতিরই ফলশ্রুতি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রণক্ষেত্রে প্রদর্শিত বীরবিক্রমের ক্ষণপ্রভার উচ্চকিত ঔজ্জ্বল্যে বিমূঢ় না হয়ে ভারতবাসী তখন তাঁর দিব্যপ্রভায় লৌহদৃঢ়—তাঁর অভীমন্ত্রে উজ্জীবিত তাঁরা তখন।

সুরু হল বিদ্রোহ চারিদিকে। গুরুত্বের বিচারে প্রথমেই এসে পড়ে নৌ বিদ্রোহের কথা। সূত্রপাত—শুধু এই নৌ বিদ্রোহেরই নয়, এ সময়কার প্রায় সমস্ত বিদ্রোহেরই —আজাদ্ হিন্দ ফৌজের তিন সেনানায়কের বিচারকে কেন্দ্র করে। ৫ই নভেম্বর ১৯৪৫, দিল্লীর লালকেল্লায় সুরু হ'ল শাহ নওয়াজ খান, ধীলন আর সায়গলের বিচারের প্রহসন। প্রতিবাদে ঐ দিনই পালিত হ'ল আজাদ হিন্দ দিবস, সারা ভারত উত্তাল হ'ল এঁদের মুক্তির দাবীতে। পিছিয়ে থাকল না ভারতের নৌবাহিনী, সেখানে গঠিত হ'ল আজাদ হিন্দ্ নামক এক সংগঠন আর সে সংগঠন ১৯৪৫-এর ১৭ই ডিসেম্বর নৌদিবসে বোম্বাই বন্দরে তলোয়ার নামক এক জাহাজে বিলি করল কিছু বৃটিশ-বিরোধী প্রচারপত্র; এ আন্দোলন সহজেই প্রশমিত হতে পারত হয়তো, কিন্তু ১৯৪৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বি. বি. দত্ত নামক এক নাবিককে গ্রেপ্তার করে ঘৃতাহুতি সংযোগ করা হ'ল এই বিক্ষোভে। ইতিমধ্যে অবশ্য শাহনওয়াজ, ধীলন আর সায়গলের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং সারা ভারতে নানান বিদ্রোহ প্রশমিত করতে তাদেরকে মুক্তিও দেওয়া হয়েছে ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৬-এ। ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঐ জাহাজে সংঘটিত হ'ল এক ধর্মঘট—মূলতঃ নাবিকদের মধ্যে জাতি বৈষম্য, আহার্য্য বৈষম্য আর বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদে। পরদিন থেকেই বিস্তৃতি-লাভ করল এ বিদ্রোহ—কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হ'ল একটি সমগ্র বিদ্রোহ পরিচালনা করতে। অনেক জাহাজ থেকেই নামিয়ে দেওয়া হ'ল—এমনকি পুড়িয়ে ফেলা হ'ল ইউনিয়ন জ্যাক আর সেখানে ওড়ানো হ'ল কংগ্রেস, মুসলিমলীগ আর কম্যুনিস্টপার্টির পতাকা। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল ক্রমে কোলকাতা, করাচী, কোচিন এবং মাদ্রাজ

প্রমুখ বিখ্যাত বন্দরসমূহে। এ সময় কেন্দ্রীয় কমিটি আবেদন জানাল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টিকে এ আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসতে কিন্তু একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া সাড়া দিল না কোনো দলই। এ কারণে আশংকা করা হ'ল হয়তো বা এ আন্দোলন কম্যুনিস্ট পার্টি'র শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী আবেদন করলেন শ্রী বল্লভভাই প্যাটেল—এ আন্দোলন প্রত্যাহার করতে অদ্ভুতভাবে এ আবেদনে সুর মেলালেন মুসলিম লিগ-এর জিন্নাও, প্রত্যাহৃত হ'ল এ আন্দোলন ; বিদ্রোহীদের উক্তি—আমরা আত্মসমর্পণ করছি, কিন্তু বৃটিশদের কাছে নয়, ভারতীয়দের কাছে।

বিমান বাহিনীও মুক্ত থাকল না আন্দোলন থেকে। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারীতে RIAF—রাজকীয় ভারতীয় বিমান বাহিনীর ভারতীয় কর্মচারীরা সামিল হলেন এক ধর্মঘটে। তাঁরা আবারও ধর্মঘট করলেন ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এ নৌবাহিনীর বিদ্রোহের সমর্থনে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী আবারও অনুষ্ঠিত হ'ল অনুরূপ বিমান ধর্মঘট। এরপর ১৮ই মার্চ সেনাবাহিনীতে ধর্মঘট—এতে সামিল হলেন গোর্খা সৈন্যেরা খোদ দেরাদুনের বুকে। ইতিপূর্বে বোম্বাইতে হয়ে গেল সেনাবাহিনীর নিজেদের মধ্যে এক গুলি বিনিময় যখন ওখানে নিরাপরাধ নৌধর্মঘটীদের উপর অন্যায়ভাবে গুলি চালাতে অস্বীকার করল ওখানকার মারাঠী সৈনিকেরা।

উল্লেখ করতে হয় পুলিস বাহিনীতেও ধর্মঘটের কথা। নানান অসন্তোষের কারণে-এবং উপরিউক্ত বিদ্রোহসমূহে উৎসাহিত হয়েও বটে, ১লা মার্চ জব্বলপুরে ঘটল পুলিশ বিদ্রোহ ; অনুরূপ বিদ্রোহ ঘটল ১৯শে মার্চ এলাহাবাদে আর ২৩শে মার্চ দিল্লীতে। ৩রা এপ্রিল ১৯৪৬-এ বিহারের প্রায় দশ হাজার পুলিস একযোগে সামিল হলেন এমনই এক বিদ্রোহে।

এ সব তো গেল সামরিক আর আধাসামরিক ক্ষেত্রে বিদ্রোহের কথা। বেসামরিক ক্ষেত্রও তখন বিদ্রোহে উত্তাল। ৪ঠা জানুয়ারী আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের তিন সেনা প্রধানের মুক্তি হলে কি হয়—আর একজন—রসিদ আলির বিচার সুরু হ'ল ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এ। কোলকাতা উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে থাকল্ টানা তিনদিন। আগের বার ২৭শে নভেম্বর কোলকাতায় মারা গেছলেন একজন, এবার মরতে হ'ল এখানেই ১২ জনকে। ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ মীরাটে চলল গুলি। সারা ভারতে পালিত হ'ল রশিদ আলি দিবস। ছাত্র যুবরা এমনি করে সামিল হলেন এ সময়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক ডামাডোলের প্রতিকার চেয়ে ১৯৪৬-এ ঘটল ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন। এত বিদ্রোহের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হ'ল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাই, শ্রমিকদের জঙ্গী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৭ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হ'ল কংগ্রেস প্রভাবিত INTUC—ভারতীয় জাতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস। ২২শে ফেব্রুয়ারী রশিদ আলির সমর্থনে বোম্বাইতে শ্রমিক ধর্মঘট হল, তাতে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হ'ল ৫০০'জন শ্রমিককে, যদিও সরকারী

ভাবে দেখানো হ'ল অনেক কম, ২৫শে ফেব্রুয়ারী শ্রমিকরা কোলকাতায় আর মাদ্রাজেও, ব্যাপক ধর্মঘট পালন করলেন ঐ একই কারণে। ২৩শে মার্চ ঘটল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট, আর জুলাই ১৯৪৬-এর মধ্যে ঘটে গেল একাধিকবার ডাক ও তার ধর্মঘট, এ ছাড়া এ সময় কৃষকদের মধ্যেও সারা ভারতে নানা কারণে এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রে ব্যাপকাকারে তেভাগা দাবিতে অনুষ্ঠিত হ'ল তীব্র আন্দোলন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য সারা ভারতে যে বিপ্লব ছিল এতদিন একান্তই বেসামরিক, তা কিভাবে যেন বিস্ফোরক বিদ্রোহের তীব্র তীক্ষ্ণতায় বিক্ষিপ্তাকারে কিন্তু অব্যর্থ সার্থকতায় দুর্লঙ্ঘ্য লৌহ প্রাচীর ভেদ করে অনুপ্রবিষ্ট হ'ল সামরিক এবং আধাসামরিক ক্ষেত্রসমূহেও। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এ সব কিছুর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দাবি করা হয়তো ইতিহাসসম্মত নয় কিন্তু এ সময়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আচার্য্য কৃপালনী এ সবের যে মূল্যায়ন করলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ইংল্যাণ্ড থেকে পাঠানো হল ক্যাবিনেট মিশন—ভারতকে স্বাধীনতা দান আর দেরী করা যায় না—ব্যাপারটার একটা সম্মানজনক পরিসমাপ্তি ঘটাতে—সদস্য তার স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপস্‌, পেথিক লরেন্স আর মিঃ আলেকজাণ্ডার। ২৬শে আগস্ট ১৯৪৬-এ জওহরলালকে প্রধানমন্ত্রী করে গড়া হল দিল্লীতে সরকার একটা—মুসলিম লীগ সামিল হ'ল এ সরকারে, তবে নানান টালবাহানার পর—বেশ কিছুদিন পরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে পুরানো সাম্রাজ্যবাদ হ'ল বিলুপ্তপ্রায়, সুচনা হ'ল নয়া সাম্রাজ্যবাদের ;—আপাতত পরাধীন দেশসমূহ হতে থাকল স্বাধীন ক্রমে ক্রমে। ভারত তেমনি করেই স্বাভাবিক নিয়মে অবশ্যই মুক্ত হত একসময়ে তবু এ সময়কার এই বিদ্রোহসমূহ—বিশেষতঃ নৌ বিদ্রোহ ত্বরান্বিত করল সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তি। ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রাক্কালে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লি অকপটে স্বীকার করলেন এই বিদ্রোহের কথা :—তিনি স্বীকার করলেন তিনি নাকি আদৌ ভয় পাননি গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে—তাঁর ভয় যাঁদের উপর নির্ভর করে ভারতের বুকে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুদৃশ্য সৌধ, সেই সেনাবাহিনী—সেই পুলিসবাহিনী-ই বিদ্রোহাক্রান্ত যখন—তখন সাম্রাজ্যের সে ইমারত ধ্বসে পড়বে অচিরেই ; বস্তুতঃ ভারতকে স্বাধীনতা দান করার কথা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের জুন মাসে—ইংরেজ সরকার বেশ ভালই বুঝতে পেরেছিল—এখান থেকে সসম্মানে অপসৃত হতে হলে তার আগেই অবসর গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রায় সমসময়ে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য জে. বি কৃপালনী বললেন প্রায় একই কথা—গান্ধীজির এতদিনে আন্দোলন যত না ফলপ্রসূ হয়েছিল, তার তুলনায় নেতাজীর প্রভাব সুদূরপ্রসারী অনেক বেশীই। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও মন্তব্য করলেন অনুরূপ।

অবশ্য এ কথাও মনে রাখা দরকার যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে ১৯৪৫-এর আগস্টে ইংল্যাণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হ'ল তাতে যদি—ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল যুদ্ধরাজও

সাম্রাজ্যবাদী প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের দলের জয় হত এবং পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী শ্রমিক দলের মিঃ এটলি না জিততেন তবে হয়ত ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি আরও বিলম্বিত হতে পারত। ১৯৪৬-এ ভারতে ক্যাবিনেট মিশন পাঠালেন তিনি যথেষ্ট সদিচ্ছা নিয়েই। —১৯৪৭-এ ঘোষণা করলেন তিনি—১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে ভারতবর্ষকে দান করা হবে স্বাধীনতা—১৯৪৭-এর মার্চে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গভর্নর জেনারেল করে পাঠালেন আর ভারত শাসন করার জন্যে নয়, শাসনভার সমর্পণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর হাতে। সময়সীমার অনেক আগেই ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ পেল স্বাধীনতা।

গান্ধীজির নেতৃত্বে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত জাগ্রত জনচেতনাকে তথাকথিত সন্ত্রাস-বাদীদেরও বিপ্লবী স্বাদেশিকতার সহায়তা সহযোগে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন প্রকৃত গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করে তুলতে। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে অবস্থান কালে যা প্রত্যক্ষতঃ পারলেন না, তাই সম্ভব হ'ল তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে। শূন্যোত্থিত জ্যোতিষ্কের অগ্নি নিঃসরণ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষে।

স্বেচ্ছানির্বাসিত সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গান্ধীজির অন্তিম মূল্যায়ন—a prince among patriots—হলেও বরাবরই দেখে এসেছিলেন তিনি তাঁকে এক spoilt child—বখাটে বালখিল্য হিসাবে, তাঁর অত্যুগ্র, একরোখা ও অনমনীয় বিদ্রোহপনার কারণে। গান্ধীজি পদলোভী ছিলেন না অবশ্যই, কিন্তু আপন অনুগত নেতৃবৃন্দের পদমর্যাদার প্রতি দায়িত্বশীল অভিভাবকত্বে তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের মতই প্রায় সমান অত্যুগ্র, একরোখা ও অনমনীয়ই। ১৯৩৪ সালের পর থেকে কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও ছিলেন না গান্ধীজি—মনস্থির করেছিলেন অবহেলিত হরিজনদের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করবেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি সতর্ক প্রেক্ষণেই না পক্ষীমাতা সুলভ একান্ত আন্তরিকতায় সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন তিনি কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে—বিশেষতঃ সুভাষচন্দ্রের আগ্রাসন থেকে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবশ্য পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অনটন কখনো ঘটেনি এই সমান্তর নেতৃদ্বয়ের মধ্যে। সুভাষচন্দ্রকে যেমন জনগণ দেশনেতা আখ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ প্রথমে দেশনায়ক ও পরে রাষ্ট্রনেতা আখ্যায় ভূষিত করেছেন—তেমনি গান্ধীজিও ভূষিত করেন তাঁকে দেশগৌরব আখ্যায়, আর গান্ধীজি যে বর্তমানে আমাদের কাছে পরিচিত জাতির জনক হিসাবে—এ আখ্যা তাঁকে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রই কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও। তাছাড়া তাঁর নামে তাঁর গান্ধী ব্রিগেড গঠন—এ ঘটনা তো ছিলই। এখানে স্মরণে আনতে হয় সুভাষচন্দ্রের ১৯২৮ সালে কোলকাতা কংগ্রেসে উচ্চারিত বিখ্যাত উক্তি—নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি, প্রশংসা ও ভক্তি এক জিনিষ, আর নীতির প্রতি শ্রদ্ধা অন্য জিনিষ। ভারতীয় সাত্ত্বিকতার জীবন্ত প্রতীক গান্ধীজি; প্রাচীন ভারতের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও আছে যার—তার পক্ষে

গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না—কিন্তু তাঁর দুর্বল রাজনীতি আর আধুনিকতার প্রতি বিমুখতা সহ্য হয় না সুভাষচন্দ্রের।

এসে পড়ে উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক গর্ডন কথিত মেঘ ও রৌদ্র-এর সম্পর্কের কথা। পৌনঃপুনিক নৈকট্য আর দূরত্বের টানা পোড়েন বাদ দিলেও—গান্ধীজির চোখে প্রতিবাদে সুভাষ অকালপক্ব—আর মতবাদে সুভাষ অত্যগ্রসর। গান্ধীজি আপন গুণমুগ্ধদের কাছে যে আনুগত্য আশা করতেন ও পেয়েওছিলেন, সুভাষচন্দ্র সে ধরনের আনুগত্য একমাত্র দেশবন্ধু ছাড়া দেখাননি আর কারও কাছে। সুভাষচন্দ্রের চোখে অসহযোগ আন্দোলন নিতান্তই নেতিবাচক, আইনঅমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার একান্তই অন্যায়, ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিশ্রীরকমের বিলম্বিত, খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী—ওদের আলাদা সংগঠনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করে তবেই উচিত হ'ত সে আন্দোলন সমর্থন করা। পার্কসার্কাসের রিং মাস্টার হিসাবে তাঁর এসব মনোভাব যদিও বা সহ্য করা যায়—তার পূর্ণ স্বরাজের দাবি, সমান্তরাল সরকার গঠনের চিন্তা - অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের পাশ্চাত্যায়ন—এসব অত্যগ্রসরতা ছাড়া আর কি! মতদ্বৈধতার মেঘ কেটে গিয়ে স্থায়ী রৌদ্রের সম্পর্কের সূচনা দেখা দিল যখন, তখন দিনান্ত, রোদ এসেছে পড়ে —সুভাষ-সূর্য অস্তমিত না হলেও অন্তর্হিত ; উভয়ে উভয়ের নাগালের বাইরে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুভাষচন্দ্র ব্যাকুল আবেদনে গান্ধীজির সহায়তা প্রার্থনা করছেন যখন গান্ধীজি তখন সহানুভূতিশীল তাঁর প্রতি—কিন্তু আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সকল রকম কারণেই নিরুপায়। নিরুপায় তিনি আপন অনুগামীদের নিকটেও। কি বেদনার্ত উক্তিই শুনতে এবং করতে হচ্ছে তাঁকে। আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই হতে পারবে ভারত ভাগ—এমন কথা বলে ভারত ভাগের তীব্র বিরোধিতা যখন করছেন গান্ধীজি—তখন বল্লভ ভাই প্যাটেলের স্পর্দ্ধিত উক্তি—কি দরকার এ-সব কথায় আদৌ কান দেওয়ার—আর যাই হোক, এ বয়সে উনি নিশ্চয়ই কংগ্রেসের সমান্তরাল কোনও দল গড়ে আমাদের বিরোধিতা করতে পারবেন না। অনুরূপভাবে গান্ধীজি যখন জোর দিচ্ছেন গ্রাম স্বরাজের উপর—জওহরলালের অশ্রদ্ধেয় উক্তি—গত বিশ বছর ধরেই তো শুনে আসছি ওসব কথা—এখন পচে গেছে ওসব। গান্ধীজির খেদোক্তি, লোকে বলে সর্দার প্যাটেল আমার ইয়েস্ ম্যান—কিন্তু এখন তিনি আমার নোম্যান, রাজেন্দ্রবাবুও কায়দা করে ওপরে ওঠার সিঁড়িটিতে লাথি মেরেছেন, আর জওহরলাল—তার সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভালো, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। দেশ গঠনের প্রয়োজনে পিতৃপ্রতিম নেতা গান্ধীজিই যখন অবহেলিত এভাবে, তখন সুভাষ-চন্দ্র অনুসৃত হবেন তাঁদের দ্বারা তা দুরাশামাত্র, অনুসৃত হ'ল নেতাজীর বিদ্রোহী সত্তা মাত্র তাও সাধারণ জনগণ কর্তৃক স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজনে।

রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্বেও সুভাষচন্দ্র কিন্তু পরম শ্রদ্ধাশীল গান্ধীজি সম্পর্কে ; প্রাচীন ভারতের সাত্ত্বিক সমৃদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় তিনি কি নিষ্ঠার সঙ্গেই না অভ্রান্ত

ধরে রেখেছেন বিশ্ববাসীর সামনে, এই সাম্প্রতিক বিবাদ-বিরোধে ক্লীষ্ট দিনগুলিতেও ! তাঁর পক্ষে এ জাতীয় অশ্রদ্ধেয় উক্তি অসম্ভব। তাঁর বিরোধ তো নীতিগত : গান্ধীজি অস্বাভাবিকভাবে আপসকামী ; তাঁকে ঘিরে দ্বিতীয় শ্রেণীর যে নেতারা প্রসাদ-প্রত্যাশী তাঁর, তাঁদেরকে অহেতুক বাধিত করা ; ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক পটভূমিকে আদৌ গণ্য না করা, ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত প্রশ্নকেও অর্থহীন-ভাবে স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ; ভারতীয় মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারার সামর্থ্য থাকা সত্বেও ইংরেজদের মানসিকতা বুঝতে অসমর্থ হওয়া ; এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক উত্তরণের প্রশ্নে আধুনিক চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ না হওয়া।

ভারতীয় যুবশক্তি যে বারবার গান্ধীজির থেকে বিচ্যুত হয়ে সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠ্ছে তার দায় কোন্ না গান্ধীজিরই—তাঁদেরকে কেবল নিন্দাই করছেন তিনি, কিন্তু কেমন করে কার্য্যকরী করা যাবে তাদের এই দেশপ্রেমকে সে ব্যাপারে তিনি নীরব—তা কি ঠিক ? গান্ধীজি জনগণের আবেগটুকুকেই উস্কে দিতে পেরেছেন মাত্র—তা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে না পারায় তাঁদের মধ্যে যে কুরুক্ষেত্রের, যুদ্ধপ্রাক্কালে অর্জুনের ক্লৈব্য সমগোত্রীয় সংশয়াচ্ছন্নতা ক্রমবর্দ্ধিত হচ্ছে সে দায় কোন্ না গান্ধীজীরই। কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক কি সামাজিক সব ব্যাপারেই গান্ধীজি পশ্চাৎমুখী ; প্রাচীন ভারতকে যেন অবিকৃত উঠিয়ে এনে উপস্থাপিত করা যাবে বর্তমান ভারতের বুকে—এমনই তাঁর ধারণা। তাঁর আশ্রমসমূহে তেমনই শিক্ষাই দেওয়া হয়, আচরণেও তারই প্রকাশ। এ সবেরও উপরে সুভাষচন্দ্র খুবই ক্ষুণ্ণ হ'ন যখন গান্ধীজি কোনো তর্কে বা আলোচনায় সদুত্তর না দিতে পেরে inner voice বা অন্তর্নির্দেশের আড়ালে আশ্রয় নেন। ঠিক এ কারণে সুভাষচন্দ্রের যুক্তিবাদী প্রগতিশীল কর্মযোগী চরিত্র সহ্য করতে পারেন না শ্রীঅরবিন্দের মতো ব্যক্তির পণ্ডীচেরীতে অবস্থান। সব মিলিয়ে বড়ো মিল তাঁর বিবেকানন্দের কর্মময় আধ্যাত্মিক-তার মতবাদের সঙ্গে।

গান্ধীজি বনাম নেতাজী—এই মেরুকৃত অবস্থানের মূল্যায়ন বেশ সতর্কতার সঙ্গেই করতে সমর্থ হয়েছিলেন জওহরলাল। প্রথমের দিকে সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সমর্থক ছিলেন তিনি—ছিলেন আধুনিক মননশীলতার কারণে পরম শ্রদ্ধাশীল সমাজতন্ত্রের প্রতিও। কিন্তু নেতৃত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির প্রশ্নে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায় সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে অনর্থক গান্ধীজির সঙ্গে সংঘর্ষের পথে পা বাড়ালেন না তিনি। বরং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গ ত্যাগ করে গান্ধীজির সম্মোহনী যাদুকরীতে স্বেচ্ছাবন্দীত্ব গ্রহণ করলেন যথেষ্ট সুচতুরতার সঙ্গে। যাদুকরীতে সম্মোহন—মত ও পথ বদলের চমৎকার এক অজুহাত বটে, এক প্রথম শ্রেণীর নেতার পক্ষে। দ্বৈরথে সুভাষচন্দ্র যদি জয়ী হন, জওহরলালের লাভ নাই তাতে—সুভাষচন্দ্রের সমর্থক হয়ে, তাঁর সঙ্গে থেকে, তাঁকে টপকে প্রথম স্থানে উঠে আসবার দুঃসাহস থাকতে পারে না

তাঁর ; কিন্তু গান্ধীজি যদি জেতেন সহজ উত্তরাধিকার বর্তাবে তাঁর উপরে। উভয় নেতার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে তিনি—প্রথম স্থানে উঠে আসার এই একটিই মাত্র পথ। নিশ্চিত নেতৃত্বহীনতার চেয়ে অনিশ্চিত কর্তৃত্ব সম্ভাবনা—অনেক বেশী কাম্য মনে করেই গান্ধীবাদী না হয়েও গান্ধীপন্থীদের দলে যুক্ত হলেন তিনি, আর নেতৃত্ব লাভের পরই গান্ধীজির জীবদ্দশায়ই, কি রাজনৈতিক, কি অর্থ নৈতিক প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই তিনি গান্ধীপন্থীদের সহায়তায়ই যে স্বাতন্ত্র্য দেখাতে সুরু করলেন তাবৎ গান্ধীপন্থার থেকে সরে এসে—সে তো ইতিহাস।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজির সম্পর্ক যদি মেঘ ও রৌদ্রের, তো জওহরলালের সঙ্গে আলোছায়ার। গান্ধী-সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে আলোর ইশারা দেখা গেলেও এক্ষেত্রে কিন্তু সম্পর্কের চিত্রটি প্রথম প্রথম আলো ঝলমল থাকতে থাকতে ক্রমে আলোছায়ায় রূপান্তরিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ছায়াচ্ছন্নতায় অবসিত। ছায়া থেকে একেবারে অন্ধকারে নির্বাসন দেওয়ার চেষ্টা হ'ল সুভাষচন্দ্রকে। কিছু বিদেশী ঐতিহাসিক যে বলেছেন গান্ধীজি নাকি খুবই অস্বস্তি বোধ করতেন—নেতাজী আর জিন্নার ব্যক্তিত্বের সামনে—সে অপবাদ হয়তো ঠিক নয়—কিন্তু নেতাজীর ব্যক্তিত্ব যে অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং তা গান্ধীজিকে অস্বস্তিতে ফেলতে না পারলেও নেহেরুকে যে ফেলেছিল—তা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের কুরুক্ষেত্রে কর্ণ—সুভাষচন্দ্র। অস্ত্রবিদ্যার যোগ্যতা পরীক্ষায় ত্রিপুরীতে ব্রাত্য ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই আত্মবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে যোগ দিতে বাধ্য হলেন তিনি! মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনীর পাতা থেকে মহান ভারতের আধুনিক ইতিহাসের পাতায় অবিকৃত উঠে এলেন যেন। অচ্ছ্যুৎ অপবাদের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে বিরোধী শিবিরে ঠাঁই হ'ল তাঁর। তারপর এক নিয়তিতাড়িত ভাগ্যবিড়ম্বিত অভিশপ্ত যোদ্ধজীবন বহন করে বেড়ালেন তিনি,— তোজোর কুত্তা, দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, মীরজাফর, কুইসলিং—কত অপবাদ আর অপমানেই না বাণবিদ্ধ করে জর্জরিত করা হ'ল তাঁকে। অভিমানাহত কর্ণের মতোই ভারতমাতার কুন্তীক্রোড়ে কোনোদিনই প্রত্যাগমন ঘটল না তাঁর। অবশেষে অক্ষশক্তির আত্মসমর্পণের রথচক্রগ্রাস নিঃশেষ করে দিল তাঁর সর্বপ্রকার যুদ্ধ প্রয়াস। বীরপ্রসবিনী সন্তানবৎসলা ভারতমাতা কি নিরুপায় কুন্তীদেবীর মতোই অশ্রুসিক্তা হলেন না নীরবে এবং নিশ্চিতরূপে, সবার অলক্ষ্যে! পাণ্ডব শিবির উল্লাসে আড়ালে বিস্মৃত হ'ল এই তথ্য যে অন্তর্হিত হয়ে গেল যে বিশ্ববন্দিত বীর সে তাদেরই জ্যেষ্ঠাগ্রজ।

বৃটিশ সরকারের স্পর্দ্ধিত গর্বোদ্ধত ইউনিয়ন জ্যাক লালকেল্লার প্রাকার শীর্ষ থেকে ক্রমঅপসারিত হয়ে, যখন সে জায়গায় উঠে আসছে সাহসিকতা, সততা আর ত্যাগ; শান্তি ও সত্যনিষ্ঠা, তারুণ্য ও বিশস্ততা এবং বৃত্তবর্ত্মবাহী সমৃদ্ধির প্রতীকরূপে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত অশোকচক্র লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা, আর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল ভবিতব্যের মোকাবিলায়—Tryst with Destiny-র আহ্বান জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট সবাইকে—স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ দুই সেনাপতি—গান্ধীজি আর নেতাজী তখন কোথায় ? হতাশার শতশরে বিদ্ধ বৃদ্ধ ভীষ্ম, ঋদ্ধ ঋতম্ভর গান্ধীজি তখন স্বপ্নভঙ্গের শরশয্যায় স্বেচ্ছানির্বাসিত ; দিল্লী থেকে বহুদূরে ঠিক এক বৎসর পূর্বে সংঘটিত operation asylum code-এ সুপরিকল্পিত Great Calcutta Killing-এর প্রায়শ্চিত্ত মানসে এর অকুস্থল সুদূর কোলকাতার বেলেঘাটায় ; নিঃসঙ্গ ইচ্ছামৃত্যুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষারত হয়তো বা ; আর নেতাজী ! অতৃপ্ত জর্জর বক্ষ, মাতৃস্নেহ-পাশত্যক্ত জয়-যশ-রাজ্যলোভ-মুক্ত, আপন পৌরুষ আর ধর্ম ব্যতিরেকে সর্বত্যাগী ভাগ্যহত কর্ণ, হতাশ নিষ্ফল নেতাজী সম্পূর্ণ নিরুদ্দিষ্ট, কর্ণের মতো হয়তো প্রয়াতই—বা। জন্ম নিল এক বিকলাঙ্গ স্বাধীনতা ওরফে যথেচ্ছাচারিতার বল্গাহীন অধিকার বিশেষতঃ কর্তৃমহলে। এঁদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ রচিত হ'ল কই ? না এল গান্ধীজির পবিত্র স্বপ্নের শুদ্ধ সুন্দর অখণ্ড অসাম্প্রদায়িক গ্রাম-স্বরাজ সমৃদ্ধ সাত্ত্বিক ভারতবর্ষ, না এল নেতাজীর পরিণত স্বপ্নের শোষণ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক, শৌর্য্যমণ্ডিত ঐশ্বর্য্যময় রাজসিক ভারতবর্ষ ; এল ত্রিখণ্ডিত, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প জর্জর রক্তপিপাসু-খর্পরহস্ত ক্ষমতা ও পদঅর্থলোভী শ্বাপদ সমগোত্রীয় বিশৃঙ্খল সংখ্যাগুরু এক শ্রেণীর মানব অধ্যুষিত ধূলাবলুণ্ঠিত, ধূম্রাবগুণ্ঠিত এক তামসিক ভারতবর্ষ।

কি করুণ উত্তরাধিকার আমাদের। কি পেতে চেয়েছি, কি পেতে পারতাম, আর কি পাচ্ছি আমরা ? পাশাপাশি প্রশ্ন রাখতে হয়, কি দিতে চেয়েছি, কি দিতে পারতাম আর কি-ই বা দিচ্ছি আমরা ? বুদ্ধের দেশ, শ্রীচৈতন্যের দেশ, নানক-কবীর-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজির ত্যাগের দেশ, সেখানে আর ত্যাগ করবার মত অবশিষ্ট আছে মাত্র গভীর দীর্ঘশ্বাস ; আর প্রাপ্তির পাত্র, সে তো পর্য্যবসিত হয়েছে কবেই কেবল পরপরিত্যক্ত নিষ্ঠীবন-পরিগ্রহ-প্রত্যাশী পর্য্যুদস্ত ভিক্ষাপাত্র মাত্রে !

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সংক্রমণে কলুষযুক্ত আজ ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তর ; বিচ্ছিন্নতাবাদের কঠোর কুলিশাঘাতে প্রতিটি প্রত্যঙ্গই যন্ত্রণাকাতর তার, অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ একক কোনও আদর্শ লক্ষ্যের অনুপস্থিতির কারণে বিমূঢ় আর বিভ্রান্তিগ্রস্ত সে, গুপ্তহত্যার রক্তমোক্ষনে কলঙ্কিত ও আতঙ্কগ্রস্ত ধূলিমলিন ধূম্রবিলীন তার সম্মুখবর্তিতার সমস্ত স্বপ্ন-সরণিই।

চাই এঁদের অনুস্মৃতি, স্মৃতি ও স্বীকৃতি। এদেরকে স্মরণ করে, এঁদেরকে অনুসরণ করে আমরা কি ভিত্তি রচনা করতে পারি না, এক তমোরহিত স্বত্ব ও রজঃগুণ সমন্বিত শান্তসমাহিত শৌর্য্যমণ্ডিত সমৃদ্ধ ও সমুন্নত ভারতবর্ষের, এক অধ্যাত্ম নেতৃত্বে সর্বাগ্রগণ্য বিশ্ববরেণ্য ভারতবর্ষের !

সুভাষ জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা-পঞ্জী

১৮৯৭—২৩শে জানুয়ারী বা ১৩০৩ সালের ১১ই মাঘ শনিবার, দুপুর ১২টা ১০ মিঃ কটকে জন্ম। বাবা—জানকীনাথ বসু, মাতা—প্রভাবতী দেবী। পৈতৃক বাসস্থান—গ্রাম-কোদালিয়া, ২৪-পরগণা জেলা।

১৯০২—০৮ ঃ—প্রোটেস্টাণ্ট ইউরোপীয়ান স্কুল, কটকের ছাত্র, সাহেবিয়ানায় রপ্ত।

১৯০৯—১৩ ঃ—কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। প্রতি শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ও ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার। প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাসের স্বদেশীয়ানায় প্রভাবিত, স্বদেশী পোষাক ব্যবহার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে পড়াশোনা ও ১৯১১ সালে স্কুলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি দিবস পালন।

১৯১৩—১৫ ঃ—কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। দিলীপ রায়-এর দ্বারা প্রভাবিত; ১৯১৪-তে এক বন্ধুসহ সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে বৃন্দাবন, বারানসী, হরিদ্বার ইত্যাদি পরিভ্রমণ ও প্রত্যাবর্তন। ১৯১৫-তে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ।

১৯১৫—ঐ কলেজেই দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ. ক্লাসে ভর্তি, কিন্তু ১৯১৬-র ফেব্রুয়ারী মাসে ওটেন নিগ্রহের কারণে ঐ কলেজ থেকে বহিষ্কৃত।

১৯১৭—১৯ ঃ—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স-সহ স্কটিশ চার্চ কলেজে ১৯১৭-তে ভর্তি ও ১৯১৯-এ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয়-স্থান সহ অনার্স পাশ। ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে সমর শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান।

১৯১৯—কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যায় এম. এ. ক্লাসে ভর্তি, কিন্তু পিতার আগ্রহাতিশয্যে আপন অনিচ্ছা সত্বেও আই. সি. এস. হওয়ার জন্য বিলাতগমন ও দর্শনশাস্ত্রে ট্রাইপোজ নিয়ে কেম্ব্রিজে ভর্তি।

১৯২০—চতুর্থ স্থান পেয়ে আই. সি. এস. পাশ, কিন্তু কয়েক মাস মাত্র শিক্ষানবিশীর পর আই সি. এস. ত্যাগ ১৯২১-এর এপ্রিলে।

১৯২১—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ট্রাইপোস্‌। জুলাইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সময়ে জাহাজে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, বোম্বাইতে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরে কোলকাতায় দেশবন্ধুর শিষ্যত্বগ্রহণ। গৌড়ীয় বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পাবলিসিটি অফিসার ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন পদে নিযুক্তি। ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু, আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দসহ প্রথম গ্রেপ্তার বরণ। ছয় মাসের কারাদণ্ড।

১৯২২—উত্তরবঙ্গ বন্যা সাহায্য কমিটির সম্পাদক ও 'বাংলার কথা' পত্রিকা সম্পাদনা।

১৯২৩—'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার ম্যানেজার ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৪—কোলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক নিযুক্ত; ২৫শে অক্টোবরে গ্রেপ্তার এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯২৪—২৬—: আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, বহরমপুর জেল হয়ে মান্দালয় জেলে নির্বাসন। মান্দালয়ে দুর্গাপূজার জন্য আন্দোলন। ১৯২৬-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত অনশন। ১৯২৭-এর ১৬ই মে মুক্তি। পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২৮—ছাত্র ও যুব আন্দোলনে যুক্ত। কোলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পেশ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৯—নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত আগস্টে গ্রেপ্তার - নিখিল ভারত নির্যাতিত কর্মী দিবসে শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য। নভেম্বরে মতদ্বৈধতার কারণে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ।

১৯৩০ -জানুয়ারীতে নয় মাসের কারাদণ্ড। আগস্টে কোলকাতার মেয়র নির্বাচিত। সেপ্টেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯৩১—উত্তরবঙ্গ সফর। ১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে গ্রেপ্তার ও সাত দিনের কারাদণ্ড। কোলকাতায় স্বাধীনতা দিবসে শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য পুলিস কর্তৃক প্রহৃত ও পরে ছয় মাসের কারাদণ্ড। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ৮ই মার্চ মুক্তি। করাচী কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়ে অদূরে নিখিল ভারত নওজওয়ান সভা ও নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে বোম্বাইতে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা।

১৯৩২ -বাংলায় ফেরার সময়ে কল্যাণ স্টেশনে ২রা জানুয়ারী কুখ্যাত তিন আইন বলে গ্রেপ্তার ও সিওনি, জবলপুর, মাদ্রাজ লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জেলে আটক।

১৯৩৩—সরকারী মেডিক্যাল বোর্ড তাঁর যক্ষা হয়েছে অভিমত দিলে তাঁকে ইউরোপ প্রেরণ করা হয়। তাঁর ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ইত্যাদি স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। বিখ্যাত লণ্ডন থিসিস লিখিত ও ইংলাণ্ডে ১৪ই জুন পঠিত। ভিয়েনাতে বিঠল ভাই প্যাটেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিক্রমা। ১৯৩৬-এর মধ্যে বহু বিশিষ্ট মনীষীর সঙ্গে পরিচিত।

১৯৩৪—পিতা গুরুতর অসুস্থ সংবাদ পেয়ে ৩রা ডিসেম্বর ভারতে প্রত্যাবর্তন ও ১৯৩৫-এর ৮ই জানুয়ারী পিতার পারলৌকিক ক্রিয়াদির পর পুনরায় বিদেশ গমন। বিঠল ভাই প্যাটেলের সঙ্গে এক যোগে গান্ধীজি কর্তৃক লবন আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হলে—তার তীব্র সমালোচনা।

১৯৩৫—৬ই জুন ভারতীয় সেণ্ট্রাল ইউরোপীয়ান সোসাইটির সম্মেলনে ও পরে রোমে মুসোলিনী কর্তৃক উদ্বোধিত এশিয়াবাসী ছাত্রসম্মেলনে যোগ দেন।

১৯৩৬—সরকারের বিনানুমতিতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে ৮ই এপ্রিল বোম্বাইতে জাহাজেই তাঁকে আটক করা হয়। এবং সেই কুখ্যাত তিন আইনের বিচারে জেলে পাঠানো হয়। পরে কার্শিয়াং-এ শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ীতে অন্তরীণ।

১৯৩৭—নিঃশর্ত মুক্তি ১৭ই মার্চ। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ডালহৌসিতে পাঁচমাস থাকার পর পুনরায় ১৮ই নভেম্বর ইউরোপ যাত্রা।

১৯৩৮—১০ই জানুয়ারী ইংল্যাণ্ড গমন। ১৮ই জানুয়ারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলে ২৪শে জানুয়ারী কোলকাতা প্রত্যাবর্তন ও ১১ই ফেব্রুয়ারী হরিপুরা যাত্রা। ইতিমধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা ডি· ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৯৩৯—২১শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে কবিগুরু কর্তৃক সংবর্দ্ধিত এবং ২৯শে জানুয়ারী ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। ৫ই মার্চ ত্রিপুরী যাত্রা। ১২ই মার্চ পন্থ প্রস্তাব পাকা করে তার ক্ষমতা হ্রাস করা হলে, পরে কোলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ। ২২শে জুন ফরওয়ার্ড ব্লক-এর প্রতিষ্ঠা। নাগপুরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অধিবেশনে সভাপতিত্ব। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত। আগস্টে মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

১৯৪০—১৮ই মার্চ রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব। এপ্রিলে কোলকাতা কর্পোরেশনে অল্ডারম্যান নির্বাচিত। জুনে নাগপুরে ফরওয়ার্ড-ব্লকের সম্মেলনে সভাপতিত্ব। ২৯শে জুন হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের আন্দোলন শুরু। ২রা জুলাই গ্রেপ্তার বরণ। একাধিক অপরাধে ৩০শে আগস্ট তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু। অক্টোবরে বিনা বাধায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সভ্য নির্বাচিত। ২৯শে নভেম্বরে প্রেসিডেন্সী জেলে অনশন সুরু ও ৫ই ডিসেম্বর মুক্তিলাভ কিন্তু বাড়ীতে অন্তরীণ। মহাজাতি সদনের দ্বারোদ্ঘাটন।

১৯৪১—স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালীন ১৬ই জানুয়ারী গভীর রাত্রে (১৭।১।৪১) মহানিষ্ক্রমণ। বাড়ী নীলাম করা হয় কিন্তু খরিদ্দার জোটে না। পেশোয়ার কাবুল ইত্যাদি হয়ে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে বার্লিনে ২৮শে মার্চ পৌছান। স্বাধীন ভারতীয় জাতীয় সরকার, আজাদ হিন্দ সংঘ, আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা। জাতীয় সরকারের প্রথম অধিবেশন ২রা নভেম্বর।

১৯৪২—মার্চে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত রটনা। আজাদ হিন্দ ফৌজের ইউরোপীয় শাখা গঠন।

১৯৪৩—৮ই ফেব্রুয়ারী জার্মানী থেকে সাবমেরিনে যাত্রা টোকিওর উদ্দেশ্যে। ২৮শে এপ্রিল মাদাগাস্কারে যান-বদল ও সাবং পৌছে বিমানযোগে ১৩ই জুনে জাপানে পৌছান। ২রা জুলাই সিঙ্গাপুর গমন। ৫ই জুলাই আজাদ-হিন্দ-ফৌজ

পরিদর্শন। ২১শে অক্টোবর আজাদ-হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা। আজাদ-হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপতি, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়ক ও ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতি নির্বাচিত। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ২৩শে অক্টোবর। পূর্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষাধিক লোকের কাছে এখন থেকে তিনি প্রিয় নেতাজী। ২৮শে ডিসেম্বর মাতার মৃত্যু।

১৯৪৪—৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রথম বৃটিশবাহিনীর সম্মুখীন। ১৮ই মার্চ বার্মা সীমান্ত অতিক্রম। ২১শে মার্চ ভারত ভূখণ্ডের একাংশ অধিকার করে জাতীয় দিবস ঘোষণা। মওডক্ সম্পূর্ণ অধিকৃত। মণিপুর, ইম্ফল, কোহিমাসহ অধিকৃত প্রায় ১৫০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত। কর্ণেল চ্যাটার্জীকে মুক্ত এলাকার গভর্ণর নিয়োগ। নানা কারণে অগ্রগতি ব্যাহত। ২০শে নভেম্বর রাশিয়ার সহায়তা প্রার্থনা করে চিঠি।

১৯৪৫—২রা মার্চ পোঁপায় পরাজয়, ২রা এপ্রিল সায়গলের পশ্চাদপসরণ, ১১ই এপ্রিল ধীলন ও শাহ্‌নওয়াজ বন্দী। জার্মানীর আত্মসমর্পণ ৭ই মে, জাপানের আত্মসমর্পণ ১০ই আগস্ট। ১২ই আগস্ট বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বৈঠক। জেনারেল ইসোদা ও কর্ণেল টাডা কর্তৃক সুভাষচন্দ্রকে নিরাপদ করতে তাঁর মৃত্যু সংবাদ রটনা করবার পরিকল্পনা। ২৩শে আগস্ট জাপ নিউজ এজেন্সির প্রচার—সুভাষচন্দ্র এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ১৮ই আগস্ট, তাইহোকুতে। সুভাষচন্দ্রের এই মৃত্যু এখনো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের লেখা :—

তরুণের স্বপ্ন—১৯২৪-২৭, কারাবাস সময়ে লিখিত।

দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্ ফর ফ্রিডম্—১৯২০-৩৪। ১৯৩৫ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত।

হিষ্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেণ্ট—১৯৩৫-৩৬এ লেখা।

ভারত পথিক—১৯৩৭-৩৮-এ রচিত।

দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্ ফর ফ্রিডম্—(দ্বিতীয় ভাগ) ১৯৩৪-৪২। ১৯৪২-এ জার্মানীতে অবস্থানকালে লিখিত।

এসব পুস্তক ছাড়াও তাঁর তরুণের আহ্বান, লণ্ডন থিসিস্ ইত্যাদি ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্রাদি তাঁর ভারতভাবনার দলিল হিসাবে সবিশেষ মূল্যবান!

॥ যা আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায় ॥

কিছু উক্তি—

স্বপ্নের জন্মভূমি :—

মা-কে ১৯১২-১৩ সালে লেখা একটি চিঠির অংশ :

মা,

"ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোক শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে ২ অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পবিত্রা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানব দেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।"

৮ই জানুয়ারী ১৯১৩-তে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠির অংশ :

"Is our dear Country, India, on the high road to progress? I cann't think so. May be good may come out of evil—may be India is wading through sin and corruption towards peace and progress. But as far as the eye of prudence, prophcy or foresightedness can behold, all is darkness."

এস. এস. গঙ্গা জাহাজ থেকে ২রা মার্চ ১৯৩৩-এ লেখা :

"One of the dreams that have inspired me and given a purpose to my life is that of a great and undivided Bengal devoted to the service of India and of humanity—a Bengal that is above all sects and groups and is the home alike of the Moslem, the Hindu, the Christian and the Buddhist··· To interpret this dream and endeavour to translate it into reality is one of the passions of my life- It is a task to which we must give our very best if success is to be ours··· After all who dies if Bengal lives, who lives if Bengal dies?"

চলো দিল্লী :

"আমি জানি আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহারা একসময় ভাবিতেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী, যাঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্য লুপ্ত হইতে পারে ইহা অবিশ্বাস্য মনে করিতেন। কিন্তু ইতিহাস অন্য সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাস বলে সাম্রাজ্যের যেমন উত্থান আছে, তেমনই পতনও আছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবার সময় আসিয়াছে।"

"ইউরোপের অধিবাসীরা বলে—'সকল পথের শেষ হইল রোমে'। এখানে পূর্ব-এশিয়ার সমস্ত পথের অবসান হইয়াছে ভারতের প্রধান নগরীতে—আর তাহার বুকের উপর অবস্থিত প্রাচীন লাল কেল্লাতে। দিল্লীই আমাদের লক্ষ্য। আমরা বহু পথ ধরিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইয়া যাইব।"

"…দূরে, বহু দূরে, ঐ নদী ছাড়াইয়া, ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া, ঐ পাহাড়-পর্বত ছাড়াইয়া আমাদের দেশ—ঐ দেশে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি, ঐ দেশে আমরা আবার ফিরিয়া যাইতেছি। শোন! ভারত আমাদিগকে ডাকিতেছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকিতেছে, আটত্রিশ কোটি আশী লক্ষ দেশবাসী আমাদের আহ্বান করিতেছে—স্বজনেরা স্বজনদের ডাকিতেছে। ওঠ, নষ্ট করিবার মত সময় আমাদের নাই, অস্ত্র হাতে লও। দেখ, তোমার সম্মুখে পথ রহিয়াছে, যে পথ আমাদের পথপ্রদর্শকগণ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব। শত্রুসেনার মধ্য দিয়া আমাদের পথ করিয়া লইব। ভগবান যদি চাহেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিব। যে পথ ধরিয়া আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে পৌঁছিবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।"

স্বাধীনতার প্রয়াসে ভারত ঃ

হরিপুরা ভাষণ থেকে—

"Ours is a struggle not only against British Imperialism but against World Imperialism as well of which the former is the Keystone. We are, therefore, fighting not for the cause of India alone but of humanity as well. India freed means humanity saved."

মহানিষ্ক্রমণকালে কাবুলে অবস্থান সময়ে লিখিত একটি বক্তব্য ঃ

"In the present political phase of Indian life, Leftism means Anti-Imperialism. A Genuine anti-imperialist is one who believes in undiluted Independence (Not Mahatma Gandhi's substance of Independence) as the political objective & in uncompromising national struggle as the means for attaining it."

নভেম্বর ১৯৪৪ Imperial Tokyo University-তে তাঁর ভাষণ থেকে ঃ

"We want to build up a new and modern nation on the basis of our old culture and civilization; for these we need modern industries, a modern army and all those things necessary to preserve our existence and our freedom under modern conditions.… The most

important problem will be the organising of our national defence... the next problem in the degree of importance will be that of poverty and unemployment... The third problem in free India will be the problem of education...we have to solve our problems in an Indian way & under Indian conditions....in other words it will be a synthesis of nationalism and socialism."

সেনাধ্যক্ষ নেতাজী :

সিঙ্গাপুরে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করার পর উক্তি :—

"To day it has pleased providence to give me the unioue privilege and honour of announcing to the whole world that India's Army of Liberation has come into being...This is not only the Army that will emancipate India from the British Yoke, it is also the Army that will, hereafter, create the future natianal Army of free India...Comrades, 'my soldiers', let your battle-cry be—To Delhi, To Delhi...with the force of arms and at the cost of your blood you will have to win liberty...I assure you that I shall be with you in darkness and sunshine, in sorrow and in joy, in suffering and in victory. For the present, I can offer you nothing except hunger, thirst privation, forced marches and death. But if you follow me is life and death—as I am confident you will—I shall lead you to victory and freedom."

২১শে অক্টোবর ১৯৪৩-এ আজাদ হিন্দ সরকার গঠন উপলক্ষ্যে :

"I always felt that what India was lacking in her fight for freedom were two things—a National Army and a National Government to lead that army to battle... In recent times the Irish people set-up their provisional Government in 1916. Thc Czechs did the same during the last world war. And after the last world war, the Turks under the leadership of Mustapha Kemal set up their provisional Government in Anatolia."

৬ই নভেম্বর ১৯৪৩ সালে জাপ সরকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দিলে নেতাজী ৩০শে নভেম্বর ওখানে যান এবং পরে ২৯-৩১ ডিসেম্বর ঐ স্থান সরকারীভাবে পরিদর্শন করেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী সময়ে তাঁর উক্তি।

"It was an unforgottable event for us to see our national tricolour flag fluttering in the air over the former British Chief Commissioners residence...and we wondered how the wheels of history were now moving in India's favour...For Indians the return of the Andamans represents the first territory to be liberated from British Yoke...Like the Bastille in Paris, which was liberated first in the French Revolution, setting free political prisoners, the Andamans where our patriots suffered is the first to be liberated in India's fight for Independence."

উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর প্রত্যাশা :—

৩০শে নভেম্বর ১৯৩৩-এ জেনেভা থেকে লেখা শ্রীঅমিয়নাথ বসুকে :

স্নেহের অমি,

তোমার ২৬ (অক্টোবর) তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

কি লিখব ? অনেক কথা লিখতে ইচ্ছা হয়—লিখবার উপায় নেই। আমার অন্তরতম ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা গ্রহণ করবে।

তোমরা যে সময়ে জন্মেছ—এটা শুভ সময়। চারিদিকের আবহাওয়া মানুষ-হওয়ার পক্ষে অনুকূল। যে বাড়ীতে জন্মেছ—সে বাড়ীর আবহাওয়া মন্দ নয়। আমাদের অনেক লড়তে হয়েছে—যুঝতে হয়েছে—তার ফল তোমরা ভোগ করছ। তাই তোমাদের দায়িত্ব (responsibility) অনেক বেশী। আমরা আমাদের জীবনে যদি কৃতকার্য্য না হতে পারি—তা হলে তোমাদের কৃতকার্য্য হতে হবে। আমাদের failure-এর উপর তোমাদের success-এর সৌধ নির্ম্মাণ করতে হবে।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যাঁরা—তাঁদের সমান হবার চেষ্টা করবে।

ভয়ানক কঠিন সাধনা—আমি জানি। কিন্তু অতি কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা চাই। Have the highest ambition in life—but not a selfish ambition. The ambition should be to serve others and to die for others.

এই রকম unselfish ambition যদি পোষণ কর, তা হলে কোনও দিন অহঙ্কার হবে না। অহঙ্কার মহাপাপ, যাঁরা প্রকৃত মহান, তাঁরা কখনও অহঙ্কারী নন। তাঁরা আত্মবিশ্বাসী বটে—কিন্তু আত্মবিশ্বাস ও অহঙ্কার এক জিনিস নয়।

অপরের মধ্যে হীনতা বা নীচতা দেখলে ক্রুদ্ধ হবে না। হীনতাকে ভালবাসার দ্বারা জয় করা দরকার। যদি কেহ তোমার অপকার করে বা নিন্দা করে—তার অপকার করবে না—বা তাকে ঘৃণা করবে না। তাকে ভালবেসে যাও—সে একদিন তোমার মহত্ত্ব বুঝতে পারবে এবং তোমাকে ভালবাসতে শিখবে।

সংসার বড় বক্র, বড় নীচ—কিন্তু এই সংসারকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবেসে এবং সেবা করে—স্বর্গে পরিণত করতে হবে। যে প্রেমিক, যে দেশসেবক—সে সবসময়ে

ভালবাসা বা প্রশংসা পায় না—Christ-এর মত তাকে অনেক সময় ক্রুশবদ্ধ হতে হয়। তাই Christ তাঁর আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

"Father, forgive them—for they know not what they do."

নিজের অন্তরটাকে স্বর্গে পরিণত করে রাখো—তাহলে কোনও দিন কষ্ট পাবে না। মনে রাখবে the essential principle in life is to give and not to take.

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা পড়েছ? গোড়ার দিকে নবকুমারের দৃষ্টান্ত আছে। নবকুমারের মত নিঃস্বার্থ লোক হতে হবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। You must rise to the loftiet heights.

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

রাঙা কাকাবাবু।

"The Individual must die, so that the nation may live. Today I must die, so that India may live and may win freedom and Glory".

"The greatest curse for a man is to remain a slave. Forget not that the grossest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law—you must give life if you want to get it."

সুভাষচন্দ্র যে এমিলি শেংকল কে বিয়ে করেছিলেন সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত একটি চিঠি। চিঠিটি উনি ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ সালে বার্লিন থেকে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে লেখেন :—

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে। হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইহজীবনে আর কোনও সংবাদ দিতে পারিব না। তাই আজ আমি আমার সংবাদ এখানে রাখিয়া যাইতেছি। যথাসময়ে এ সংবাদ তোমার কাছে পৌছিবে। আমি এখানে বিবাহ করিয়াছি এবং আমার একটি কন্যা হইয়াছে। আমার অবর্ত্তমানে আমার সহধর্ম্মিনী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে, যেমন সারা জীবন আমার প্রতি করিয়াছ। আমার স্ত্রী ও কন্যা আমার অসমাপ্ত কার্য্য শেষ করুক—সফল ও পূর্ণ করুক—ইহাই ভগবানের নিকট আমার শেষ প্রার্থনা।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবে—মা, মেজ বৌদিদি এবং অন্যান্য গুরুজনকে দিবে। ইতি—

বার্লিন, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

তোমার স্নেহের ভ্রাতা সুভাষ